বিশ্ব ইতিহাস

কৌশাম্বী নাথ মল্লিক

বিশ্ব ইতিহাস



কলিকাতা, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের 'প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়' ও
['বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষার' পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত]

বিশ্ব ইতিহাস

[প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য]

কৌশাম্বীনাথ মল্লিক, এম. এ., বি. টি., এম. এ. (শিক্ষা বিজ্ঞান)
ইতিহাসের সিনিয়ার লেকচারার, বেহালা কলেজ ; প্রাক্তন অধ্যাপক,
ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, শিক্ষণ-মন্দির, (বেলুড় মঠ),
কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর, দীনবন্ধু এ্যাণ্ড্রুজ কলেজ
কলিকাতা।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
জানুয়ারী, ১৯৬৯

মূল্য : ৫ পাঁচ টাকা

মুদ্রক
শ্রীধনঞ্জয় রায়
মুদ্রণশ্রী প্রেস
১৫।১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রবেশিকা পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বইটি লেখা হল।

বিশ্বের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ১৭৬৩—১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেকার কালটি নানাদিক হতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কালের প্রারম্ভে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে ফুটে উঠতে থাকে, আর এই কাল যখন শেষ হল তখন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল—মানুষ পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হল এবং রাজনৈতিক ভাবধারায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হল।

বিশ্বের এই সময়কার ইতিহাস লেখায় যথেষ্ট সাবধানতা নিতে হয়েছে। পাঠ্য-পুস্তকের গণ্ডির মধ্যে ঘটনা বিশ্লেষণ ও প্রবণতা নিরূপণেই নজর দিতে হয়েছে। বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই বইটির সমর্থিত দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতানুবর্তী। ইতিহাস যে কেবলমাত্র নিরস তথ্যের সমাহার নয় এবং এর দৃষ্টিভঙ্গি যে পক্ষপাতশূন্য, এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত রেখে ইতিহাসের যথার্থ রূপটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এখন বাংলার বিদ্যার্থীসমাজ ও আমার সহকর্মীদের কাছে এই বইটি সমাদর পেলে কৃতার্থ হব।

বেহালা
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ১৯৬৮

কৌশাম্বীনাথ মল্লিক

সূচীপত্র

বিশ্ব ইতিহাস

(১৭৬৩-১৯৪৯)

সূচনা

ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন; এর বৃত্তান্তে পূর্ণচ্ছেদ কোথাও পড়ে না। এ কারণে ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা চলে না। ইতিহাসকে অখণ্ড, অবিভক্ত, অবিভাজ্য মনে করে আমাদের আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস পড়তে হবে।

মানুষ তবুও ইতিহাসের মধ্যে বিভিন্ন ধারা দেখেছে। যুগ থেকে যুগান্তরে ইতিহাসের রূপান্তর যা ঘটেছে তা বুঝতে চেষ্টা করেছে। পরিবর্তনময় জগতে পরিবর্তন যখন বিশেষভাবে দেখা দেয় তখনই সূচনা হয় নবযুগের। ইউরোপে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এরূপ নবযুগের সূচনা দেখা গেল।

ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা

রেনেঁসার অর্থ নবজন্ম বা নবজাগৃতি। আমরা একে ব্যক্তিমানুষের নবজন্ম বলতে পারি। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ব্যক্তি-মানুষের দেহ-মন-আত্মার যে জোয়ার এসেছিল তার ব্যাপক ও বিচিত্র প্রকাশের নাম দেওয়া হয়েছে রেনেঁসা।

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী জাতীয় মুসলমানরা কনস্টান্টিনোপল দখল করার সাথে সাথেই রেনেঁসা যুগের শুরু হয় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু বিশেষ ভাবে দেখলে এটির আরম্ভ হয়েছিল কনস্টান্টিনোপল-এর পতনের বহু আগেই। কনস্টান্টিনোপল-এর পতনের ফলে বহু গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিজ নিজ পুঁথিপত্র নিয়ে পশ্চিম ইউরোপের ইটালীতে চলে আসতে শুরু করেন। কনস্টান্টিনোপল ছিল গ্রীক সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ। সুতরাং এই সব পণ্ডিত ব্যক্তিদের আগমনে ইটালীতে প্রাচীন গ্রীক বিদ্যার চর্চা শুরু হল। ফলে চিন্তাধারায় পরিবর্তন এল, মনোজগতে আলোড়ন-এর সৃষ্টি হল। নতুন শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি হল।

ইউরোপের অন্যান্য দেশে রেনেঁসা : রেনেঁসা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইটালীতে এটি বেশিদিন টেকেনি। জার্মানিতে রেনেঁসা আলাদা রূপ নিল। ইটালীবাসীদের অনুসন্ধিৎসা প্রাচীন সাহিত্যের ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দেয় কিন্তু এই নতুন দেশগুলির পণ্ডিত ব্যক্তিরা ধর্মগ্রন্থ সমূহের প্রতি লোকের কৌতূহল জাগাল।

রেনেঁসার প্রসার

ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন : রিফরমেশন বা ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন কথাটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সংকীর্ণ অর্থে সংস্কার আন্দোলন বলতে আমরা ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ষোড়শ শতাব্দীতে যে ধর্ম বিপ্লব ঘটেছিল সেটি বুঝি, আর ব্যাপক অর্থে হল ইউরোপীয় সমাজ এবং চার্চের সংস্কারের জন্য যে বিরাট এবং জটিল আন্দোলন ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হয় সেটি।

এর অর্থ

সংস্কার-আন্দোলনের সাথে রেনেঁসার সম্পর্ক খুবই নিকট। একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। জার্মানিতে রেনেঁসাই রিফরমেশনের রূপ নেয়। রিফরমেশন মানুষের বিচার শক্তির ওপর জোর দেয় যেটি রেনেঁসারই অবদান। পর্যবেক্ষণ, তুলনামূলক আলোচনা, সমালোচনা, মূল উপাদান এবং অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি যেমন রেনেঁসা দৃষ্টিভঙ্গিরই অভিব্যক্তি আবার রিফরমেশন আন্দোলনেরও বৈশিষ্ট্য।

সংস্কার আন্দোলন ও রেনেঁসা

ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে সংস্কার আন্দোলন : সংস্কার-আন্দোলন কেবল মাত্র জার্মানিতে সীমাবদ্ধ রইল না। এর ঢেউ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে গিয়ে পৌছাল। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনে লুথারের মত গৃহীত হল। সুইজারল্যাণ্ডে প্রোটেস্টান্ট মতবাদের প্রধান কেন্দ্র হল জেনেভা শহর। জন ক্যাল্‌ভিন নামক এক ফরাসী যাজক ছিলেন এখানকার নেতা। তিনি লুথারের মত গ্রহণ না করে নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর মত যাঁরা গ্রহণ করল তাদের ক্যালভিনপন্থী বলা হল। স্কটল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও জার্মানির কয়েকটি রাজ্য ক্যাল্‌ভিনের মতবাদ গ্রহণ করে। রাজা অষ্টম হেনরীর সময় ইংল্যাণ্ডে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এবং রানী এলিজাবেথের আমলে ধর্মমত স্থায়িভাবে নির্ধারিত হয়। ইংল্যাণ্ডে যে ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হয় তা 'এংগ্লিকান ধর্ম' নামে পরিচিত।

জার্মানির বাইরে সংস্কার আন্দোলন

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ স্থাপন : সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ইউরোপ

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উপনিবেশ বিস্তার : খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের পতন হয়। এর ফলে ইউরোপের সাথে এশিয়ার ও অন্যান্য মহাদেশগুলির সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে আরব বণিকদের প্রাধান্য দেখা দেয়। কিন্তু প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ হলেও প্রাচ্যের ধনসম্পদ, রেশম, মশলা প্রভৃতি পণ্যের চাহিদা ইউরোপীয়দের নিকট আগের মতই থেকে যায়। বরঞ্চ, বেশি দাম এবং দুষ্প্রাপ্যতার দরুন এসব জিনিসের আদর আরও বেড়ে যায়। একারণে মধ্যযুগের অবসানের আগে হতেই ইউরোপীয়রা প্রাচ্যের সাথে ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ফলে তারা পুনরায় বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সংস্পর্শে আসে। নতুন নতুন স্বাধীন শহরের পত্তন ঘটে। এর পর ইউরোপে রেনেঁসা দেখা দেয়। ফলে ইউরোপে মধ্যযুগীয় গতানুগতিকতার সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন হয়। ইউরোপের ইতিহাসে রেনেঁসার দান অপরিসীম। এর প্রভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রভাব বিস্তারে মনোযোগী হয়।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণগুলি

বাণিজ্যিক

অবশ্য কেবলমাত্র বাণিজ্যের লোভই ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং নতুন নতুন দেশে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা বলা যায় না। ধর্ম প্রচারের আগ্রহও ইউরোপীয়দের পেয়ে বসে। তারা নতুন নতুন দেশে পবিত্র খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য উদগ্রীব হয়; বহু খ্রীষ্টান ধর্মযাজক দেশ ছেড়ে অজানা পথে পাড়ি দেন।

ধর্মীয়

এমনকি মধ্যযুগেও দুচারজন দুঃসাহসী ইউরোপীয় পর্যটক প্রাচ্য জগতে ভ্রমণ ও দীর্ঘকাল যাপন করে তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মনোরম বিবরণ লিখে যান। এরূপ ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে মার্কো পোলোর বিবরণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মার্কো পোলো ছিলেন ভেনিসের অধিবাসী। তিনি আনুমানিক ১২৭২ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এশিয়া পার হয়ে চীন দেশে যান এবং সেখানে ষোল বছর কাটিয়ে জাপান ব্রহ্মদেশ ও ভারত ঘুরে দেশে

মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনী

ফেরেন। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয় এবং এটি ইউরোপীয় দেশগুলিতে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। বহু পর্যটক ও অভিযাত্রী তাঁর রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে অনুপ্রাণিত হন।

অন্যান্য কারণ

ইতিমধ্যে পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রসার ঘটে। সমুদ্র যাত্রার উপযোগী উন্নত ধরনের জাহাজ, দিক-নির্ণয় যন্ত্র ও মানচিত্র তৈরী হয়। ফলে সমুদ্রযাত্রা আর আগেকার মত ভীতিপ্রদ রইল না।

প্রিন্স হেনরী

পর্তুগীজ অভিযান : নতুন বাণিজ্যপথের সন্ধান এবং নব নব ভৌগোলিক আবিষ্কারে পর্তুগাল অগ্রণী হল। এবিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক হলেন পর্তুগালের নাবিক **প্রিন্স হেনরী**। তাঁর নেতৃত্বে পর্তুগীজরা ক্রমশঃ আটলান্টিক মহাসাগরের পথে আফ্রিকার উপকূল ধরে অগ্রসর হতে থাকে। হেনরীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করতে পারলেই ভারত সমেত প্রাচ্যে যাবার জলপথ বের করা যাবে। হেনরীর জীবদ্দশায় তাঁর স্বপ্ন অবশ্য সফল হয়নি। কিন্তু তিনি পর্তুগীজ নাবিকদের মধ্যে যে, উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেন তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে বহুবাঞ্ছিত জলপথ আবিষ্কৃত হল। একে একে পর্তুগীজরা আফ্রিকার উপকূলবর্তী পোর্টো, স্যান্টো, ম্যাডিরা, ক্যানারিজ, আজোরস্ প্রভৃতি দ্বীপ এবং কেপভার্ড অন্তরীপে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করল। আফ্রিকায় পদার্পণ করেই পর্তুগীজরা একটি লাভজনক ব্যবসা শুরু করল। আফ্রিকায় নিগ্রো অধিবাসীদের ধরে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রয় করতে লাগল। এই হীন অথচ লাভজনক ব্যবসার মোহে আফ্রিকা সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। আফ্রিকা ঘুরে ভারতের জলপথ বের করবার আগ্রহও বাড়তে থাকল। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে **বার্থলোমিউ ডিয়াজ** উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে আফ্রিকা ঘুরে প্রাচ্য দেশে যাবার পথের নিশানা পেলেন। এতদিনে প্রাচ্যদেশে যাবার পথের সন্ধান মিলল। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পথ অতিক্রম করে **ভাস্কো-দা-গামা** দক্ষিণ ভারতের কালিকটের বিখ্যাত বন্দরে উপস্থিত হলেন। ফলে ইউরোপের খ্রীষ্টান দেশগুলির পক্ষে ভারতের সাথে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হল। উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে প্রাচ্য দেশযাত্রার জলপথ আবিষ্কার এবং প্রাচ্যে ইউরোপীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব পর্তুগীজদের প্রাপ্য।

পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত

ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার

স্পেনের প্রচেষ্টা : পর্তুগালের মত স্পেনও জলপথে প্রাচ্য দেশে যাবার পথ

খুঁজছিল। এমন সময় স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রানী ইসাবেল্লার দরবারে এলেন জেনোয়াবাসী নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে ইউরোপ হতে, সোজা পশ্চিম দিকে এশিয়ার পূর্বদিকে অবস্থিত কোন দেশে পৌছান যাবেই। তিনি তাঁর এই অভিমত স্পেনের রাজা-রানীকে বললেন। তাঁরা কলম্বাসের কথায় আস্থা রেখে তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করলেন এবং কলম্বাস তিনটি জাহাজ নিয়ে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে এক দুঃসাধ্য সাধনের ব্রত নিয়ে উত্তাল আটলাণ্টিক পাড়ি দিলেন। বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করে তিনি যেখানে পৌছালেন তার নাম হল **বাহামা** দ্বীপ। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল তিনি ভারতের নিকটে এসেছেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের গায়ের রঙ লালচে ছিল বলে কলম্বাস তাঁদের 'রেড- ইণ্ডিয়ান" নাম দিলেন । কিন্তু আসলে যেখানে তিনি পৌছালেন তার অতি নিকটে ছিল চীন বা ভারত নয়, বিরাট এক অজ্ঞাত মহাদেশ। অবশ্য মৃত্যুর আগেও কলম্বাস জানতে পারেননি যে তিনি একটি নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন।

আমেরিকা আবিষ্কার



কলম্বাস

কলম্বাস

কলম্বাসের পর ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডরাজের সাহায্যপুষ্ট হয়ে জন ও সেবাস্টীয়ান ক্যাবট নামক ভ্রাতৃদ্বয় আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকায় পৌছাতে সমর্থ হন।

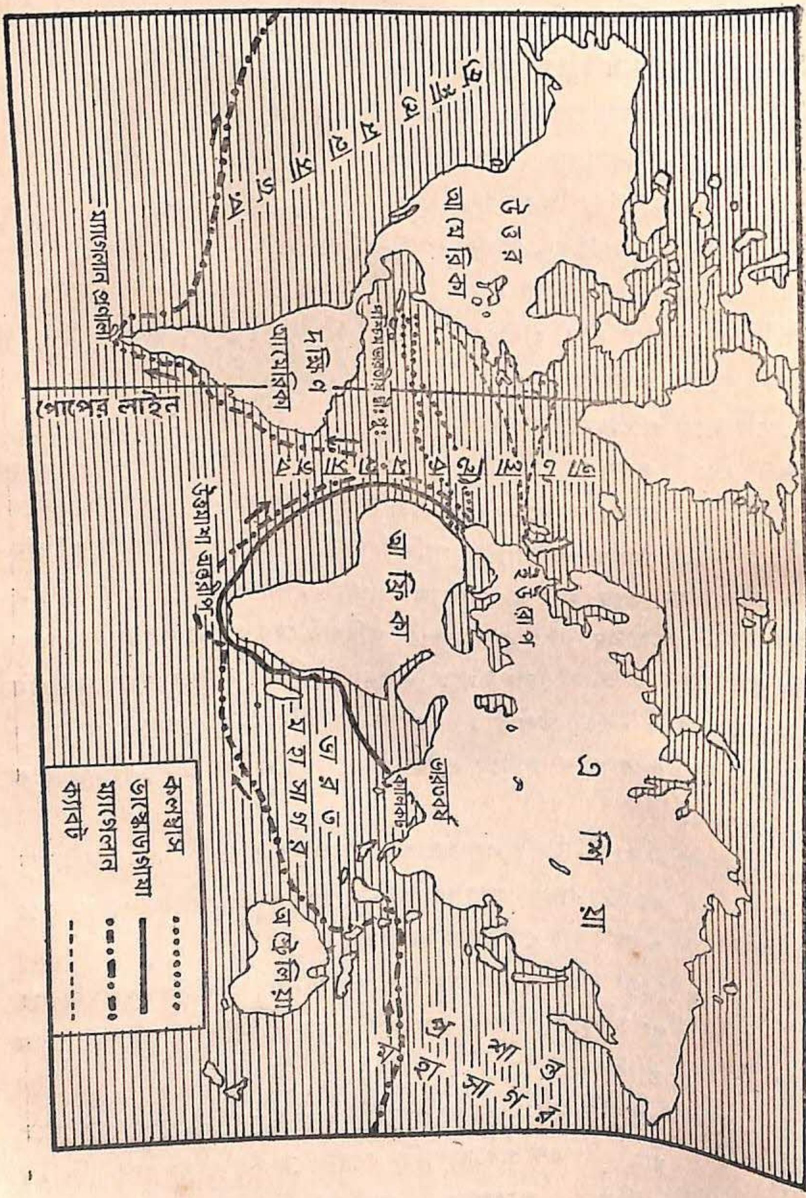
ক্যাবট ভ্রাতৃদ্বয়

১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পেড্রো কাব্রল নামক জনৈক পর্তুগীজ নাবিক দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে পৌছান এবং এই নতুন দেশটির নামকরণ করেন ব্রাজিল।

ব্রাজিল আবিষ্কার

আমেরিগো ভেসপুচি নামে এক ভাগ্যান্বেষী ব্যবসা করবার জন্য পর্তুগালে যান এবং এক প্রবন্ধে দাবি করেন যে নতুন মহাদেশ তিনিই আবিষ্কার করেছেন। এর পর এক জার্মান অধ্যাপক নতুন মহাদেশটিকে নিজের পুস্তকে 'আমেরিকা' অর্থাৎ

নতুন মহাদেশের নামকরণ


উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
আফ্রিকা
এশিয়া
ভারত মহাসাগর
ম্যাগেলান প্রণালী
পোপের লাইন
উত্তমাশা অন্তরীপ
ভারতবর্ষ
কালিকট
কলম্বাস
ভাস্কোডাগামা
ম্যাগেলান
ক্যাবট

আমেরিগোর আবিষ্কৃত দেশ বলে বর্ণনা করেন। আর এর ফলেই আমেরিকা নামের উৎপত্তি হল। কিন্তু এটি আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমেরিকা মহাদেশের নামের মধ্যে প্রকৃত আবিষ্কারকের নামটির সন্ধান পাওয়া যায় না—আমেরিগো একজন মিথ্যা দাবিদার ছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে বালবোয়া নামে এক স্পেনীয় প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগেলান স্পেন হতে বের হয়ে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে তাঁর নামাঙ্কিত ম্যাগেলান প্রণালী দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌছান এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। তিনি অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে নিহত হন। কিন্তু তাঁর এক সহকারী শেষ পর্যন্ত আফ্রিকার পথে স্পেনে ফিরে আসেন।

জলপথে ভূ-প্রদক্ষিণ

পর্তুগাল ও স্পেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য : আধুনিক যুগে পর্তুগীজরাই সমুদ্রপথে অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। পর্তুগালের পর স্পেন এ কাজে ব্রতী হয়। কালক্রমে স্পেন ও পর্তুগাল আবিষ্কৃত দেশসমূহে উপনিবেশ স্থাপন করে। ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য এই দুই দেশের বণিকদের হাতে চলে যায়। স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে যাতে নবাবিষ্কৃত দেশগুলি নিয়ে বিরোধ না বাধে সেজন্য ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু মহামান্য পোপ এক নির্দেশ দেন যে ৫০° পশ্চিম দ্রাঘিমার পূর্বদিকের অর্ধ পৃথিবী পর্তুগালের আর পশ্চিম দিকের অর্ধ পৃথিবী স্পেনের হবে। ফলে এশিয়া আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে পর্তুগালের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল এবং আমেরিকা মহাদেশ স্পেনের আওতায় এল। বলাই বাহুল্য যে উভয় দেশেই পোপের বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলে দুই দেশের মধ্যে আবিষ্কৃত দেশগুলির অধিকার নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ দেখা দেয়নি। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দুই দেশের মধ্যে **টর্ডিসিলাসের** সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে পোপের নির্দেশের কিছু রদবদল করা হয়। এবং ব্রেজিলের ওপর পর্তুগালের অধিকার স্পেন মেনে নেয়। পরবর্তীকালে ফরাসী, ইংরাজ ও অন্যান্য জাতিসমূহ পোপের এই নির্দেশ মানতে রাজী হয়নি।

পোপের লাইন

লোহিত সাগর হতে চীন দেশের ক্যাণ্টন পর্যন্ত প্রায় ৬০০০ মাইল ব্যাপী সমুদ্র উপকূলে স্থানে স্থানে পর্তুগাল তার বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে। ভারতের গোয়া পর্তুগীজ শক্তির একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। এছাড়া, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ও পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগীজরা বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করে। এই অঞ্চলগুলিতে পর্তুগাল উপনিবেশ স্থাপন করেনি কারণ

পর্তুগালের উপনিবেশ

পর্তুগালের লোকবল ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি পর্তুগালের একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

স্পেনের উপনিবেশ

স্পেন আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু তখন দুটি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। মেক্সিকোতে ছিল আজটেক এবং পেরুতে ছিল ইনকাস সভ্যতা। স্পেনীয়রা বর্বরদের ন্যায় এই দুই সভ্যতা ধ্বংস করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশ দুটি কুক্ষিগত করেছিল। কালক্রমে ব্রেজিল বাদে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকার বৃহদংশ স্পেনের অধীনে আসে। এছাড়া পশ্চিম ভারতীয় এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে জাহাজ বোঝাই সোনা-রূপা চালান দিয়ে স্পেনবাসীরা ধনবান হয়।

অন্যান্য ইউরোপীয়দের প্রচেষ্টা : পর্তুগাল ও স্পেনের পর ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি জলপথে বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর হয়ে ওঠে। ফরাসী, ইংরেজ ও ওলন্দাজরা (হল্যাণ্ডের অধিবাসী) পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে গণ্য হয় এবং স্পেন ও পর্তুগীজদের পরাজিত করে বিভিন্ন মহাদেশে নিজ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্পেন ও পর্তুগাল তাদের অধিকাংশ সাম্রাজ্য হারায়। এই দু'দেশের উপনিবেশগুলির মধ্যে কোন কোনটি স্বাধীনতা লাভ করে; অন্যগুলি ফরাসী, ওলন্দাজ বা ইংরাজদের হস্তগত হয়।

পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের পরিণতি

হল্যাণ্ড ছোট দেশ হলেও এর অধিবাসীরা সুযোদ্ধা ও সুনাবিক। এরা পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে সিংহল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে প্রাধান্য স্থাপন করে এবং ভারত, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য-কুঠী নির্মাণ করে। ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ওলন্দাজ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যথাক্রমে ১৬০১ ও ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটি প্রাচ্যের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অধিকার পায় এবং কালক্রমে আধুনিক ইন্দোনেশিয়া ও সিংহল প্রভৃতি দেশ অধিকার করে। দ্বিতীয় কোম্পানীটি আমেরিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার পায়। আমেরিকায় যেসব স্পেনীয় ও পর্তুগীজ অধিকৃত স্থান ছিল সেগুলির সাথে কেবলমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যই স্থাপন করল না—কয়েকটি অঞ্চল দখল করল। ব্রেজিলের কিয়দংশ অস্থায়িভাবে নিজের অধিকারে আনে এবং হাডসন নদীর তীরবর্তী স্থানসমূহে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর হয়। মাহাতানে নিউ আমেস্টার্ডাম (আধুনিক

হল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা

নিউইয়র্ক) উপনিবেশ স্থাপন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ওলন্দাজরা প্রাচ্যে ও আমেরিকায় বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপন করতে পারে, কিন্তু এটি বেশিদিন টেকেনি। ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। ফলে ইংরেজদের সামুদ্রিক, বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং হল্যাণ্ডের প্রাধান্য নষ্ট হয়। অবশ্য জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে তাদের প্রাধান্য থেকে যায়।

ফ্রান্সের প্রচেষ্টা

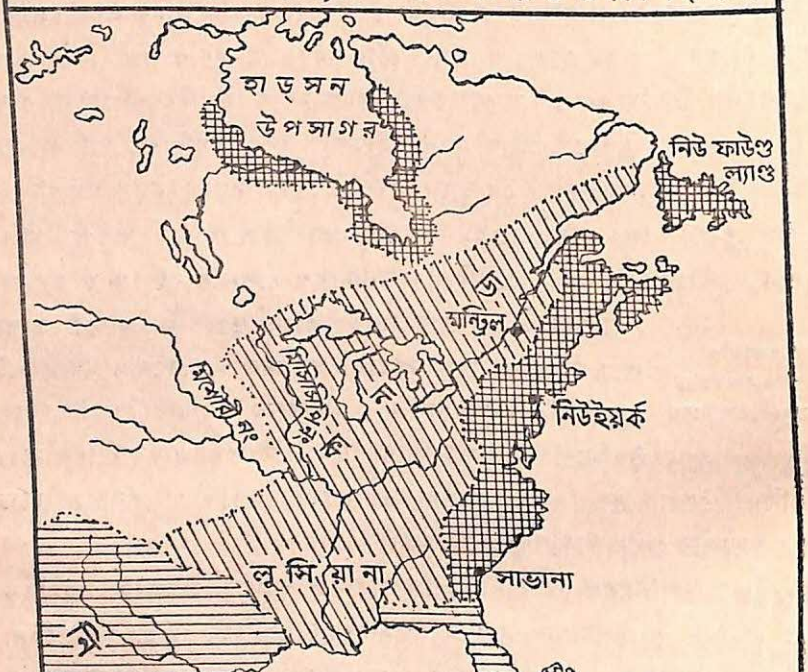
ফরাসী উপনিবেশ : ফ্রান্স উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই এসব উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কানাডা, নোভাস্কেটিয়া প্রভৃতি নতুন নতুন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব অঞ্চল প্রথম হতেই ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ফরাসীরা কেবলমাত্র উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেই ক্ষান্ত হল না। আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে তারা বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করে এবং এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এটি বাস্তবে পরিণত হয়নি। ইংরেজরা বাধা দেয়। ফলে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত চলেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় আমেরিকায় ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশ

ইংল্যাণ্ডের প্রচেষ্টা

ইংরেজ উপনিবেশ : রানী এলিজাবেথের আমলে ইংরেজরা সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তারে ও উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রসর হয়। হকিন্স, ড্রেক, ক্যাভেণ্ডিস, র্যালে, ফ্রবিশার প্রভৃতি দুঃসাহসী নাবিকরা সমুদ্রপথে ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্য স্থাপনে সহায়তা করে। রাশিয়া, এশিয়া মাইনর ও পারস্য দেশে ব্যবসা করবার জন্য বিভিন্ন কোম্পানী গড়ে ওঠে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য দেশের অন্যান্য জায়গায় বাণিজ্য করবার অধিকার পায়। এবং কালক্রমে ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব স্থাপিত হয়। ১৬০৭-এ ভার্জিনিয়ায় কিছু সংখ্যক ইংরেজ বসতি স্থাপন করে। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে একদল গোঁড়া প্রোটেস্টাণ্ট বা পিউরিটান স্বাধীন ভাবে ধর্মাচরণের আকাঙ্খায় 'মেফ্লাওয়ার' নামক জাহাজে আটলান্টিক সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকায় চলে যায়। তারা প্লীমাউথ নাম দিয়ে একটি উপনিবেশ স্থাপন করে। কালক্রমে আমেরিকার পূর্ব-উপকূলে ইংরেজদের তেরটি উপনিবেশ গড়ে ওঠে। আমেরিকা ও ভারতবর্ষ ছাড়াও ইংল্যাণ্ড অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সম্পর্ক স্থাপন করে। চীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়, আফ্রিকা দেশগুলির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রথমে স্থাপিত হয়। পরে ওই

উত্তর আমেরিকায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের উপনিবেশ (১৭৫০)



সব দেশে ইংরেজ রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশটিও সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের অধিকারে আসে। তাছাড়া, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ও স্পেনীয়দের নিকট হতে ইংরেজেরা বহু অংশ কেড়ে নিতে চায়। ফলে সতের শতকের শেষ ভাগ হতে উপনিবেশ নিয়ে ইংরেজদের সাথে অন্যান্য দেশের যুদ্ধ বাধে।

ইংরেজ ও ফরাসীদের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য নিয়ে দ্বন্দ্ব : আঠার শতকে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য নিয়ে ইংরেজ-ফরাসী দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে দেখা যায়। ফরাসী ও ইংরেজরা উভয়েই আমেরিকা, ও এশিয়ায় বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রবল চেষ্টা করে। এসব অঞ্চলে ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশ গুলি খুবই কাছাকাছি ছিল। ভারতবর্ষে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর যে রাজনৈতিক সংহতির অভাব দেখা দেয় তার ফলে ফরাসী ও ইংরেজ শক্তিদ্বয় ক্ষমতা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। সতের শতকের মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন অংশে ইংরেজ ও ফরাসীরা অনেকগুলি কুঠী স্থাপন করে ও দেশের রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে রাজনীতির পাশা খেলায় মেতে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ভারতে ফরাসী প্রতিযোগিতার অবসান হয় এবং ইংরেজ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ইংরেজদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক প্রাধান্য একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এর জন্য তাদের দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। প্রধানতঃ তিনটি যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। স্পেনীয় উত্তরাধিকারীর যুদ্ধ (১৭০১-১১), অষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৭৪০-১৭৪৮) এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩)। বলাই বাহুল্য, ইংল্যাণ্ড এই তিনটি যুদ্ধের ফলে সর্বাপেক্ষা লাভবান হল। এই যুদ্ধ তিনটি স্থির করে দিল যে জলপথে এবং সাম্রাজ্য বিস্তারে ফ্রান্সকে পিছনে রেখে ইংল্যাণ্ড এগিয়ে চলতে থাকবে।

দ্বন্দ্বের কারণ ও অঞ্চল সমূহ

ইংল্যাণ্ডের জয়

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ : সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-১৭৬৩) একদিকে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন ও স্যাক্সনী এবং অপরদিকে প্রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড অংশ গ্রহণ করে। ইউরোপ ছাড়াও এই যুদ্ধ আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও দূর-প্রাচ্যেও সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক শত্রুদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করেছিলেন কিন্তু শীঘ্রই যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে প্রাশিয়া ক্রমে ক্ষীণবল হয়ে পড়ল। ঠিক এই সময় ইংল্যাণ্ড

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

ফ্রেডারিককে অর্থসাহায্য বন্ধ করল এবং ফ্রান্সের সাথে সন্ধি করতে ব্যগ্র হল। এর ভেতর রাশিয়ার জারিনা এলিজাবেথের মৃত্যু হল এবং রাশিয়ার সিংহাসনে বসলেন নতুন 'জার' তৃতীয় পিটার। ইনি ফ্রেডারিকের সমাদর-কারী ছিলেন। ফলে রাশিয়া যুদ্ধ হতে সরে দাঁড়াল। এরকম অবস্থায় অষ্ট্রিয়া দেখল যে তার পক্ষে এককভাবে প্রাশিয়া ধ্বংসের চেষ্টা করা নিরর্থক। ফলে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দুটি চুক্তির ফলে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

প্যারীর ও হিউবার্টসবার্গের সন্ধি ১৭৬৩

প্যারীর চুক্তি-ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হল এবং এতে উপনিবেশ সংক্রান্ত বিলি-ব্যবস্থা ছিল। **হিউবার্টসবার্গের চুক্তি** অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও স্যাক্সনির মধ্যে সম্পাদিত হল। প্রথমটির দ্বারা ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যের প্রভূত সম্প্রসারণ ঘটল এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

প্যারীর সন্ধি: প্যারীর সন্ধি দ্বারা ইংল্যাণ্ড কানাডা, নোভাস্কোটিয়া, কেপব্রুটন দ্বীপ, টোবাগো, সেণ্ট ভিনসেণ্ট, ডমিনিকা প্রভৃতি দ্বীপগুলি ও আফ্রিকার সেনেগাল নামক স্থানটি পেল। ভারতবর্ষে ফ্রান্স তার পূর্ব-অধিকৃত অঞ্চলগুলি ফিরে পেল। ইউরোপে ইংল্যাণ্ড মিনারকা দ্বীপ পেল। ফ্রান্স নিউফাউল্যাণ্ডের উপকূলে মাছ ধরবার অধিকার পেল।

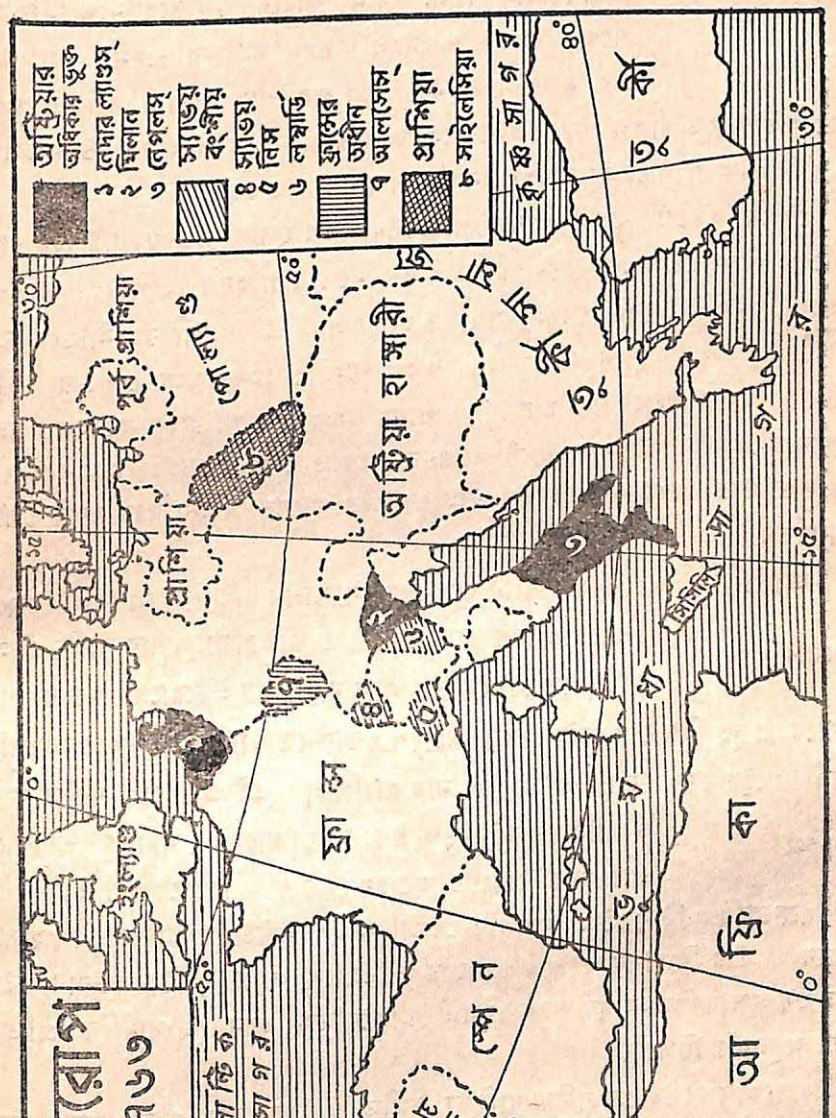
হিউবার্টসবার্গের সন্ধি: এই চুক্তির দ্বারা প্রাশিয়া সাইলেশিয়া নিজ অধিকারে রেখে দিল কিন্তু স্যাক্সনি ছেড়ে দিল।

ফলাফল

যুদ্ধে ইউরোপীয় সমস্যার প্রাশিয়ার অনুকূলেই মীমাংসা হল এবং ঔপনিবেশিক প্রশ্নের মীমাংসা হল গ্রেট বৃটেনের অনুকূলে। যে তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে এই যুদ্ধের উদ্ভব হয়েছিল তার মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ হল ইংল্যাণ্ডের জয়ে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ হল প্রাশিয়ার জয়ে এবং ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মীমাংসা হল ফ্রান্সের প্রতিকূলে।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা: সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের অবস্থা ও শক্তি পর্যালোচনা করলে প্রথমেই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা চোখে পড়ে। তৃতীয় জর্জ ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে লাগলেন। ইংল্যাণ্ড এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় বিস্তৃত সাম্রাজ্য লাভ করে। ব্যবসাক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের সমকক্ষ আর কেউ রইল না।

ইংল্যাণ্ড


ইউরোপ
১৭৬৩
অস্ট্রিয়ার অধিকার ভুক্ত
১ নেদার ল্যাণ্ডস্
২ মিলান
৩ নেপলস্
স্যাভয় বংশীয়
৪ স্যাভয়
৫ নিস
৬ লম্বার্ডি
ফ্রান্সের অধীন
৭ আলসেস্
প্রাশিয়া
৮ সাইলেসিয়া
ইংল্যাণ্ড
পূর্ব প্রাশিয়া
প্রাশিয়া
পোল্যাণ্ড
আটলান্টিক মহাসাগর
ফ্রান্স
অস্ট্রিয়া হাঙ্গারী
স্পেন
পর্তুগাল
তুর্কী সাম্রাজ্য
কৃষ্ণ সাগর
তুর্কী
ভূমধ্যসাগর
সিসিলি
আফ্রিকা

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ফ্রান্সের দুর্বলতা আরও প্রকাশ পায়। ফ্রান্স এই সময় পঞ্চদশ লুইয়ের শাসনাধীন ছিল, যিনি কারণে অকারণে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ফ্রান্সের ধনবল ও জনবল উভয়ই নষ্ট করছিলেন। রাজকার্যে তাঁর নজর ছিল না। ফ্রান্সের ভাগ্য অযোগ্য মন্ত্রীদের দ্বারাই পরিচালিত হতে থাকল। ফলে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রভাব কমে যায়। ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের নিকট ফ্রান্স পরাজিত হয়।

ফ্রান্স

স্পেনে বুঁরবো বংশই শাসন পরিচালনা করছিল। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে স্পেন ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয় এবং পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। স্পেনের গৌরব-সূর্য বহু আগেই অস্তমিত হয়েছিল। ইউরোপের রাজনীতিতে তার স্থান ছিল না। অবশ্য ইটালীর কিছু অংশ স্পেনের অধীনে ছিল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় চার্লস স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি স্পেনকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং প্রজাদের কল্যাণ সাধনে তিনি সদাই চেষ্টিত থাকতেন।

স্পেন

জার্মানি: এই সময় জার্মানি বলে কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। এই অঞ্চলে তিনশোর বেশী রাজ্য ছিল। প্রতিটি রাজ্য আবার স্বাধীন ছিল। জার্মানিতে রাজনৈতিক ঐক্য না থাকায় ইউরোপের অন্যান্য শক্তি এখানে প্রভূত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানিতে এক প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই রাষ্ট্রটির নাম **প্রাশিয়া**। এই প্রাশিয়াই পরবর্তীকালে জার্মানির রাজনৈতিক ঐক্য নিয়ে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে গণ্য হয়।

জার্মানি

প্রাশিয়া

ফ্রেডারিক দি গ্রেট: মহামতি ফ্রেডারিক ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন। তাঁর সিংহাসন লাভ ইউরোপের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাঁর মত সুদক্ষ শাসক তখন খুব অল্পই ছিল। রাজনৈতিক জ্ঞান ও সামরিক প্রতিভা তাঁর অতুলনীয় ছিল।

বাল্যকাল হতেই ফ্রেডারিক সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি তাঁর পিতার কঠোর শাসনের ফলে এবিষয়ে বেশি দূর এগুতে পারেন নি। অবশ্য তিনি সামরিক ও বেসামরিক শাসন বিষয়ে শিক্ষা ভালভাবেই পেয়েছিলেন। পিতার কঠোর শাসন তাঁর চরিত্রের নম্র ভাব নষ্ট করে দেয়। তাঁর হৃদয় ইস্পাতের মত কঠিন হয়েছিল এবং মন

জীবনী

তিক্ত-সন্দেহে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। তাঁর একমাত্র নীতি ছিল—রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধন করা। প্রাশিয়ার স্বার্থকে তিনি সর্বাগ্রে স্থান দেন।

আভ্যন্তরীণ নীতি : প্রজাসাধারণের মঙ্গল সাধন করাই ফ্রেডারিকের আভ্যন্তরীণ নীতির মূল লক্ষ্য ছিল। তিনি নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান সেবক বলে মনে করতেন। সমসাময়িক শাসকদের মধ্যে এরূপ কর্তব্যবোধ দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি বেসামরিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই অধিকতর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করেন। যুদ্ধোত্তর যুগে প্রাশিয়ার সমস্যা ছিল পুনর্গঠন এবং ক্ষয়ক্ষতির পূরণ। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য পুনর্গঠনে তিনি মনোযোগী হন এবং তাঁর চেষ্টায় প্রাশিয়ায় নানারূপ শিল্পের উন্নতি ঘটে। তিনি বহু প্রশস্ত রাজপথ তৈরী এবং খাল খনন করান। যুক্তিবাদী দর্শন তিনি গ্রহণ করেছিলেন বলে প্রজাসাধারণকে তিনি কয়েকটি মৌলিক অধিকার দেন; মুদ্রানীতি ও আইনকানুনের পরিমার্জন করেন; শিক্ষার দিকে নজর দেন; সমগ্র দেশে অসংখ্য প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন।

আভ্যন্তরীণ সংস্কার

বৈদেশিক নীতি : প্রাশিয়ার সম্প্রসারণ এবং জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ফ্রেডারিকের বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য। এর জন্য তিনি যেকোন নীতি গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন। কুটনীতিতে সাধুতা, সরলতার স্থান থাকতে পারে না বলে তিনি মনে করতেন। ১৭৪০ হতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। অষ্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে তিনি প্রধান নায়ক ছিলেন। প্রত্যেক যুদ্ধের শেষে তিনি জয়ী হন এবং প্রাশিয়ার সীমানা সম্প্রসারিত করেন। পোল্যাণ্ড ভাগবাটোয়ার সময় তিনি পশ্চিম প্রাশিয়া হস্তগত করেন এবং এর ফলে প্রাশিয়ার ভৌগোলিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পররাষ্ট্র নীতি

প্রাশিয়ার অগ্রগতিতে ফ্রেডারিকের যে অবদান রয়েছে তা প্রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিল। তাঁর নীতির ফলে প্রাশিয়ার সীমান্ত অধিকতর শক্তিশালী হয়। তিনি বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে প্রাশিয়াকে একটি বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করেন। এবং এটি সম্ভব হয় প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীর কার্যকারিতা এবং তাঁর অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভার দ্বারা।

কৃতিত্ব

এসব সত্বেও কিন্তু ফ্রেডারিক-এর কার্যাবলী সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। প্রথমতঃ সাইলেশিয়া দখল করে তিনি অষ্ট্রিয়াকে চিরশত্রুতে পরিণত করেন। ফলে

প্রাশিয়াকে এর জন্য কঠোর মূল্য দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, সৈন্যবাহিনীর ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া ঠিক হয়নি। দেশের জনসংখ্যা ও সঙ্গতির তুলনায় সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা এবং ব্যয় খুবই বেশি ছিল। অতি-সামরিকতা প্রাশিয়ার স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। তৃতীয়ত, তাঁর সর্বনাশা দক্ষতা প্রাশিয়ার জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তিনি নিজেকে 'রাষ্ট্রের প্রথম ভৃত্য' বলতেন, আসলে কিন্তু এই প্রথম ভৃত্যই প্রধান ভৃত্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি নিজেই সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যের ভার নিয়েছিলেন। ফলে প্রাশিয়ায় স্বৈরাচারী কেন্দ্রিকতা প্রবর্তিত হয়। শাসনকার্যে প্রজাদের স্থান ছিল না। ফ্রেডারিক জনতাকে আমল দেন নি কিন্তু জনতার স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।

সমালোচনা

উপসংহারে বলা যায় যে শত ত্রুটি থাকলেও প্রাশিয়ার প্রতি ফ্রেডারিকের দান সর্বকালে অম্লান ও অক্ষয় হয়ে থাকবে।

অস্ট্রিয়া: সতের শতকে অস্ট্রিয়া শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র ছিল। আঠারো শতকে অস্ট্রিয়া তার সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করে এবং এক জাতীয় নীতি অনুসরণ করে। সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসা ও তাঁর পুত্র সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ অস্ট্রিয়াকে অধিকতর সুসংবদ্ধ ও আত্মরক্ষায় সমর্থ করে তোলেন।

মেরিয়া থেরেসা: ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে সম্রাজ্ঞীরূপে অধিষ্ঠিতা হন। তাঁর চরিত্রে নানা গুণ ছিল, সাধারণ বুদ্ধি বা কাণ্ডজ্ঞান প্রভূত ছিল। তাঁর কাজের পক্ষে কি অপরিহার্য তা ঠিক করবার মত তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল আর এর সাথে খাঁটি দেশপ্রেম মিশে ছিল। এসব গুণ নিয়ে তিনি প্রজাদের মধ্যে রাজানুগত্য বৃদ্ধি করবার সবিশেষ চেষ্টা করলেন। অস্ট্রিয়ান উত্তরাধিকার যুদ্ধে (১৭৪০-১৭৪৮) তিনি বুঝতে পারেন যে যতদিন না তাঁর রাজ্যকে সুসংহত ও শক্তিশালী করতে না পারা যাবে ততদিন তাঁর পক্ষে সাইলেশিয়া ফিরে পাওয়া অসম্ভব। এছাড়া, বহু ভাষাভাষী, বহু জাতি-ভিত্তিক অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল প্রচুর। স্বার্থপর, বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাতবর্গ শাসনযন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল। মেরিয়া থেরেসা শাসন ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার সাধন করেন। রাজস্ব-সংস্কারের ফলে আয়ব্যয়ের ভারসাম্য দেখা দিল। মেরিয়া থেরেসার সরকার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করেন, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও নজর দেন। পররাষ্ট্র নীতিতে তিনি অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করেন। ইংল্যাণ্ডের সাথে প্রাচীন মিত্রতা ত্যাগ করে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসার মৃত্যু হয়।

মেরিয়া থেরেসার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি

অষ্ট্রিয়ার দুর্দিনে সিংহাসনে আরোহণ করে মেরিয়া থেরেসা যে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন এবং এটিকে সুসংহত করে উন্নতির পথে এগিয়ে দেন তাঁর জন্য অষ্ট্রিয়ার ইতিহাসে মেরিয়া থেরেসার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয় জোসেফ ঃ দ্বিতীয় জোসেফ বহু বছর ধরে অষ্ট্রিয়ার শাসনকার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর তিনি অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হন। তাঁর চরিত্র, আদর্শ ও বুদ্ধির আলোকে উদ্ভাসিত ছিল। তাঁর শাসন কালে অষ্ট্রিয়া অনেক বিষয়ে উন্নতি করে।

জোসেফের রাজ্যকাল

অষ্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন বলে তিনি তাঁর রাজ্যকে সুসংবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। তিনি প্রথমে ধর্ম-সংস্কারে মনোযোগী হন এবং পোপের আধিপত্য ও গোঁড়া ধর্মের বিরোধিতা করেন। এর পর তিনি শাসনসংস্কারে মন দেন। সমগ্র রাজ্যটিকে তিনি ১৩টি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রত্যেক প্রদেশে দক্ষ ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। সামন্তদের অত্যাচার হতে কৃষকদের রক্ষা করেন। জমির ওপর তিনি কর আরোপ করেন এবং এই কর হতে কাউকে রেহাই দেওয়া হয় নি। তিনি সমগ্র রাজ্যে একটিমাত্র ভাষা সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করেন। জার্মান ভাষাই সরকারী ভাষা হয়। সামাজিক ব্যাপারে তিনি অনেক সংস্কার-সাধন করেন। দাসত্ব প্রথা তিনি রদ করেন। তিনি সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ করে প্রজাসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সমতা আনতে বদ্ধপরিকর হন।

আভ্যন্তরীণ সংস্কার

বৈদেশিক নীতি ঃ পররাষ্ট্রনীতিতেও যোসেফ সক্রিয় ছিলেন। তিনি অষ্ট্রিয়ার বিক্ষিপ্ত রাজ্যগুলির একত্রীকরণ এবং জার্মানির ওপর তাঁর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। আড্রিয়াটিক সাগরের তীরে অবস্থিত অঞ্চলগুলি লাভ করবার অভিলাষী ছিলেন। তিনি পোল্যাণ্ড বিভাগে অংশ গ্রহণ করে একটি সমৃদ্ধশালী অঞ্চল দখল করেন। পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত সম্পূর্ণ করবার জন্য আরও কয়েকটি অঞ্চল তিনি হস্তগত করেন। তিনি বেলজিয়ামের পরিবর্তে বেভেরিয়া বিনিময়ের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বিফল হন।

পররাষ্ট্রনীতি

যোসেফের যুগান্তকারী সংস্কারগুলি প্রবর্তনের ফলে তাঁর প্রজাসাধারণ সন্তুষ্ট হয় নি। তারা এরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল না। নানা জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। মৃত্যুর পূর্বে যোসেফ তাঁর প্রবর্তিত

ব্যর্থতা

অনেক সংস্কার বাতিল করে দিতে বাধ্য হন। অবশ্য দাসত্ব প্রথা রদ ও আরও কয়েকটি সংস্কার টিকে থাকে।

যোসেফ সমসাময়িক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। তিনি যদি তাঁর সংস্কারকার্যে একটু ধীর গতিতে অগ্রসর হতেন তাহলে সংস্কারগুলির প্রবর্তনের ফলাফল তাঁর পক্ষে বেদনাদায়ক হত না। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

রাশিয়া ঃ রাশিয়ার বিখ্যাত জার মহামতি পিটারের (১৬৮২-১৭২৫) প্রচেষ্টায় রাশিয়া একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীরা তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারলেও তাঁরা রাশিয়াকে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পেরেছিল। জারিনা এলিজাবেথ প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাঁর হঠাৎ মৃত্যু না হলে ফ্রেডারিকের পক্ষে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব হত। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিন দ্বিতীয় ক্যাথারিন নাম নিয়ে রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন। তিনি জাতিতে জার্মান ছিলেন কিন্তু পরে প্রকৃত রুশ দেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন।

শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়া

দ্বিতীয় ক্যাথারিনের শাসনকাল

চরিত্র ঃ তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রে নৈতিক আদর্শ বলে কিছু ছিল না। তিনি বিবেক-নীতি-শূন্য ছিলেন এবং চতুর বলে তাঁর খ্যাতিও ছিল। রাশিয়ার শাসকগণের মধ্যে তিনি-ই ছিলেন শিক্ষিতা ও মার্জিত রুচিসম্পন্না। রাশিয়াকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন ও তার উন্নতিকে নিজের উন্নতি বলে মনে করতেন। সংক্ষেপে, **ক্যাথারিন কাজ করতেন, পড়তেন এবং চিন্তাও করতেন।**

উদ্দেশ্য ও নীতি ঃ পিটারের তিনি পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি রাজশক্তি বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা রাশিয়ায় বিস্তার করতে চেষ্টা করেন। বৈদেশিক নীতিতে তিনি কৃষ্ণসাগর ও বাল্টিক সাগরে রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপন করতে সচেষ্ট হন। এ ছাড়া রাশিয়ার সম্প্রসারণও তিনি করেছিলেন।

আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ সমগ্র দেশটিকে তিনি ৪৪টি প্রদেশে ভাগ করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশকে আবার কয়েকটি জেলায় ভাগ করেন। এই অঞ্চলগুলিতে যাতে ভালভাবে শাসনকার্য চলে তার প্রতি সর্বদাই নজর রাখতেন। দেশের আইনকানুন

লিপিবদ্ধ করেন। চার্চের পৃথক সত্তা রাখলেন না। চার্চকে রাষ্ট্রের অধীনে আনেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারেও তিনি উৎসাহী ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য চেষ্টা করেন।

বৈদেশিক নীতি : পররাষ্ট্র নীতিতে ক্যাথারিন এক সতেজ নীতি গ্রহণ করেন। তিনি পশ্চিম-ইউরোপের রাজনীতিতে প্রাধান্য স্থাপন করেন। তিনি কৃষ্ণসাগরের পথে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পথ অনেকটা প্রশস্ত করেছিলেন। তুরস্ককে তিনি পর পর দুটি যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। পোল্যাণ্ডের বৃহৎ অংশ তিনি পোল্যাণ্ড ভাগ করে পান। এর ফলে রাশিয়ার পশ্চিম সীমানা ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সীমানা হতে ৩৫০ মাইল বেড়ে যায়।

ক্যাথারিন একজন প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল রাশিয়ার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। তাঁর শাসনের ফলে রাশিয়া একটি সুসভ্য ইউরোপীয় দেশে পরিণত হয়।

সুইডেন : সতের শতকে সুইডেন বল্টিক উপকূলবর্তী দেশগুলির মধ্যে ক্ষমতায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। আঠারো শতকের প্রথম ভাগেই সুইডেনের পতন শুরু হয়। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর সুইডেন আর প্রথম শ্রেণীর শক্তি রইল না।

সুইডেনের পতন

পোল্যাণ্ড : ষোল এবং সতের শতকে পোল্যাণ্ড ইউরোপে উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল। কিন্তু পোল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও সংগঠনে নানারূপ দোষত্রুটি থাকায় পোল্যাণ্ড দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। রাশিয়া, প্রাশিয়া, ও অস্ট্রিয়া পোল্যাণ্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে এর অবলুপ্তি ঘটায়।

পোল্যাণ্ডের অবলুপ্তি

ইটালী : এই সময় ইটালী বলে একক কোন রাষ্ট্র ছিল না। আধুনিক ইটালীতে কয়েকটি স্বাধীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের অধীনে কয়েকটি পরাধীন রাষ্ট্র ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ : এই অঞ্চলটি তুরস্কের অধীনে ছিল। বলকান রাজ্যগুলি বলতে ইউরোপের যে অঞ্চলটি বুঝায় তার প্রায় সমস্তটিই তুরস্কের অধীনে ছিল। সতের শতকে তুরস্ক-শক্তি নানাকারণে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার পশ্চাদপসরণ আরম্ভ হয়। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া ইউরোপে তুরস্কের প্রধান শত্রুরূপে পরিগণিত হয় এবং এর ফলেই ইউরোপে তথাকথিত 'প্রাচ্য সমস্যা' দেখা দেয়।

প্রজ্ঞার যুগ ঃ আঠারো শতকের ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে গেলে তৎকালীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রাষ্ট্রাদর্শ ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। ষোল ও সতের শতকের প্রথমভাগে ইউরোপে ধর্ম নিয়ে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে লড়াই হয়েছিল। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট এ দুটি ধর্মমতের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় এই প্রশ্নই ইউরোপীয়দের চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু সতের শতকের দ্বিতীয়ভাগ হতে ইউরোপের চিন্তাধারা নতুন খাতে বইতে শুরু করে। এবং আমরা যাকে যুক্তি বা বিচারের যুগ বলে থাকি সেই নতুন যুগের আবির্ভাব হয়। এই নতুন যুগটিকে **প্রজ্ঞার যুগ** নাম দেওয়া হয়েছে। এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পরধর্মসহিষ্ণুতা।

যুগটির বৈশিষ্ট্য

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সতের শতকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য বিজ্ঞান কেন্দ্রের পত্তন ঘটে। এই সব কেন্দ্র হতে বহু বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্র-পত্রিকা বের হতে থাকে। এছাড়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মানমন্দির নির্মিত হয় এবং যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি

পদার্থ বিজ্ঞানে নবযুগের সূচনা করেন **আইজ্যাক নিউটন**। তিনি প্রমাণ করে দেখালেন যে পৃথিবীতে রয়েছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই শক্তির ফলেই সব জিনিস উঁচু থেকে নীচু দিকে পড়ে।

পদার্থ বিদ্যা

নিউটন বিজ্ঞান জগতে এক নবযুগের সৃষ্টি করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে হেলি ও হারচেল জ্যোতির্বিদ্যায় বিপ্লব নিয়ে এলেন, টেরিচেলি ব্যারোমিটার-এর নীতি আবিষ্কার করলেন, গুয়েরিক বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র বের করলেন। এছাড়া থার্মোমিটার, দেওয়াল ঘড়ি প্রভৃতি মার্জিত ও উন্নততর হল। বিদ্যুৎশক্তি সম্পর্কিত গবেষণা চলতে থাকল এবং অল্পদিনের মধ্যেই পদার্থ বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতি ঘটল।

রবার্ট বয়েল হলেন রসায়ন বিদ্যার পথপ্রদর্শক। তিনি রসায়নশাস্ত্রকে কুসংস্কারের নাগপাশ হতে মুক্ত করেন। এই সময় জোসেফ ব্লাক্ কার্বন ডায়োক্সাইড, হেনরী ক্যাভেনডিস্ হাইড্রোজেন, প্রিস্টলে অক্সিজেন এবং লাভোসিয়ার রসায়ন শাস্ত্রের পরিমাণিক বিশ্লেষণ আবিষ্কার করলেন। জেমস হাটন তাঁর ভূতাত্ত্বিক গবেষণা প্রকাশ করে এক আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। মাল্‌পিঘি, সিডেনহাম, মরগ্যাগনি, রবার্ট হুক ও

রসায়ন বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা

লিওয়েনহোক-এর গবেষণা দ্বারা শারীর বিদ্যার এক বিরাট পরিবর্তন এল। উদ্ভিদ বিদ্যার উন্নতি সাধন করলেন জন রে ও লিনে। বাফোন প্রাণীবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন।

ফলাফল

উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিকদের কালজয়ী আবিষ্কারের ফলে মানুষের মন কুসংস্কার মুক্ত হল এবং তারা বিশ্বাস করতে লাগল যে পৃথিবীতে একটি নিয়মের রাজত্ব রয়েছে। ফলে মানুষের জীবনদর্শনে এবং প্রচলিত বিশ্বাসে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটল। তারা অন্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তির কষ্টিপাথরে সব কিছু যাচাই করতে চাইল।

দার্শনিক চিন্তাধারা

বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা তৎকালীন দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হল। দেকার্ত দর্শনশাস্ত্রকে অতীন্দ্রিয় জগৎ হতে মাটির পৃথিবীতে নিয়ে এসে বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর দাঁড় করাতে সচেষ্ট হলেন। হব্‌স্‌, স্পিনোজা, লক, হিউম, কাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিকরা দর্শনের মধ্যে বস্তুবাদের প্রাধান্য মেনে নেন, এমন কি তাঁরা ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হন। তাঁর মানবচরিত্র এবং মানব সমাজকে সূক্ষ্ম বিচার শক্তি দিয়ে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করলেন। তাঁরা বললেন মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রজ্ঞাশক্তির সাহায্যে যাকে সত্য বলে মনে করবে সেটা হবে একমাত্র সত্য।

সাধুবাদ

ধর্মের ক্ষেত্রেও মানুষ প্রজ্ঞাবাদী হয়ে উঠল। ধর্মের ক্ষেত্রে সাধুবাদ (Pietism)-এর উদ্ভব হল এবং ইউরোপে এক নতুন ধর্ম চেতনার সৃষ্টি হল। সাধুবাদ-এর প্রচারের ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে সন্দেহবাদ ও নাস্তিকতাবাদ দেখা দিল। প্রজ্ঞাবাদী-সন্দেহবাদীরা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করল। ধর্মকে 'প্রাকৃতিক' নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করা হল। পরিশেষে 'প্রাকৃতিক ধর্ম' মতের সৃষ্টি হল। এর ফলে পাশ্চাত্য জগতে ধর্মীয় সহনশীলতার সৃষ্টি হল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ নীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ভাব দেখা দিল।

সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতি শাস্ত্র

সমাজবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক চিন্তা : এই যুগে ব্যক্তি-মানুষের ওপর ধর্মের প্রভাব কমে যায়। মানুষ ও তার সমাজকে যুক্তি দিয়ে বিচার করা হল, ফলে সমাজ বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ইতিহাস লেখা শুরু হল। ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ হল। বুসো, ভিকো, নিভুর, গিবন, মমসেন, গ্রিন ইতিহাস লেখায় নতুন

দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এলেন। সমকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান রচনায় বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। রাষ্ট্র মানুষই সৃষ্টি করেছে নিজের সুবিধার জন্য। রাষ্ট্র তথা সরকার শাসনের মাধ্যমে ব্যক্তি-মানুষকে শোষণ করবে বলে মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেনি। রাষ্ট্রের কাজ হল মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করা। রাজার ভগবান-দত্ত ক্ষমতা বা অধিকার বলে কিছু নেই। জনসাধারণের সার্বভৌমতা সকল রাজার স্বীকার করা উচিত।

অর্থনীতি

অর্থনীতি ক্ষেত্রে এক নতুন মতবাদ দেখা দিল। এই মতবাদের নাম হল লেজা ফেয়ার (Laissez Faire) মতবাদ। এই মতবাদে বিশ্বাসী অর্থ-নীতিবিদরা প্রচার করলেন যে দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকা অমঙ্গলজনক ; জনসাধারণ নিজেদের অর্থনৈতিক ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারবে। ব্যবসা বাণিজ্যে অবাধ নীতিই একমাত্র আইনানুগ নীতি। বোকারিয়া, কোয়েনেস, এড্যাম স্মিথ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই নীতির প্রধান সমর্থক ছিলেন।

প্রজ্ঞাবাদের অবদান

প্রজ্ঞাবাদ প্রথমত প্রাকৃতিক নিয়মকে উচ্চাসনে বসাল এবং অতীন্দ্রিয়বাদকে অগ্রাহ্য করল। দ্বিতীয়ত, মানুষের বিচারশক্তিকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হল। বিচার এবং যুক্তির বলেই মানুষ সমস্ত রহস্য ও সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে প্রজ্ঞাবাদীরা বিশ্বাস করত। তৃতীয়ত, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস মানুষকে ছোট করে বলে প্রজ্ঞাবাদীরা কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর বেশি জোর দেন। সর্বশেষে তাঁরা সমাজে ও রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে 'ভগবান দত্ত ক্ষমতার' পরিবর্তে সামাজিক স্বার্থের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিল।

প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচার

প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচার: আঠারো শতকের প্রজ্ঞাবাদ সমকালীন রাজাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁরাও প্রজ্ঞাবাদকে গ্রহণ করেন এবং এর মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ পেলেন। ব্যক্তি-স্বার্থ বা ধর্মীয় স্বার্থের বদলে তাঁরা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা ভাবলেন।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগে ইউরোপে একটি নতুন রাজনৈতিক ধারণার আবির্ভাব ঘটে। এটিকে প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচার বলে এবং এই যুগে যে সব রাজা রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসক বলা হয়। পৃথিবীতে যুগে যুগে স্বৈরাচারী শাসকের আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু তাঁদের আমরা প্রজ্ঞাদীপ্ত

স্বৈরাচারী শাসক বলি না। প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকগণ ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগে দেখা দেন। সাধারণত ফরাসী বিপ্লবের ২৫ বৎসর পূর্ববর্তী যুগটিকে প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারী যুগ বলা হয় এবং যে সব রাজা ওই সময় রাজত্ব করেন তারা প্রায় সকলেই প্রজ্ঞাদীপ্ত ছিলেন।

প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারের কয়েকটী বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য স্বৈরাচারের ভেতর দেখতে পাওয়া যায় না ; যেমন—

(ক) **দর্শনের ও দার্শনিকদের প্রতি আগ্রহ**—এই গুণটি এ সময়কার প্রায় সকল স্বৈরাচারী শাসকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট নিজেই লেখক ছিলেন এবং সমসাময়িক দার্শনিকদের লেখা পড়তে ভালবাসতেন ; তাঁদের সঙ্গলাভ কামনা করতেন। ফরাসী দার্শনিক ভোলটেয়ারকে তিনি নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এবং বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেন। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের মধ্যেও কিছুটা দার্শনিকের ভাব ছিল। ভোলটেয়ারের সাথে তিনি পত্রালাপ করতেন এবং কয়েকজন ফরাসী দার্শনিককে নিজ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করেন। কয়েকটি পুস্তকও তিনি রচনা করেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের মধ্যে এই গুণটি সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর চরিত্র আদর্শ ও প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত ছিল।

(খ) **রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে নতুন ধারণা**—এই যুগের শাসকরা যদিও নিজেদের ক্ষমতায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং শাসন-ক্ষমতার ব্যাপারে জনসাধারণের যে কোন স্থান থাকতে পারে তা তাঁরা স্বীকার করেন নি, তবে রাজকর্তব্য সম্বন্ধে তাঁদের এক নতুন ধারণা জন্মায় যেটি অন্য যুগে দেখতে পাওয়া যায় না। জনসাধারণের সেবা করাই রাজার কর্তব্য—এটি তাঁরা মানতেন এবং নিজেদের রাষ্ট্রের প্রধান ভৃত্য বলে মনে করতেন।

(গ) **ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতা**—এই যুগের রাজারা সকলেই চার্চের ক্ষমতা হ্রাসের পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিতীয় জোসেফ এর জন্য খুবই চেষ্টা করেছিলেন।

শাসন সংস্কার : এ যুগের প্রত্যেক রাজাই নিজ নিজ রাজ্যে নানা বিষয়ে সংস্কার সাধন করেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শাসন ব্যাপারে সংস্কার তাঁরা অল্পবিস্তর করেছিলেন। এর ফলে শাসন-ব্যবস্থা কিছুটা কার্যকরী হয়। কিন্তু কেউ

রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেননি। জনসাধারণের ক্ষমতার প্রকৃত মুল্যায়ন তাঁরা করতে অক্ষম ছিলেন।

প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকরা বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও সফলতা লাভ করতে পারেননি। এর কারণ তাঁদের প্রজাসাধারণ এ সকল সংস্কার খোলামনে গ্রহণ করতে পারেনি। এ ছাড়া শাসকগণ যেরূপ শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ছিলেন তাঁদের প্রজাপুঞ্জ সেরূপ ছিল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিপ্লবের যুগ—ইংরেজরা আমেরিকায় বসবাস করতে যায়। কেউ কেউ নির্বিবাদে ধর্ম আচরণ করবার জন্যও যায় তাদের মধ্যে পিউরিটানগণ অন্যতম। তা ছাড়া রোমান ক্যাথলিক ও অন্যান্য খ্রীষ্টানগণের দ্বারাও কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এইরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতলান্তিকের তীরে তেরটি বিভিন্ন ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এই উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ডের শাসনাধীনে থাকলেও উপনিবেশের প্রতিনিধিদের হাতেই শাসনভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাপারে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ছিল না।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

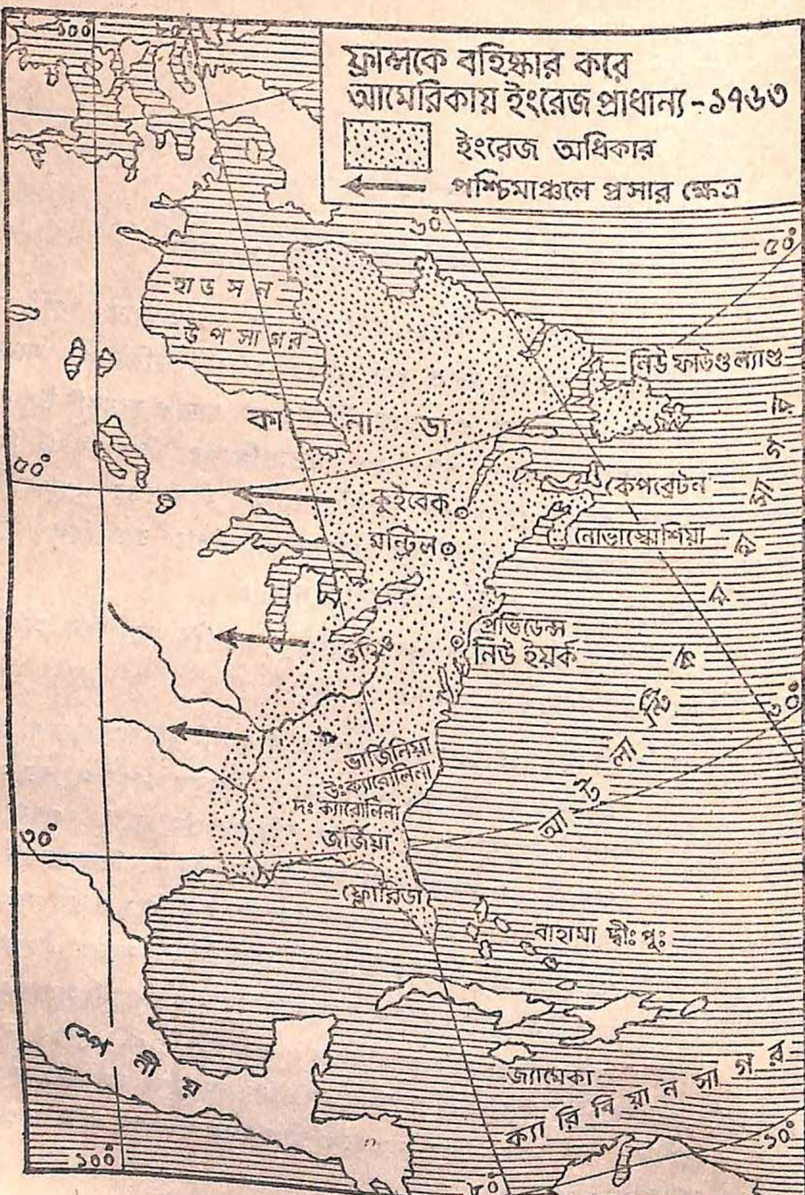
আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে—

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন কারণ

যেমন 'আব্রাহামের মালভূমিতে উলফের বিজয় লাভের সাথে সাথেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস শুরু হয়।' সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের নিকট নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা সেনাদল গঠন ও যৌথ স্বার্থের খাতিরে রসদ প্রভৃতি সংগ্রহ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উপনিবেশের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে অনেক কিছু শিখতে পেরেছিল। তাছাড়া, এই যুদ্ধের ফলে কলোনীগুলি তাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত হল এবং ন্যায্য অধিকারের দাবীতে ইংল্যাণ্ডের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হতে ভয় পেল না। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে বলা হয় যে :—

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রভাব

রাজা তৃতীয় জর্জ এবং পার্লামেণ্ট উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করেছিল, সরকারে প্রতিনিধিত্ব না দিয়ে কর ধার্য করেছিল, তাদের বাড়ীতে


ফ্রান্সকে বহিষ্কার করে
আমেরিকায় ইংরেজ প্রাধান্য - ১৭৬৩
ইংরেজ অধিকার
পশ্চিমাঞ্চলে প্রসার ক্ষেত্র
হাডসন
উপসাগর
কানাডা
নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড
কেপব্রেটন
নোভাস্কোশিয়া
কুইবেক
মন্ট্রিল
প্রভিডেন্স
নিউ ইয়র্ক
ভার্জিনিয়া
উঃ ক্যারোলিনা
দঃ ক্যারোলিনা
জর্জিয়া
ফ্লোরিডা
বাহামা দ্বীঃপুঃ
জ্যামেকা
ক্যারিবিয়ান সাগর
৫০°
৩০°
১০°
৮০°
১০০°

সৈন্য রাখতে বাধ্য করেছিল। একারণগুলি কিন্তু বাহ্য, এগুলির পিছনে ছিল কয়েকটি মূল বিষয়; এগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ মুখ্য হল বৃটিশ সাম্রাজ্যের রূপ এবং তার সাথে কলোনীগুলির সম্পর্ক প্রসঙ্গে পরস্পরবিরোধী মতবাদ।

প্রধান কারণ

আমেরিকানদের মতে তেরটি উপনিবেশ হল বৃটিশ অধীনস্থ তেরটি স্বায়ত্ত-শাসনশীল অঞ্চল। এই সমস্ত উপনিবেশের অধিবাসীরা জাতিতে ছিল ইংরেজ। তাঁদের ধমনীতে যেমন ইংরেজ রক্ত প্রবাহিত ছিল ঠিক তেমনি তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারাও ছিল সতের শতকের ইংরেজ চিন্তাধারা ও আদর্শের অনুরূপ। এ কারণে ম্যাগনা-কার্টার সময় থেকে ইংরেজরা যেসব সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে, উপনিবেশকারীও সে সব সমানাধিকার পাবার অধিকারী বলে নিজেদের মনে করত। ইংল্যাণ্ডের রাজার প্রেরিত গভর্ণর তাদের আইন-সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতেন। এতে আমেরিকানদের তেমন আপত্তি ছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই গভর্ণর আইন সভাকে লঙ্ঘন করতেন না।

আমেরিকানরা ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল

উপনিবেশগুলি সম্বন্ধে ইংরাজ সরকারের শোষণ নীতির স্বরূপঃ
১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উপনিবেশকারীদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দেখা দেয়নি। এর কারণ হল উপনিবেশকারীরা ইংরেজ সরকার কর্তৃক স্থাপিত কোন করকে শোষণ করবার যন্ত্র হিসেবে মনে করেনি এবং তারা করগুলি না দিলেও কিছু যেত আসত না। ইংরেজ সরকার কর আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাত না। কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের জন্য ইংরেজ সরকারের বহু ঋণ হয়েছিল। আমেরিকায় অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করা ইংল্যাণ্ডের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অথচ উপনিবেশগুলিকে ফ্রান্স ও স্পেনের আক্রমণের হাত হতে রক্ষা করবার জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহর ও সামরিক বাহিনী আমেরিকায় রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে ইংরেজ সরকার মনে করল। আর এর জন্য যা ব্যয় হবে তা উপনিবেশগুলির বাসিন্দাদের নিকট হতে করের মাধ্যমে আদায় করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। তাছাড়া রাজা তৃতীয় জর্জ এবং তাঁর সরকার আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা নিজেদের হাতে নিলেন এবং উপনিবেশবাসীদের ওখানে বসতি স্থাপনের অধিকার নেই বলে ঘোষণা করলেন। যারা অ্যালিঘেনি পর্বতমালা পেরিয়ে ওই অঞ্চলে বসবাস সুরু করেছিল তাদের তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হল। পশ্চিমাঞ্চলের বিপুল সম্পদ হতে ঔপনিবেশিকরা নিজেদের বঞ্চিত বলে

মনে করল এবং তারা ইংরেজ সরকারের এই নীতি বানচাল করে দিতে বদ্ধপরিকর হল। ঠিক এই সময় কোয়ার্টারিং এ্যাক্ট মারফৎ ইংল্যাণ্ড হতে নির্দেশ এলো যে সৈন্যদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিকদের সাহায্য করতে হবে।

ঔপনিবেশিকদের সাথে ইংরাজ সরকারের সংঘর্ষ বাধার অন্য একটি কারণ হল শিল্প বাণিজ্যের দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ আমেরিকার সম্পদ কে ভোগ করবে— ইংল্যাণ্ডের পুঁজিপতিগণ, না ঔপনিবেশিকগণ? তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের হাত হতে রেহাই না পেলে আমেরিকার শিল্প-বাণিজ্যে উন্নতি যে অসম্ভব তা ঔপনিবেশিকগণ বুঝতে পারল। অর্থনৈতিক স্বার্থ সংঘাত এতই কঠোর ও বাস্তব যে রক্তের সম্পর্কের দোহাই দিয়ে এটিকে চেপে রাখা যায় না। উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রেও এটি স্পষ্ট বোঝা গেল। ঔপনিবেশিকগণ জাতিতে ইংরেজ হয়েও তারা ইংল্যাণ্ডের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চাইল না।

বিভিন্ন কর স্থাপন: ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী জর্জ গ্রেনভিল প্রথমে একদল শুল্ক আদায়কারী এবং টহলদারী জাহাজ আমেরিকায় পাঠিয়ে নৌ-চলাচল আইন আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে চাইলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পার্লামেণ্টে স্টাম্প অ্যাক্ট নামক আইন পাস করলেন। এতে ঠিক হল যে, আমেরিকায় উপনিবেশগুলিতে সংবাদপত্র, পুস্তিকা, এবং দলিল দস্তাবেজের উপর স্টাম্প শুল্ক আদায় করা হবে। এই শুল্ক হতে যে অর্থ আসবে তা থেকে আমেরিকায় ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহের সহায়তা হবে। এই সময় কিন্তু বৃটেনে বা আমেরিকায় কেউ ভাবেনি যে এই এ্যাক্টের প্রতিক্রিয়া সাংঘাতিক হবে। কিন্তু আইনটি চালু হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকটি উপনিবেশ এটিকে প্রতিরোধ করতে লাগল। ভার্জিনিয়ায় প্যাট্রিক হেনরি হাউস অব্ বার্জেস-এ ঘোষণা করলেন ভার্জিনিয়াবাসীদের উপর কর ধার্য করার অধিকার ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের নেই। ম্যাসাচুসেটসেও স্টাম্প অ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠল। সেখানে জেমস্ ওটিস এবং স্যামুয়েল অ্যাডামস্ বৃটিশ সরকারকে কঠোরভাবে সমালোচনা করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে আইন সম্মতভাবে প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর ধার্য করার অর্থ হল জনসাধারণকে ক্রীতদাসে পরিণত করা। অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হল। স্টাম্প বিক্রেতারা জনসাধারণের চাপে পড়ে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। উপনিবেশগুলিতে কয়েকটি চরমপন্থী দলও গড়ে উঠল। নয়টি উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে স্টাম্প এ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন এবং ঘোষণা

প্রত্যক্ষ কারণ

স্টাম্প আইন

আমেরিকায় প্রতিক্রিয়া

করলেন যে উপনিবেশগুলিতে কর ধার্য করার অধিকার ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের নেই, সেখানকার আইনসভাগুলিরই আছে।

স্টাম্প অ্যাক্ট মাত্র এক বছর চালু ছিল। ইংরেজ সরকার এটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলেন। জর্জ গ্রেনভিল পদত্যাগ করলেন। আমেরিকানগণ খুবই উল্লসিত হল কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই আরো কয়েকটি (আমেরিকানদের দিক হতে) বিশ্রী আইন জারী করা হল। বৃটেনের নব নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী লর্ড রকিংহাম এই সময় পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। এই প্রস্তাবে বলা হল যে উপনিবেশগুলিতে কর ধার্য করার অধিকার ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের আছে। তাঁর এই প্রস্তাব পার্লামেন্টে গৃহীত হল। এবং এর ফলস্বরূপ মন্ত্রী টাউনসেণ্ড উপনিবেশগুলিতে কাচ, সীসা রঙ্, কাগজ এবং চায়ের ওপর আমদানী শুল্ক চাপালেন। এই মর্মে ঘোষণা করা হল যে এই শুল্ক থেকে যে অর্থ আসবে তা থেকে উপনিবেশগুলিতে নিযুক্ত গভর্নরদের বেতন দেওয়া হবে। এতদিন পর্যন্ত গভর্নররা কিন্তু ঔপনিবেশগুলির অর্থভাণ্ডার হতেই বেতন পেয়ে আসছিলেন। এই নতুন আইন দ্বারা ইংরেজ সরকার ঔপনিবেশিকদের বোঝাতে চাইল যে ইংরেজ সরকার আমেরিকানদের সমস্ত ব্যাপারটিতে অধিকতর কর্তৃত্ব খাটাতে চায়। এটা ঠিক যে ইংরেজ সরকারের এই করধার্য ব্যাপারে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য যতটা না ছিল ততটা ছিল শুধু ইংলণ্ড যে তার উপনিবেশের ওপর কর ধার্য করতে পারে সেটাই প্রতিপন্ন করা।

ইংরেজ সরকারের অনমনীয় মনোভাব

টাউনসেণ্ড আইন ও এর ফলাফল

উপনিবেশগুলিতে আবার জোর প্রতিবাদ উঠল। বৃটিশপণ্য বর্জন করবার আন্দোলন বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়ে গেল এবং বৃটেনও খুব চটে গেল। ইংরেজ সরকার ম্যাসাচুসেটসের আইনসভা ভেঙে দিলেন এবং বস্টনে দু রেজিমেণ্ট সৈন্য পাঠালেন।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থ বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি অন্যান্য জিনিসের ওপর আমদানী শুল্ক তুলে দিলেন কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সম্মান হানির ভয়ে 'চা'-এর ওপর আমদানী শুল্ক রদ করলেন না। ঔপনিবেশিকরা যুদ্ধ সংকেতের দ্বারা এর উত্তর দিল।

লর্ড নর্থের নতুন আইন

ইতিমধ্যে বস্টন শহরে বস্টনবাসী ও ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে হাতাহাতি হল। কিন্তু এটিকে ঔপনিবেশিকরা খুব বড় করে দেখল। এর নাম দিল তারা 'বস্টন ম্যাসাকার' হত্যাকাণ্ড যদিও মাত্র পাঁচজন আমেরিকান মারা যান। আমেরিকা বাসীদের

সন্তুষ্ট করার জন্য ইংরেজ সরকার বস্টন থেকে ইংরেজ সৈন্য সরিয়ে নেয় এবং চায়ের শুল্ক পাউণ্ড প্রতি ১ শিলিং হতে মাত্র ৩ পেনিতে হ্রাস করে। কিন্তু ফল কিছুই হল না। এই সময় বস্টন সহরে কয়েকজন চরমপন্থী আমেরিকান যুবক চা বোঝাই ইংরেজ জাহাজে রেড ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে উঠে ৩৪২ পেটি চা সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। আমেরিকানরা এই ঘটনাটিকে 'বস্টন টি পার্টি' নামে অভিহিত করল।

সমুদ্রে চা নিক্ষেপ ও এর ফল

আমেরিকানদের এই কাজে তৃতীয় জর্জের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি বস্টনকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যোগী হলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট রাজার নির্দেশে ইনটলারেবল অ্যাক্টস্ গৃহীত হল। এই আইন অনুসারে যতদিন পর্যন্ত জলে ফেলে দেওয়া চা-এর মূল্য মিটিয়ে দেওয়া না হবে ততদিন পর্যন্ত বস্টন শহর অবরুদ্ধ থাকবে।

আমেরিকার নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিরা ইংল্যাণ্ডের এই পীড়নমুলক কার্যে ব্যথিত হল। কিন্তু তাঁদের মতামত ইংরেজ সরকার গ্রাহ্য করল না। এদিকে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় অধিকাংশ উপনিবেশের প্রতিনিধিরা নীতি নির্ধারণে মিলিত হলেন। এটাই হল প্রথম মহাদেশীয় সম্মেলন। এই সম্মেলন খুব সতর্ক ও সংযত ভাবে অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে একটি অধিকারের সনদ তৈরি করা হল এবং সেটিকে ইংল্যাণ্ডে পাঠান হল। এই সনদে উপনিবেশবাসীরা তাদের স্বাধীনতায় পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানাল এবং ঘোষণা করল যে আমেরিকার সর্বত্র বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। উপনিবেশগুলিতে এই সময় জাতীয়তাবাদী শক্তি বেশ জোরদার হচ্ছিল। টম পেইন ছিলেন সুলেখক। তিনি জাতিতে ছিলেন ইংরেজ। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিলাডেলফিয়ায় বসবাস শুরু করেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই বৃটেনের নাগপাশ ছিন্ন করবার জন্য তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রচণ্ড দাবি তোলেন। তাঁর রচিত Common Sense নামক গ্রন্থটি আমেরিকানদের বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগকে নাড়া দিল। পেইন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করলেন যে, আবেদন-নিবেদন করে কিছু হবে না, ইংল্যাণ্ড হল ইউরোপের —আমেরিকা তার নিজস্ব। এই পুস্তকটি প্রচুর বিক্রি হল এবং জনসাধারণকে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। উত্তেজনা যত বাড়তে থাকল যুদ্ধ তত এগিয়ে এল।

কংগ্রেসের অধিবেশন

টম পেইনের প্রভাব

এই বিপ্লবাত্মক পরিবেশে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে লেক্সিংটন-এ ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সাথে আমেরিকানদের ছোটখাটো সংঘর্ষ বেধে গেল। আর এর সাথে সাথে আমেরিকার

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ একত্র হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। স্বাধীনতার ঘোষণায় দৃঢ় এবং পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দেওয়া হল যে উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। এছাড়া এই ঘোষণায় বলা হল :

"আমরা এই সত্যগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি যে, সকল মানুষ জন্মসূত্রে সমান, সৃষ্টিকর্তা তাদের কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য অধিকারে ভূষিত করেছেন ; এই সবের মধ্যে আছে জীবনধারণ, স্বাধীনতা এবং সুখানুসরণের অধিকার।"

স্বাধীনতার ঘোষণা

ইউরোপের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ থেকে যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার সৃষ্টি হচ্ছিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্বেচ্ছাচারের ওপর চরম আঘাত হেনে বলা হল যে সরকার হল জনসাধারণের সেবক, প্রভু নয়।

ইংল্যাণ্ড ও অমেরিকার এই সংগ্রামে কোন্ পক্ষ ন্যায় বা কোন্ পক্ষ অন্যায় করেছিল সে প্রশ্নের ঠিক জবাব দেওয়া কষ্টসাধ্য। উভয় পক্ষই নিজ নিজ স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করেছিল এবং পরিণামে উভয়ের মধ্যেই গভীর অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল। শেষে মাথাগরম লোকেরাই যুদ্ধ ত্বরান্বিত করে।

সাত বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। প্রথমে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে জয়লাভ করে কিন্তু ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হতে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় শুরু হয়। এই সময়ে ফ্রান্স ও স্পেন আমেরিকানদের পক্ষে যোগ দেয়। এছাড়া রাশিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক, প্রাশিয়া, পর্তুগাল এবং অষ্ট্রিয়া 'সশস্ত্র নিরপেক্ষতা লীগ' নামে একটি সংঘ গড়ে তোলে। ফলে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি শত্রুভাবাপন্ন একতাবদ্ধ ইউরোপের সৃষ্টি হল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স আমেরিকানদের সরাসরি সামরিক সাহায্য দিতে থাকল এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফ্রান্সের দেখাদেখি স্পেন ও হল্যাণ্ড আমেরিকানদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সেনাপতি কর্নওয়ালিশ জর্জ ওয়াশিংটনের নিকট ইয়র্ক টাউনে আত্মসমর্পণ করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড প্যারিসের সন্ধির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ সমাপ্ত করল। এই সন্ধি দ্বারা তেরটি উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হল।

যুদ্ধ

ফলাফল : আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ আমেরিকার বিপ্লবকে জয়ী করল, পরোক্ষভাবে দৈবস্বত্ব রাজতন্ত্রের ওপর আঘাত হানল। জনগণের অধিকার সার্বভৌম বলে স্বীকৃত হল এবং সমগ্র বিশ্বে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করল।

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ডে চরমপন্থরী নিজেদের ভুল বুঝতে পারল এবং প্রগতিবাদীরা জয়যুক্ত হল। ইংল্যাণ্ড পুরানো ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন করল।

ফ্রান্সের পক্ষে এই যুদ্ধ বিপর্যয় আনল। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ফ্রান্সের রাজকোষ নিঃশেষিত হল। ফরাসী দেশে পৃথিবীবিখ্যাত বিপ্লব দেখা দিল। ফরাসী বিপ্লবীগণ আমেরিকানদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। মানবমুক্তির ইতিহাসে এক সুদিনের সূচনা করে। জগতের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও আশাহত মানুষকে নতুন পথের সন্ধান, দেয় "যখন কোন সরকার অত্যাচারী হয়ে ওঠে তখন তাকে পরিবর্তিত করে বা তাকে ভেঙে নতুন সমাজ গঠন করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে।"

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনেকে নতুন জাতির অভ্যুত্থান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষ এবং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে আমেরিকার এই সংগ্রাম একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মূলতঃ, আমেরিকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই এই সংগ্রামের কারণ। সেদিক দিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসের অন্যতম যোগসূত্র হ'ল এই সংগ্রাম।

ঔপনিবেশিকদের জয়লাভের কারণ: নানা কারণে ঔপনিবেশিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করে। প্রথমত ইংরেজ সরকার কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ চালাতে পারেনি। এতে আমেরিকানদের সুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত ইংল্যাণ্ডের শত্রুরা ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ঔপনিবেশিকদের দিকে যোগ দেয় এবং ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের সাহায্য ছাড়া উপবেশিকদের যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হত। ইউরোপও আমেরিকার নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্তি ছিল তারা বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলন করতে সমর্থ হয়েছিল এবং দেশীয় শিল্প গড়ে তুলতে পেরেছিল। চতুর্থত, মহাসমুদ্রের ব্যবধান এবং ইংল্যাণ্ড হতে আমেরিকার দূরত্ব আমেরিকানদের সহায়ক হয়েছিল। পঞ্চমত, ওয়াশিংটনের প্রতিভা ও সংগঠন শক্তি জয়লাভের অন্যতম কারণ। পরিশেষে, ঔপনিবেশিকদের অদম্য সাহস, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও দুর্নিবার স্বাধীনতা লিপ্সা তাদের বিজয়ী করেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

ফরাসী-বিপ্লব ও নেপোলিয়ন

সূচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ইউরোপের সভ্যতার পথ প্রদর্শক ছিল। ফ্রান্সের রাজসভার ঐশ্বর্য ও আদব-কায়দা সকল দেশের আদর্শ স্থানীয় ছিল। এরূপ দেশে যখন বিপ্লব দেখা দিল তখন সমগ্র ইউরোপ বিস্মিত হল। ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

পঞ্চদশ লুই

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা: চতুর্দশ লুই-এর পৌত্র পঞ্চদশ লুই বিলাসী এবং আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। তাঁর অকর্মণ্যতার ফলে সরকারী কর্মচারীরাও অপদার্থ হয়ে ওঠে। অসংখ্য পদ্ধতিতে সরকারী পদ খেতাব ও সুবিধা বিক্রী করা হত। ফলে ফরাসী সমাজের ভিত্তি আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিশেষ সুবিধা, বিশেষ কনসেসন প্রভৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। পঞ্চদশ লুই বলেছিলেন, 'আমার পরে মহাপ্লাবন আসবে'। সত্য সত্যই ষোড়শ লুই-এর রাজত্বকালে সেই মহাপ্লাবন দেখা দিল।

ষোড়শ লুই-এর অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করবার প্রচেষ্টা

ষোড়শ লুই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেন। ফ্রান্সের আর্থিক-সংকট তখন চরমে উঠেছে। জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল। ষোড়শ লুই-এর সংস্কারক বা জাতির ত্রাতা হবার মত যোগ্যতা ছিল না। তবুও তিনি ফ্রান্সকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে রক্ষা করবার জন্য তুর্গো (Turgot)-কে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করলেন। তুর্গো অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি শিল্প বাণিজ্য ব্যাপারে অবাধ নীতি গ্রহণ করেন। অভিজাত ও যাজক সম্প্রদায়ের ওপর কর বসাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তুর্গোর বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদীরা আন্দোলন শুরু করে। ফলে দুর্বল চিত্ত ষোড়শ লুই তুর্গোকে পদচ্যুত করে নেকারকে অর্থসচিব নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর পাচ বছরের মন্ত্রিত্বকালে ফ্রান্সের রাজস্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসেন। কিন্তু যখন তিনি রাজপরিবারের ব্যয়সঙ্কোচ করতে যান তখন তিনি রানী মেরী আন্তোয়নের বিরাগভাজন হন এবং রানীর কথায় ষোড়শ লুই নেকারকে বিদায় দেন। নেকারের পরিবর্তে ক্যালোনি অর্থমন্ত্রীর পদ পান। তিনি সর্বনাশা

তুর্গো

নেকার

সুদের হারে ঋণ নিয়েও আয়ব্যয়ের সমতাসাধন .করতে পারলেন না। এই সময় আবার আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্স যোগ দেয় এবং এই যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স দেউলিয়া হয়। কোন উপায় না দেখে ক্যালোনি অভিজাত শ্রেণীর ওপর কর বসাবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে রাজাকে জানালেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা যোড়শ লুই ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪৫ জন প্রধান জমিদার, ধর্মযাজক এবং প্রাদেশিক শাসকদের এক বৈঠকে ডাকলেন। এই বৈঠকে কিছুই হল না। অভিজাতশ্রেণী নিজেদের সুবিধাগুলি ছাড়তে রাজী হল না বরঞ্চ ক্যালোনির পদত্যাগ তারা দাবি করল। অবশ্য এই সভা কর স্থাপনের প্রশ্নটি স্টেটস্ জেনারেলের নিকট প্রেরণ করবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিল।

ক্যালোনি



যোড়শ লুই

ক্যালোনির পর ব্রিয়ান নতুন অর্থমন্ত্রী হলেন। তিনি জনসাধারণকে মিষ্টি কথা ও ভূয়া আশ্বাস দিলেন। কিন্তু জনমত আর এতে ভুলল না। পার্লামেণ্ট অব্ প্যারিস্ নামক যে বিচার সভা ফ্রান্সে ছিল সেটি কর আদায়ের জন্য নতুন রাজকীয় আদেশ অনুমোদন করতে অস্বীকার করল এবং ঘোষণা করল যে স্টেটস্ জেলারেল ছাড়া আইন অনুযায়ী কর স্থাপনের অধিকার কারও নেই। এর ফলে রাজা পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন। কিন্তু জনসাধারণ প্রতিবাদ জানাল এবং স্টেটস্ জেনারেল আহ্বানের দাবি করল। যোড়শ লুই বাধ্য হয়ে এই দাবি মেনে নিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় নেকারকে অর্থমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করলেন এবং স্টেটস্ জেনারেল মহাসভা গঠনের জন্য নির্বাচনের আদেশ দিলেন। ১৭৫ বছর পরে নতুন করে স্টেটস্ জেনারেল ডাকা হল। স্টেটস্ জেনারেল সভা বরাবর যাজক, অভিজাত ও জনসাধারণ—এই তিন শ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হত। প্রত্যেক স্টেটের একটি করে ভোট ছিল এবং প্রত্যেক স্টেট পৃথকভাবে বসত। আগেকার দিনে রাজাকে পরামর্শ দেওয়াই এই সভার প্রধান কাজ ছিল।

ব্রিয়ান

স্টেটস্ জেনারেল আহ্বান, ১৭৮৮

এর স্বরূপ

১৭৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ফ্রান্সের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল হতে বিভিন্ন নির্বাচন মণ্ডলী নিজ নিজ অঞ্চলের অবস্থা বর্ণনা করে এবং নানা বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করে সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবগতির জন্যে বিবরণী পাঠাল। এ সব বিবরণী ও সুপারিশকে ফরাসী ভাষায় বলা হয় ক্যাহিয়ার্স (cahiers)। এগুলি হতে তৎকালীন ফরাসী জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে ধারণা জন্মে। তবে এগুলি রাজদ্রোহমূলক ছিলনা।

ক্যাহিয়ার্স

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্টেটস্ জেনারেল-এর অধিবেশন বসল। সমাজের 'তৃতীয় শ্রেণী' হতে যে সব প্রতিনিধি এ সভায় এলেন তাঁরা সকলেই জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। তাঁরা প্রথমেই দাবি করলেন যে, সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিরা একত্রে বসবে এবং জনপ্রতি একটি ভোট দানের অধিকার থাকতে হবে। রাজা ও অভিজাত শ্রেণী এতে বাধা দিল। অবশেষে বিরক্ত হয়ে 'তৃতীয় শ্রেণী' নিজেদের 'জাতীয় পরিষদ' বলে ঘোষণা করল এবং অন্যান্য শ্রেণীকে জাতীয় সংস্কারে আত্মনিয়োগ করবার জন্য আহ্বান জানাল। রাজা প্রথমে বাধা দিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত সভাকক্ষ তালাবন্ধ করে দিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা যখন এটি দেখলেন তখন তাঁরা পার্শ্ববর্তী টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হলেন এবং সমবেত সকলে একটি কঠিন শপথ গ্রহণ করলেন—দেশের জন্য উপযুক্ত সংবিধান রচনা না করে তাঁরা জাতীয় পরিষদ ছেড়ে যাবেন না। এই শপথ গ্রহণ পর্ব ইতিহাসে টেনিস কোর্ট শপথ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অনেকের মতে এই ঘটনা হতেই ফরাসী বিপ্লব শুরু হল।

স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন

জাতীয় পরিষদ গঠন

টেনিস কোর্ট শপথ

এরপর তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিরা রাজকীয় স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের বাণী প্রচার করলেন। রাজা এদের দাবী উপেক্ষা করে এক ঘোষণা জারি করলেন যে তিন শ্রেণী যেন পৃথক ভাবে ভোট দেয়। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর নেতা মিরাবো জবাব দিলেন 'আমরা এখানে জনসাধারণের ইচ্ছাক্রমে এসেছি এবং শক্তি, প্রয়োগ ছাড়া আমরা এ স্থান হতে সরব না।' চাপে পড়ে রাজা তিনটি শ্রেণীর প্রতিনিধিদের একই কক্ষে অধিবেশনে সমবেত হতে দিলেন। ফলে স্টেট্স্ জেনারেল সভা জাতীয় সংবিধান সভায় পরিণত হল। এই সভা ফ্রান্সের নতুন সংবিধান রচনায় আত্মনিয়োগ করল। কিন্তু এটি শান্তিপূর্ণভাবে হল না। জুলাই মাসে হঠাৎ এক গুজব রটল যে প্যারিসের জনসাধারণকে জব্দ করবার জন্য

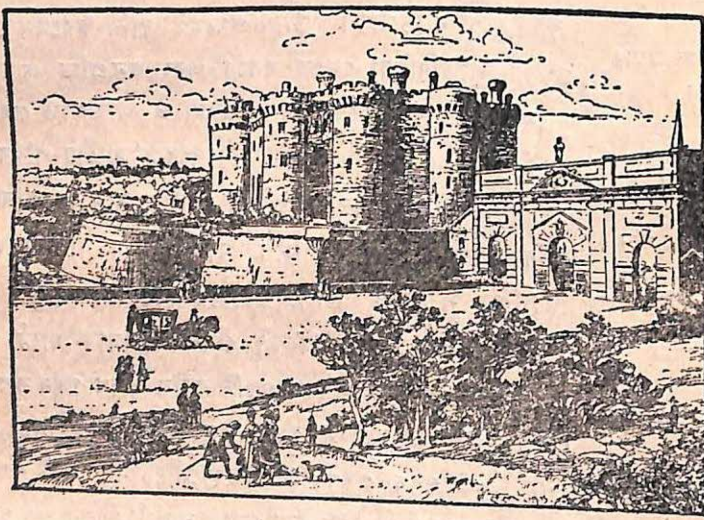
জাতীয় সংবিধান সভা গঠন

রাজা অনেক সৈন্য আমদানী করেছেন। এই গুজব ফ্রান্সের জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করল। প্যারিসের জনসাধারণ হিংসার পথ বেছে নিল।

বাস্তিলের পতন

প্যারিসে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখে জনতা রাজার স্বেচ্ছাচারিতার ও অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গ অধিকার করে ধ্বংস করে দিল। বাস্তিলের পতন পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আধুনিক ঐতিহাসিকরা বাস্তিল আক্রমণকেই ফরাসী বিপ্লবের শুরু বলে মনে করেন।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ ঃ ফরাসী বিপ্লবের বহুবিধ কারণ ছিল—অর্থ-নৈতিক



বাস্তিল দুর্গ

সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক। প্রকৃত পক্ষে, ফ্রান্স এমন একটি অবস্থায় পৌছেছিল যখন তার ঘুণে-ধরা প্রতিষ্ঠানগুলি আর তাকে ধরে রাখতে পারল না।

অর্থনৈতিক

ফ্রান্সে সকল সুখ-সুবিধা ধনী অভিজাত ও যাজকসম্প্রদায় ভোগ করত। তাঁদের কোনরকম কর দিতে হত না। সামন্ত-তন্ত্রের নীতি অনুসারে কৃষকেরা বেগার খেটে মরত আর ধনাঢ্য অভিজাতেরা নিশ্চিন্ত বিলাসে কালাতিপাত করত। দেশের ভাল ভাল জমি তাদের দখলে ছিল। রাষ্ট্রের ভালো ভালো চাকরি তারাই পেত। রাষ্ট্রের সমগ্র আয়ের প্রায় সমস্তটাই সাধারণ প্রজাদের নিকট হতে নেওয়া হত। রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত কর ছাড়াও জনসাধারণকে ধর্মযাজকদের গীর্জা কর এবং জমিদারদের সামন্ত প্রথা অনুযায়ী কর দিতে হত। এ ছাড়া পরোক্ষ করের অন্ত ছিল না। করসংগ্রহ পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ ছিল।

ফ্রান্সে সামাজিক অসাম্যের অন্ত ছিল না। সমাজে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণী ছিল। যাজক শ্রেণীকে বলা হত **প্রথম শ্রেণী**। অভিজাতগণকে **দ্বিতীয় শ্রেণী** বলা হত। এই দুই শ্রেণীই রাষ্ট্রে অধিকারপ্রাপ্ত ছিল। সাধারণ লোকদের নিয়ে গঠিত ছিল **তৃতীয় শ্রেণী**। এই শ্রেণীতে মধ্যবিত্ত, কৃষক, মজুর সকলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরাক্রান্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যথেষ্ট অর্থসম্পদ ও শিক্ষা-সংস্কৃতি থাকলেও তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কিছুই ছিল না। রাজ্যের উচ্চপদ ও প্রতিপত্তি হতে তারা বঞ্চিত ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বিক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব পরিচালিত করে। এ কারণে কেউ কেউ বলে থাকেন যে ফরাসী বিপ্লব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক ক্ষমতালাভের আন্দোলনের ফলেই দেখা দেয়। এই অভিমত আংশিক সত্য হলেও সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ ফরাসী বিপ্লব কৃষক, মজুর প্রভৃতি সর্বহারাদের সমবেত চেষ্টায় সংগঠিত হয়েছিল, কেবলমাত্র মধ্যবিত্তদের সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা লাভের স্পৃহায় নয়।

সামাজিক

ফ্রান্সে স্বৈরতন্ত্র প্রচলিত ছিল। রাজার কার্যে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও ছিল না। রাজা ইচ্ছা করলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য যে কোন লোককে বিনা বিচারে বন্দী রাখতে পারতেন। তাঁর অনুগ্রহভাজন অভিজাত শ্রেণীও 'আটকপত্র' সংগ্রহ করে 'তৃতীয় শ্রেণীর' লোকদিগকে নিগ্রহ করতে পারত। এই অবিচার ও নির্যাতনের কোনরূপ প্রতিকার ফ্রান্সে অন্তত ছিল না। একে স্বৈরতন্ত্র না-বলে অত্যাচারতন্ত্র বললেই ভাল হয়। বিপ্লবের ঠিক পূর্বে রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ও বিচার-ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। রাজশক্তি যদি পঙ্গু না হয়ে পড়ত তা হলে অত শীঘ্র বিপ্লব ঘটত কিনা সন্দেহ।

রাজনৈতিক



রুশো

এই অবস্থায় নিপীড়িত, বিক্ষুব্ধ ফরাসীবাসীদের মনে আরও ইন্ধন জোগাল ফরাসী চিন্তানায়কদের রচনা-সমূহ। ফ্রান্সে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটবার বহু পূর্বেই ভাব-জগতে বিপ্লব দেখা দেয়। আঠারো শতকের ফরাসী দর্শন ও সাহিত্যের মধ্যে একটা স্বাধীন

অনুসন্ধিৎসু ও বিপ্লবী চিন্তাধারার পরিচয় মেলে। এই যুগের ফরাসী চিন্তাবিদ্‌রা লেখনীর মাধ্যমে ফরাসী সমাজের নানাবিধ বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যের উদ্‌ঘাটন করেন। এবং এইভাবে তাঁরা জনসাধারণের বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলেন। **ভল্টেয়ার** তীব্র কশাঘাত করলেন স্বৈরাচরের অন্যতম স্তম্ভ চার্চকে। তাঁর বিদ্রূপে ও শ্লেষে শিক্ষিত লোকদের মানসিক প্রসারতা ঘটল। ভল্টেয়ারের পর **রুশো** সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন। তাঁর রাজনৈতিক মত ছিল যে, রাজা ঈশ্বর-দত্ত অধিকারের বলে রাজ্য শাসনের অধিকারী নন, প্রজারাই রাজাকে রাজ্য শাসনের অধিকার দিয়েছে, এবং যে রাজা প্রজাদের প্রতি কর্তব্য পালন করেন না তাঁকে প্রজারা বিতাড়িত করতে পারে।

বৌদ্ধিক

রুশোর জ্বালাময়ী লেখা ফরাসীদের মনে উন্মাদনা এনেছিল। সেজন্য রুশোকে বলা হয় ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু। ভল্টেয়ার ও রুশো ছাড়াও অনেক চিন্তাশীল লেখক এই সময় তাঁদের লেখনী দ্বারা যা কিছু অসৎ ও অসামঞ্জস্য-পূর্ণ তার সমালোচনা করেছিলেন। **ডিডেরো** এবং **এলেমবার্ট** এই সময় বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া **মন্টেস্কু** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দি স্পিরিট অব ল'স"-এ ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল্য স্বীকার করেন। **ফিজিওক্র্যাটস্‌** নামে এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্‌ যুক্তি দ্বারা অর্থনীতির ব্যাখ্যা করেন।

দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের রচনাবলী প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব নিয়ে আসতে সাহায্য না করলেও তাঁদের রচনা বিপ্লবের অনুকূল মানসিক ক্ষেত্র পরোক্ষভাবে তৈরি করে দেয়।

আমেরিকার স্বাধীনতা সমরও ফরাসী বিপ্লবের সহায়ক হয়েছিল। যে সকল ফরাসী যুবক আমেরিকার পক্ষে স্বাধীনতা সমরে যোগ দেয় তারা আমেরিকা হতে এই শিক্ষালাভ করে যে প্রজাদের কল্যাণের জন্যই প্রজারাই দেশ শাসন করবার মালিক এবং প্রয়োজন হলে বিপ্লব ন্যায্য। ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করে তারা স্বাধীনতার বাণী প্রচার করল।

অন্যান্য কারণ

ফরাসী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হল রাজার অর্থাভাব। জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য চরমে পৌঁছেছিল। তারপর, বিলাস-ব্যসনে ও যুদ্ধের ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়েছিল। ষোড়শ লুই ভাল মানুষ ছিলেন। কিন্তু যে বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ় সঙ্কল্প থাকলে তিনি রাজশক্তিকে আসন্ন পতন হতে রক্ষা করতে পারতেন, তা তাঁর ছিল না। পনর বছর চেষ্টা করেও তিনি দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে পারলেন না।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি ফরাসী জাতির নিকট আবেদন জানালেন এবং স্টেটস জেনারেল নামক মহাসভা আহ্বান করলেন। ফলে রাজা অজ্ঞাতসারে দৈবস্বত্ব শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করলেন।

উপরিউক্ত কারণ-সমূহের মধ্যে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটেছে। কারও মতে অর্থনৈতিক কারণই বিপ্লবের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। কারও মতে রাজতন্ত্রের দুর্বলতাই বিপ্লবের মৌলিক কারণ। আবার কেউ মনে করেন দার্শনিকরাই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন একটি মাত্র কারণে বিপ্লব সংঘটিত হয় নি; বহু কারণের সমন্বয়েই বিপ্লব দেখা দিয়েছিল।

ফরাসী বিপ্লবের স্বরূপ

শুরুতে ফরাসী বিপ্লবের রূপ প্রজাতান্ত্রিক ছিল না। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আন্দোলনরূপেই এর সূচনা এবং বুরবোঁ রাজবংশের অর্থনৈতিক দেউলিয়া অবস্থাকে অবলম্বন করে এর প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি চলেছিল বলেই বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে প্রজাতন্ত্রে।

ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটবার কারণ

বিপ্লব ফ্রান্সে হল কেন: ফ্রান্সে বিপ্লব প্রথমে দেখা দিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, (ক) ফ্রান্সের জনসাধারণ অধিকতর শিক্ষিত ও প্রগতিবাদী ছিল এবং ষোড়শ লুই যোগ্যতাহীন ছিলেন। (খ) ফরাসী কৃষকদের অবস্থা তৎকালীন ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষকদের চেয়ে ভাল ছিল। (গ) ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণী অপরাপর দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় ক্ষমতাশালী, সচেতন এবং বিত্তশালী ছিল। (ঘ) বাস্তব পরিবেশ ও আদর্শের মিল ফ্রান্সেই সার্থকভাবে ঘটেছিল বলে এখানেই প্রথমে বিপ্লব দেখা দেয়।

কম্যুন ও জাতীয় রক্ষীদল

বিপ্লবের প্রসার: ইতিমধ্যে কম্যুন নামে জনসাধারণের এক প্রতিনিধি সভা প্যারিস শহরে পৌরশাসনের ভার নিল। সাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় রক্ষীদল নামে এক বেসরকারী সৈন্য দলের সৃষ্টি হল। প্যারিসের দেখাদেখি ফ্রান্সের অন্যান্য শহরেও কম্যুন ও জাতীয় রক্ষীদল গড়া হল। গ্রামাঞ্চলে অভিজাতদের বিরুদ্ধে কৃষকদের অভিযান শুরু হল।

এর ভেতর একদিন প্যারিসের বুভুক্ষু নারীরা ক্রোধ ও ক্ষুধায় উন্মত্ত হয়ে

লাঠি, ডাণ্ডা প্রভৃতি নিয়ে খাদ্যের জন্য চীৎকার করতে করতে ১২ মাইল পথ হেঁটেই ভার্সাই রাজপ্রাসাদে পৌছায় এবং রানীর কয়েকটি পরিচারিকাকে হত্যা করে। পরে রাজপরিবার সহ প্যারিসে ফিরে আসে। নারীবাহিনীর এই অভিযান হতেই প্যারিস হ'ল বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র এবং প্যারিসের সর্বহারা হল বিপ্লবের নিয়ামক শক্তি। রাজ পরিবার এই যে প্যারিসে গেলেন আর সেখান হতে বের হতে পারেন নি। তাঁদের বন্দীদশা শুরু হল।

নারী ভুখা মিছিল

নতুন শাসনতন্ত্র: এদিকে **'জাতীয় সংবিধান সভা'** মহা উৎসাহে নতুন শাসনতন্ত্র তৈরী করতে প্রবৃত্ত হল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা রাষ্ট্রের লক্ষ্য বলে গৃহীত হল। অভিজাত ও যাজকদের বিশেষ সুবিধাগুলি লুপ্ত করা হল। সকলে আইনের চক্ষে সমান ও সকলেই ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ বলে ঘোষণা করা হল। রাজার শক্তি নিয়ন্ত্রিত করা হল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র দেশটিকে ৮৩টি বিভাগে ভাগ করা হল। সংক্ষেপে, ফ্রান্সে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র স্থাপন করা হল।

সংবিধান সভার কার্যাবলী

সংবিধান সভার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ হল ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্যের ঘোষণা। 'মানুষের ও নাগরিকের অধিকার সমূহের ঘোষণা' নামক সনদে বলা হল মানুষ স্বাধীন হয়ে এবং সকলের সম অধিকার নিয়ে জন্মায়। 'স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও অত্যাচারকে বাধা দেওয়া' তাদের অধিকার। বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি এই ঘোষণায় স্বীকৃতি লাভ করে।

অধিকার পত্র

সংবিধান সভা অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে ফ্রান্সকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। ফ্রান্সের চার্চ দেশের সমগ্র ভূ সম্পত্তির $\frac{1}{5}$ অংশের মালিক ছিল। সংবিধান সভা চার্চের এ সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এবং এই সম্পত্তির জামিনত্বে কাগজী মুদ্রা প্রবর্তন করল। ধর্মযাজকদের রাষ্ট্রের বেতনভুক্ কর্মচারী বলে ঘোষণা করা হল।

প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা: সংবিধান সভা যখন শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যস্ত, তখন মিরাবো ষোড়শ লুই-এর পরামর্শদাতা হন। তিনি রাজাকে বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে ফ্রান্সে রাজশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মিরোবোর মৃত্যু হয়। ফলে ষোড়শ লুইকে সুপরামর্শ দেবার আর কেউ রইল না।

ইতিমধ্যে ফরাসী জনসাধারণের ভাবমানসে রাজকীয় মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। ফরাসী সংবাদপত্রগুলি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে শুরু করে।

প্যারিসের সর্বহারাদের ঔদ্ধত্য দিন দিন বাড়তে থাকে। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ষোড়শ লুই থাকতে চাইলেন না। তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুন গোপনে ফ্রান্স হতে পালাতে চেষ্টা করেন কিন্তু ভেয়ারনে নামক জায়গায় ধরা পড়লেন। এর ফল রাজতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক হল এবং প্রজাতান্ত্রিক ভাবধারা শক্তি সঞ্চয় করল।

রাজার পলায়ন প্রচেষ্টা

ষোড়শ লুইয়ের পালাবার সময় হতেই ইউরোপীয় দেশগুলি ফরাসী বিপ্লবের সাথে জড়িয়ে পড়ল।

ফরাসী রানী মেরী এন্টোয়েনেট-এর ভ্রাতা অষ্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড প্যাডুয়া নামক জায়গা হতে এক ঘোষণা জারি করলেন। এই ঘোষণাপত্রে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের এই বলে অনুরোধ করলেন যে তাঁরা যেন লুই-এর সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা বলে মনে করেন। প্রাশিয়ার রাজা এই আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং লিওপোল্ড-এর সাথে পিল্‌নিজ নামক স্থানে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। বৈঠক শেষে উভয়ে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করলেন। এটিকে পিল্‌নিজের ঘোষণা বলা হয়। এতে বলা হল যে, লুই-এর বিপদ ইউরোপীয় রাজাদের বিপদ-স্বরূপ। ইউরোপীয় রাজাদের সাহায্য পেলেই অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ফরাসী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

বহিঃশত্রুর সাথে যুদ্ধারম্ভ

এদিকে ষোড়শ লুই অনিচ্ছার সাথে নতুন সংবিধান মেনে নিলেন। সংবিধান সভার কাজ শেষ হল। নতুন আইনসভা কাজ শুরু করল।

আইনসভা: নতুন আইনসভার সদস্যরা সকলেই ছিল শাসন-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। রোব্‌স্‌পিয়ারের প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান সভার কেউ-ই আইন সভার সদস্য হতে পারল না। আইনসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৭৪৫ জন। তারা প্রথম হতেই রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে চারটি রাজনৈতিক দল দেখা দিল। যাঁরা নতুন শাসনতন্ত্র মেনে চলতে চাইল তাদের ফিউলাণ্টস বা সংবিধানপন্থী বলা হল। তারা আইনসভার গৃহের দক্ষিণ দিকে বসত। এই সভাগৃহের বাঁদিকে যারা বসতে শুরু করল তাদের মধ্যে দুটি দল ছিল—জেকোবিন ও গিরণ্ডিস্ট * আর যারা সভাগৃহের মাঝখানের আসনে বসত তারা ছিল মধ্যপন্থী নিরপেক্ষ দল।

আইনসভায় রাজনৈতিক দলসমূহ

* আজকাল রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দল বলতে যা বোঝায় তা ফ্রান্সের আইন সভায় সদস্যদের বসবার পদ্ধতি হতেই দেখা দিয়েছে।

আইনসভাকে বেশ কয়টি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রথমত, যে সব ধর্মযাজক নতুন শাসনতন্ত্র মানতে চাইল না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, দ্বিতীয়ত 'ইমিগ্রি' অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীর যে সব লোক বিদেশে চলে গিয়ে বিপ্লব-বিরোধী কাজ করছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অবশেষে আইনসভার অধিকাংশ সদস্য ফরাসী বিপ্লব বিরোধী রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাই মনস্থ করল এবং এর আগে যে সব ধর্মযাজক নতুন শাসনতন্ত্র মানতে রাজী হয়নি তাদের পেনশন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বন্ধ করে দিল এবং দেশত্যাগী অভিজাতদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশে ফিরতে নির্দেশ দিল। অন্যথায় তাদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করল। রাজা ষোড়শ লুই আইনসভার এ দুটি আইন-ই ভিটো করেন।

সমস্যা

ষোড়শ লুই-এর এই বিপ্লব-বিরোধী কাজে প্যারিসে এক প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। এক বিরাট মারমুখী জনতা রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করল। কিছুদিন পর রাজা তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে আইন সভাগৃহে আশ্রয় নিলেন। ইতিমধ্যে প্যারিসে 'বিপ্লবী কম্যুন' নামে জনতার এক নতুন সভা স্থাপন করা হল। এই সভা প্যারিসের নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। এরকম অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ ডিউক অব ব্রান্সউইক এক ঘোষণা জারি করলেন যে, প্যারিসবাসী যদি রাজপরিবারের কোন ক্ষতি সাধন করে তবে তিনি সমুচিত শাস্তির বিধান করবেন।

ব্রান্সউইক ঘোষণা

ব্রান্সউইকের ঘোষণা প্যারিসের জনসাধারণকে আরও উত্তেজিত করল। তারা রাজতন্ত্রের অবসান চাইল এবং আইন সভা আক্রমণ করে সদস্যদের রাজতন্ত্র বাতিল করতে বাধ্য করল। উচ্ছৃঙ্খল জনতার জয় হল। রাজ-পরিবার টেম্পল নামক জেলখানায় বন্দী হলেন। ষোড়শ লুই-এর পদচ্যুতির সাথে সাথে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল বলা যায়। এদিকে অস্ট্রীয় ও প্রাশিয়ান সৈন্যদল প্যারিসের দিকে এগিয়ে আসতে থাকায় প্যারিসের বিপ্লবী কম্যুন সন্দেহবশে কয়েক হাজার লোককে বন্দী করে এবং ১৭৯২ এর সেপ্টেম্বর মাসে তাদের হত্যা করে। এটি 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড

ষোড়শ লুই-এর পদচ্যুতির ফলে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র বাতিল হয়ে গেল। ন্যাশনাল কন্‌ভেন্‌শন নামে এক জাতীয় সভার ওপর নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি করার ভার এসে পড়ল। এই জাতীয় কন্‌ভেন্‌শন প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকারে নির্বাচিত হবে বলে বলা হয়।

জাতীয় কনভেনশন আহ্বান

জাতীয় কন্‌ভেন্‌শন ঃ ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই জাতীয় সভার অধিবেশন বসে। এই সময় ফ্রান্সের অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন ছিল। বিদেশী শত্রু কর্তৃক ফ্রান্স আক্রান্ত এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও শোচনীয় ছিল। প্রতি-বিপ্লবী দল শক্তি সঞ্চয় করে বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে।

বিভিন্ন দল

জাতীয় কন্‌ভেনশনে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ছিল—গিরণ্ডিস্ট ও জেকোবিন। এই দুটি দলের মধ্যে শাসনতন্ত্র নিয়ে কলহ দেখা দিল। গিরণ্ডিস্ট দল চাইল ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা বাড়ানো। জেকোবিন দল এর বিরোধী ছিল এবং প্যারিসের উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করল।

কার্যাবলী

জাতীয় কন্‌ভেন্‌শনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সে 'জনমত' তৈরী করা। প্রথমেই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা হল। এর পর বিপ্লবী বর্ষপঞ্জী এবং ওজন ও পরিমাপের জন্য 'মেট্রিক পদ্ধতি' গৃহীত হ'ল। শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হল। সবশেষে ষোড়শ লুইকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। ১৭৯৩-এর ২১শে জানুয়ারী হতভাগ্য ষোড়শ লুই প্রাণ হারালেন।

এর পর গিরণ্ডিস্ট দলকে ক্ষমতার আসন হতে সরিয়ে জেকোবিন দল প্রাধান্য স্থাপন করল।

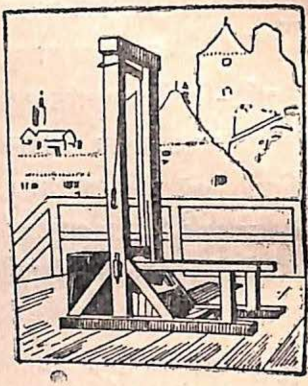
সন্ত্রাসের রাজত্ব

ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ডের পর ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, স্পেন প্রভৃতি ছয়টি রাষ্ট্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফরাসী বাহিনী সর্বত্র পরাজিত হতে থাকল। এধারে ফ্রান্সের অভ্যন্তরেও রাজতন্ত্রের পক্ষে আন্দোলন চলছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সে বিদ্রোহ দেখা দিল। বাইরে সংঘবদ্ধ শত্রু এবং ভেতরে বিদ্রোহ—এর ফলে যে সঙ্কটের উদ্ভব হল তার স্বরূপ দেখা দিল **'সন্ত্রাসের রাজত্ব'**। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতি-বিপ্লবীশক্তি ধ্বংস করা। এর জন্য শক্তির প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন বাইরের শত্রুকে নিধন করা হয়েছিল, তেমনি গিলোটিনের সাহায্যে ভেতরের শত্রু নিধন করা হয়।

সংগঠন

সন্ত্রাস রাজত্বের সংগঠনের মধ্যে ছিল 'সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি'। দেশে শান্তি রক্ষার কাজ ও পুলিশী ক্ষমতা এটিকে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ছিল 'জন-নিরাপত্তা কমিটি'। তৃতীয়ত ছিল 'বিপ্লবী বিচারালয়'।

চতুর্থত ছিল বিপ্লব স্কোয়ার-এ মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা। পঞ্চমত ছিল 'সন্দেহের আইন'। এই আইনের বলে যে কোন লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার ক্ষমতা জননিরাপত্তা কমিটির ছিল। সন্ত্রাস রাজত্বকালে এক বছরের মধ্যে প্রায় ৫০০০ নাগরিকের গিলোটিনের তলায় প্রাণ যায়। এই সময় রোবস্পিয়ার ছিলেন ফ্রান্সের সর্বাধিনায়ক। এর শাসনকাল অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। রোবস্পিয়ারের পতনের সাথে সাথে সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হয়।



গিলোটিন

যাই হোক্ সন্ত্রাস রাজত্বকালে ফ্রান্সে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। এই শাসনব্যবস্থা স্থাপিত না হলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুর চাপে ফ্রান্স ধ্বংস হয়ে যেত।

অবসান

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌ভেনশন ভেঙে দিয়ে 'ডাইরেক্টরী' নামে এক নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। এই শাসনব্যবস্থা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারল না। এর ফলে এগিয়ে এলেন এক যুগন্ধর পুরুষ। তাঁর নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।



নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। তাঁর সংগঠন শক্তির তুলনা হয় না। তিনি ফ্রান্সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময় ফ্রান্স সর্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করে।

প্রথম জীবন : ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্সিকা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে এক ব্যবহারজীবীর গৃহে নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুড়িবৎসর বয়সে সৈন্য-বাহিনীতে যোগদান করেন। ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার খুবই অনুরাগ ছিল। ফরাসী দার্শনিকদের লেখা তিনি পড়তে ভালবাসতেন।

অভ্যুত্থান : নেপোলিয়ন বিপ্লব আরম্ভ হবার পর তুঁলোতে (Toulon) যে

যুদ্ধ হয় তাতে কৃতিত্ব দেখান। বিপ্লবের সময় প্যারিসের জনসাধারণ বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছিল। সরকারের কোন কাজই তাদের মনঃপূত হচ্ছিল না। এরূপ উন্মত্ত জনতাকে নেপোলিয়ন অসীম সাহসের সহিত দমন করেন ও কনভেনশন নামক সরকারকে রক্ষা করেন। এর পরই তাঁর ভাগ্যোন্নতি আরম্ভ হয়। ইতালীতে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বভার তাঁকে দেওয়া হয়।

ইটালীতে যুদ্ধ: সেনাপতি হয়ে নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ইটালী আক্রমণ করলেন। তিনি ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেনাপতিকে পর পর ভীষণভাবে পরাজিত করেন এবং অষ্ট্রিয়াকে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। তাঁর সামরিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে ইউরোপ চমকিত হল।

প্রাচ্য অভিযান: ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মিশর জয় করতে যান। মাল্টা দ্বীপটি দখল করে তিনি মিশরে উপস্থিত হলেন। মিশরের শাসকগণ তাঁর গতিরোধ করতে পারল না। মিশর হতে তিনি সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হলেন কিন্তু ইংরাজ নৌ-সেনাপতি নেলসন নীলনদের যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করেন এবং নেপোলিয়নের ভারতবর্ষ প্রভৃতি জয়ের বাসনা নষ্ট করে দেন।

প্রথম কন্সাল: ১৭৯৯ হতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস মুখ্যতঃ নেপোলিয়নের উত্থান-পতনের ইতিহাস। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে এলেন। ডিরেক্টরদের দূর করে **প্রথম কনসাল** নামে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের কর্তৃত্ব পেলেন। এই সময় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এক রাষ্ট্রজোট গঠিত হয়; ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া একজোটে বিপ্লবী ফ্রান্সকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। নেপোলিয়ন **ম্যারেঙ্গার** যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সৈন্য ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। জার্মানিতেও অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটল। রাষ্ট্রজোট ভেঙে গেল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। ইটালীতে ফ্রান্সের প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। নেপোলিয়নের সফল কূটনীতির ফলে রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্র ফ্রান্সের পক্ষে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করল। নৌ যুদ্ধে কিন্তু নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে পরাজিত করতে পারলেন না। শেষে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক সন্ধি হল। এটিকে **আমিয়েন্সের সন্ধি** বলে। এর ফলে ফ্রান্সের অধিকার বেলজিয়াম ও রাইন নদীর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করল।

নেপোলিয়ন পাঁচ বৎসরকাল প্রথম কন্সালরূপে ফ্রান্স শাসন করেন। তিনি ফ্রান্সের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি সমগ্র দেশটি ৮৩টি

প্রদেশে ভাগ করেন। এবং প্রত্যেক প্রদেশে একজন প্রিফেক্ট নিযুক্ত করেন। বিচারবিভাগেরও পরিবর্তন সাধন করেন। সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি নিজেই নিযুক্ত করতেন। তিনি মুদ্রানীতির পরিবর্তন করেন এবং ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স স্থাপন করেন। তিনি এবং তাঁহার কর্মচারীবৃন্দ জনসাধারণকে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করলেন। শাসন কার্য হতে অমিতব্যয়িতা ও দুর্নীতি দূর করলেন। নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরী করে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সংস্কার হল **আইন-বিধি বা code Napoleon. 'আইনের চক্ষে সকলেই সমান'**—এটাই তিনি প্রবর্তন করলেন। সরলভাবে সংকলিত এই আইনবিধি বিপ্লবের সামাজিক সাফল্যকে নিশ্চিত করল। এতে নাগরিকদের সমতা, সহনশীলতা, উত্তরাধিকার বিষয়ে সমতা, ভূমিদাসদের মুক্তি এবং সামন্ত প্রথার ও বিশেষাধিকারের উচ্ছেদ করা হল। পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের আইন-কানুন এই আইন-বিধির অনুকরণে তৈরী করা হয়েছে। তিনি ধর্মব্যাপারে পোপের সহিত এক সুমীমাংসায় উপনীত হন। শিক্ষা ব্যাপারেও তিনি আগ্রহ দেখান। সংক্ষেপে, **নেপোলিয়ন শাসনকার্যেও অসামান্য পটুত্ব দেখান**। নেপোলিয়ন প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় যদিও জনসাধারণের বিশেষ হাত ছিল না, তবুও দ্রুত ও সর্বত্র একই ভাবে শাসনকার্য চলতে থাকায় তারা খুবই উপকৃত হল। নেপোলিয়নের সামরিক কীর্তি বেশিদিন টেকেনি, কিন্তু তাঁর শাসনসংস্কার কালজয়ী হয়েছে।

নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ সংস্কার

সম্রাটরূপে—১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফরাসী দেশের সম্রাটপদে নিজেকে অভিষিক্ত করালেন। এইবার তিনি স্থির করলেন যে, ইংলণ্ড আক্রমণ না করলে যুদ্ধ শেষ হবে না। কিন্তু শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে ইংলণ্ড রক্ষা পায়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে **ট্রাফালগারের যুদ্ধে** ইংরাজ নৌ-সেনাপতি নেলসন ফ্রান্সের নৌবাহিনী ধ্বংস করলেন। নেপোলিয়ন জলপথে ইংলণ্ড আক্রমণের কথা আর চিন্তা করেননি। স্থলপথে কিন্তু তাঁর গতিরোধ কেউই করতে পারল না ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রজোটের সৃষ্টি হয়। অষ্ট্রিয়া,প্রাশিয়া, রাশিয়া, ইংলণ্ড এর প্রধান প্রধান সদস্য ছিল। নেপোলিয়ন **অস্টার্লিজের** যুদ্ধে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্মিলিত বাহিনী বিধ্বস্ত করলেন। এর পর **এনার** (Zena) যুদ্ধে প্রাশিয়াকে পরাজিত করলেন। রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডার পরাভূত হয়ে সন্ধি করলেন। এটিকে **টিলসিটের সন্ধি** (১৮০৭) বলে। এইরূপে নেপোলিয়ন ইউরোপে একাধিপত্য স্থাপন করলেন।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। ইউরোপের সকল রাষ্ট্রই তাঁর একাধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হল। তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীগণ বিভিন্ন দেশের রাজা বা রানীরূপে গণ্য হলেন। কেবলমাত্র ইংলণ্ড তাঁকে ইউরোপের কর্তারূপে স্বীকার করল না। তিনি ইংলণ্ডকে শায়েস্তা করবার জন্য **Continental System** বা এক বাণিজ্যিক অবরোধ প্রথা স্থাপন করলেন। এর মূল কথা হল ইউরোপের কোন দেশকে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করতে না দিয়ে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক বিপর্যয় আনা। অর্থাৎ এটি অবরোধ নয় বৃটিশ পণ্য বর্জন বলা যায়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার্লিন নগর হতে এক হুকুমনামা জারি করে এই প্রথা ঘোষণা করেন। এর প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ডও এক হুকুম-নামা জারি করলে যে কোন রাষ্ট্রের জাহাজ ইংলণ্ডের বন্দরে না এসে ফরাসী বন্দরে যেতে পারবে না।

ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা

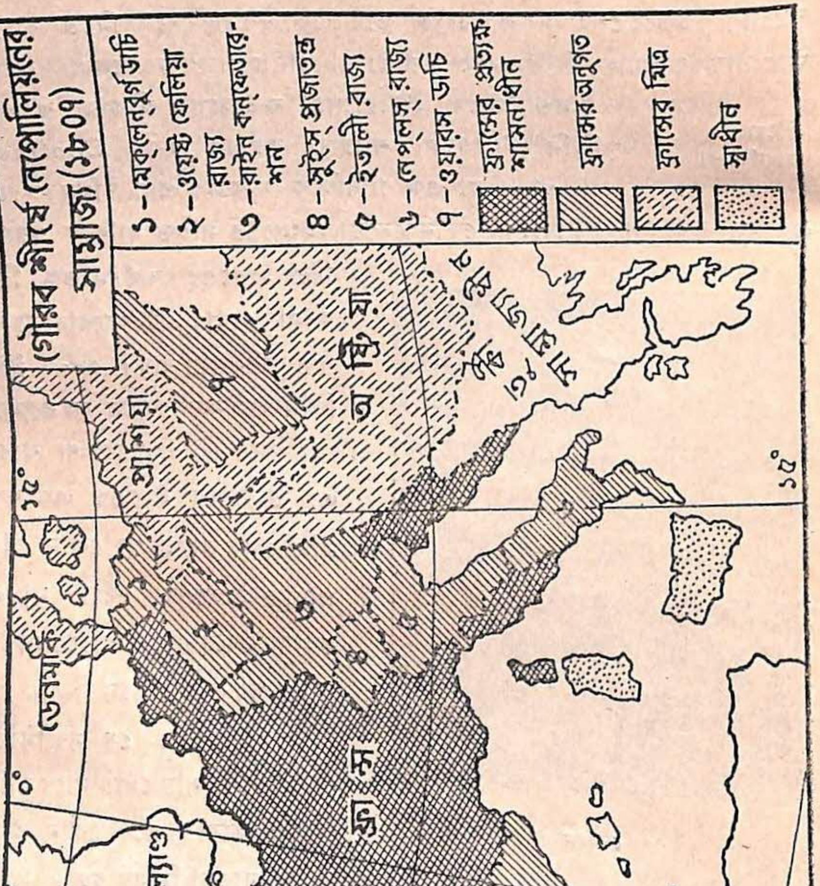


নেলসন

এর পর নেপোলিয়ন মিলান ডিক্রি ঘোষণা করলেন। যে সব নিরপেক্ষ দেশ ফরাসী সাম্রাজ্যের সাথে বাণিজ্য করবে, তাদের পক্ষে কোন ইংরেজ বন্দরে যাওয়া নিষিদ্ধ হল।

'কন্টিনেণ্টাল ব্যবস্থা' কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ডের পণ্য বর্জন করবার জন্যই গ্রহণ করা হয়নি। ফরাসী পণ্য যাতে বাজার পায় এবং ফরাসী ধনিক শ্রেণী যাতে আরও সমৃদ্ধির সুযোগ পায় তার জন্যও এই ব্যবস্থার মারফত সবিশেষ চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু বৃটিশ পণ্যবিহীন ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা পূরণ করবার মত ক্ষমতা তখন ফরাসী উৎপাদন ব্যবস্থার ছিল না। এদিকে নৌশক্তির প্রাধান্যের ফলে ইংরেজরা তাদের ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করল। কিন্তু নেপোলিয়ন তাঁর আদেশগুলি কার্যকরী করতে পারলেন না। সুতরাং এই ব্যবস্থার ফলে ইউরোপের জনসাধারণের দুর্দশা চরমে উঠল। যেহেতু ইংলণ্ডের পণ্য ছাড়া


গৌরব শীর্ষে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য (১৮০৭)
১—মেক্‌লেনবুর্গ ডাচি
২—ওয়েষ্ট ফেলিয়া রাজ্য
৩—রাইন কনফেডারেশন
৪—সুইস প্রজাতন্ত্র
৫—ইতালী রাজ্য
৬—নেপল্‌স্ রাজ্য
৭—ওয়ারস ডাচি
ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন
ফ্রান্সের অনুগত
ফ্রান্সের মিত্র
স্বাধীন
ইংল্যাণ্ড
ডেনমার্ক
ফ্রান্স
প্রাশিয়া
অস্ট্রিয়া
স্পেন
পর্তুগাল

ইউরোপের চলত না সে কারণে চোরা আমদানি রপ্তানি প্রচণ্ডভাবে চলতে থাকল। নেপোলিয়ন এটি বন্ধ করতে চাইলেন—সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিক্ষোভ দেখা দিল এবং নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হল।

নেপোলিয়নের ভাগ্য বিপর্যয় ঃ Continental System-এর ফলে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছিল সন্দেহ নাই কিন্তু ইউরোপের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। একটির পর একটি নেপোলিয়নের মিত্ররা বিদ্রোহ ঘোষণা করে; ফলে, স্পেন ও পর্তুগাল বিদ্রোহ করে। এটিকে উপদ্বীপের যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে নেপোলিয়ন তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে পারেননি। স্পেনবাসীদের অনুসরণ করে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের জনসাধারণ বিদ্রোহ করল। এর ভেতর নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করলেন (১৮১২ খ্রীঃ) কিন্তু রাশিয়ায় তাঁর চরম পরাজয় ঘটল। তাঁর সৈন্যদল বিনষ্ট হল। তাঁর ছয়লক্ষ সৈন্যের বিরাট বাহিনীর মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে। এই পরাজয়ের ফলে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড বিদ্রোহ করল। সুইডেনও এতে যোগদান করে। ইংলণ্ডের সাথে যুদ্ধ আগে হতেই চলছিল। সম্মিলিত শক্তির নিকট নেপোলিয়ন পরাজিত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তাঁকে **এলবা দ্বীপে** নির্বাসিত করা হল। ষোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে এগার মাস থাকবার পর গোপনে পুনরায় ফ্রান্সে ফিরে এলেন। ফরাসী সেনাবাহিনী ও জনসাধারণ তাঁকে সম্রাট বলে গ্রহণ করল। কিন্তু ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের ঠিক একশো দিন পরে ইংরাজ, প্রাশিয়ান ও বেলজিয়ামের সমবেত সৈন্যদলের হস্তে ওয়াটারলুর যুদ্ধে (১৮১৫) নেপোলিয়ন শেষবারের মত পরাজিত হন। তাঁকে সুদূর **সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে** নির্বাসিত করা হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানসার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তাঁর দেহ ফ্রান্সে নিয়ে আসা হয়।

নেপোলিয়নের পতন

বিপ্লবী নেপোলিয়ন ঃ নেপোলিয়ন যে একজন বিপ্লবী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একসময় তিনি বলেছিলেন "আমিই বিপ্লব"। নেপোলিয়ন স্বয়ং সাম্যনীতির প্রতীক ছিলেন। এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তিনি ফরাসী সম্রাট হয়েছিলেন—এটাই প্রমাণ করে বংশ মর্যাদা সব কিছু নয়, ক্ষমতা ও প্রতিভাই উন্নতির পথে নিয়ে যায়। ফরাসী বিপ্লবের সাম্যনীতিটি তিনি সর্বক্ষেত্রেই প্রযুক্ত করেন। তাঁর

বিপ্লবী হিসেবে নেপোলিয়ন

সময়ে ফ্রান্সে আইনের চক্ষে সকলেই সমান ছিল। এ ছাড়া, ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে তিনি ফরাসী বিপ্লবকে রক্ষা করেছিলেন।

নেপোলিয়ন কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সব নীতিগুলি গ্রহণ করেননি। স্বাধীনতা বা 'liberty' ফরাসী বিপ্লবের আর একটি বহু-ঘোষিত বাণী ছিল। নেপোলিয়ন এই স্বাধীনতা হতে জনসাধারণকে বঞ্চিত করেছিলেন। কারণ তখন আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা প্রবল আকার ধারণ করে। এই কারণে তিনি স্বৈরাচারী শাসন স্থাপন করেন। তিনি এটাও বলেছিলেন "আমি বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি"। এর অর্থ হল যে, তিনি ফরাসী বিপ্লবের সৃজনধর্মী নীতিগুলি কার্যে পরিণত করেছিলেন।

কৃতিত্ব

নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফ্রান্স ঐক্যবদ্ধ হয়। দেশে শক্তিশালী ও সুদক্ষ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্স ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বুরবোঁ রাজাদের অপদার্থ নীতির ফলে যে শোচনীয় দুরবস্থা হয়েছিল তার অবসান ঘটে। সে কারণে অন্যান্য ত্রুটি সত্ত্বেও নেপোলিয়নের যুগ ফ্রান্সের শৌর্য ও মহাগৌরবের যুগ।

তাঁর সামরিক প্রতিভার তুলনা হয় না। সাম্রাজ্য গঠনকারী হিসেবেও তিনি অনন্য। পোপের সাথে বুঝাপড়া তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন তাঁর কূটনৈতিক সামর্থ্যের উদাহরণ। তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলির মধ্যে তাঁর সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ফরাসী বিপ্লবের বাণী ইউরোপে প্রসারিত করেন।

ইটালী ও জার্মানির ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সূচনা তিনি করে যান। নেপোলিয়নকে শেষ প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী শাসক এবং প্রথম আধুনিক রাজনীতিজ্ঞ বলা যায়।

নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ: নেপোলিয়নের পরাজয়ের কারণ তাঁর চরিত্র ও নীতির মধ্যেই পাওয়া যায়। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অসাধারণ। তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে যে রাজনৈতিক ও মানসিক প্রস্তুতি দরকার তা তাঁর ছিল না বা হয়নি। এই কারণে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও তিনি তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন নি। তাঁর নীতির যে ভুলত্রুটি ছিল তা নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন, অবশ্য বহু পরে।

নেপোলিয়ন তাঁর নির্বাসন কালে সখেদে বলেছিলেন যে তাঁর পতনের কারণ তিনটি—**উপদ্বীপের যুদ্ধ, পোপের সহিত কলহ, রাশিয়া অভিযান।** এর সাথে আরও কয়েকটি কারণ যোগ করা যেতে পারে—কন্টিনেণ্ট্যাল সিস্টেম, ফরাসী বিজিত দেশ সমূহের নবজাগ্রত জাতীয় সম্মানবোধ ও ইংলণ্ডের নৌশক্তি।

পতনের কারণ

স্পেনের সহিত যুদ্ধ : স্পেনের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে নেপোলিয়ন চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর ভাইকে স্পেনবাসীর বিরোধিতা সত্ত্বেও স্পেনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করায় স্পেনবাসীর জাতীয় সম্মানে আঘাত লাগে এবং তারা জীবনপণ করে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই নবজাগ্রত জাতীয় শক্তিকে নেপোলিয়ন ধ্বংস করতে পারলেন না—নিজের ধ্বংসই আনলেন। তিনি নিজেই পরবর্তীকালে তাঁর এই নীতিকে **'স্পেনীয় ক্ষত'** নাম দেন।

ইউরোপের রাজন্যবর্গের প্রতি খারাপ ব্যবহার : নেপোলিয়নের পক্ষে ইউরোপের শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অসম্ভব হওয়ায় তাঁর পতন দ্রুততর হ'ল। তিনি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গকে সমগোত্রীয় বলে মনে না করে তাঁর অধীনস্থ বলে মনে করতে থাকেন এবং নিজেকে সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা বলে জাহির করেন। ইউরোপের রাজন্যবর্গ এটি একেবারেই স্বীকার করতে রাজি হলেন না। তাঁরা একজোটে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের সাধারণ শত্রুকে পরাজিত করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। এই নবজাগ্রত রাজশক্তি নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ।

সাম্রাজ্যের স্ববিরোধী নীতি : নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ হল তাঁর সাম্রাজ্যের স্ববিরোধী নীতি। তিনি বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সসৈন্যে প্রবেশ করেন। সেনাপতি হিসেবে তিনি জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্রাট হবার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই নীতির পরিবর্তন করেন। জাতীয়তাবাদের আদর্শের সাথে তাঁর সাম্রাজ্যের আদর্শের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হল। ১৮১০-এর পর এই বিরোধ তীব্রভাবে দেখা দিল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাতীয়তাবাদী আদর্শকে কাজে লাগাল। নেপোলিয়ন এই সমবেত শক্তির সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। জার্মানী, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও স্পেনে এই শক্তি দৃঢ়তর হবার ফলে তাঁর পতন ঘনিয়ে এল।

পোপের সাথে সম্পর্ক : নেপোলিয়ন যখন কনসাল নিযুক্ত হন তখন

পোপের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পোপের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন এবং তাঁর রাজ্য দখল করেন এবং পোপকে বন্দীরূপে ফ্রান্সে আনেন। পোপের প্রতি এই ব্যবহারে ক্যাথলিক জনসাধারণ তাঁর প্রতি বিরক্ত ও রুষ্ট হয় এবং তাঁর বিরোধিতা করে। ফ্রান্সের গোড়াপন্থী ক্যাথলিকরা তাঁর শাসন পছন্দ করল না। স্পেনের ধর্মভীরু জনসাধারণকে চার্চই তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল। পোপের প্রতি খারাপ ব্যবহারের ফলে এগুলি দেখা গেল।

মস্কো অভিযান : রাশিয়ার সহযোগিতার প্রকৃত মূল্য উপেক্ষা করে রাশিয়াকে শত্রুতে পরিণত করা নেপোলিয়নের পক্ষে ঠিক হয় নি। তার রুশ-বিরোধী নীতির ফলে জার তাঁর উপর বিতৃষ্ণ হলেন এবং নেপোলিয়ন-বিরোধী দলে যোগদান করলেন রাশিয়ার সহিত নেপোলিয়নের মনোমালিন্য উপস্থিত হলে তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রুশদেশে প্রবেশ করেন। রুশগণ সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল না। তারা যে সকল জায়গা পরিত্যাগ করল সেগুলি পুড়িয়ে দিতে থাকল। এর ফলে নেপোলিয়ন তাঁর বিশাল বাহিনীর জন্য খাদ্য ও আশ্রয় পেলেন না। তিনি বিফল মনোরথ হয়ে দেশে ফিরতে আরম্ভ করলেন। শীতে, অনাহারে শত্রুর আক্রমণে তাঁর অজেয় বাহিনী একেবারে ধ্বংস হল। নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান বিফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'মুক্তি সংগ্রাম' আরম্ভ হয়।

কন্টিনেন্টাল সিস্টেম

কন্টিনেন্টাল সিস্টেম : ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করবার জন্য নেপোলিয়ন কন্টিনেন্টাল সিস্টেম প্রবর্তন করেন কিন্তু এর ফল বিপরীতই হয়। তাঁর ধ্বংসই ত্বরান্বিত করে। এই নীতির ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় ও সকলে তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। কন্টিনেন্টাল সিস্টেম যখন তিনি কার্যকরী করতে সচেষ্ট হন তখন তাঁর শত্রু সংখ্যা বেড়ে যায়। এই ব্যবস্থার ফলে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি এবং জনসাধারণ এক অর্থনৈতিক দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুর্লভ ও দুর্মূল্য হওয়াতে নেপোলিয়নের শাসন ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সারা ইউরোপে এক ঘৃণ্য মনোভাবের সৃষ্টি হল। পর্তুগাল আক্রমণ, পোপের সাথে বিবাদ, সেখানে হস্তক্ষেপ এবং রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ এর ফলে দেখা দিল।

ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তি : ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির প্রাধান্য নেপোলিয়নের পতনের অপর একটি কারণ। স্থলযুদ্ধে নেপোলিয়ন অপরাজেয় থাকলেও সমুদ্রবক্ষে বারংবার তিনি ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার অভিপ্রায়ে তিনি যখন প্রাচ্য পরিকল্পনা নেন তখন নীল নদের

যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড তাঁকে পরাজিত করে। ফলে তাঁর প্রাচ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তি

এরপর ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনীকে বেশ কিছু বছরের জন্য নিরাপদ করল। নেপোলিয়নের পক্ষে ইংল্যাণ্ডকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করা অসম্ভব হল। নেপোলিয়ন কিন্তু এতে দমলেন না। তিনি অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করা সম্ভব হবে বলে মনে করলেন এবং তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা চালু করলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ল ইংল্যাণ্ডের নৌ-শ্রেষ্ঠত্বের জন্য। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে ইংল্যাণ্ডের নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের সাথে ইংরেজদের অনমনীয় মনোভাব ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম যুক্ত হবার ফলেই নেপোলিয়নের বহু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

বিশ্বাসঘাতকতা ঃ ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের মিত্রভাবাপন্ন নরপতি এবং নেপোলিয়নের ফরাসী বন্ধুবর্গের বিশ্বাসঘাতকতাও নেপোলিয়নের পতনের অন্যতম কারণ বলে ধরা যেতে পারে। স্পেন ও রাশিয়ায় তাঁর পরাজয়ের সংবাদে এঁরা নেপোলিয়নের পতন অবশ্যম্ভাবী ভেবে নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করেন এবং নিজেদের ভাগ্য সুনিশ্চিত করবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কার্যকলাপ চালাতে থাকেন। যখন এঁদের সাহায্য নেপোলিয়নের নিকট অপরিহার্য ছিল ঠিক সেই সময়েই এরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করলেন। তাঁর একটু ভাগ্য বিপর্যয়ের সাথে সাথেই তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁকে ত্যাগ করল। একথা বললে অন্যায় হবে না যে নেপোলিয়নের ফরাসী সিংহাসনে স্থায়িত্বের প্রধান শর্ত ছিল—নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধজয় যেটি নেপোলিয়নের মত প্রতিভার পক্ষেও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল না। ফলে তাঁর বন্ধুপ্রতিম কিছুসংখ্যক সেনাপতি ও বেসামরিক কর্মচারীরা তাঁর প্রতি আর আনুগত্য দেখান প্রয়োজন বলে মনে করল না। সুতরাং দেশের ও বিদেশের বন্ধুদের বিশ্বাস-ঘাতকতা তাঁর পতনের জন্য নিশ্চয়ই দায়ী ছিল।

অন্যান্য কারণ ঃ পরিশেষে বলা যায় যে ওয়াটার্লু যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর সামরিক নীতির ভুলত্রুটি তাঁর পতনের জন্য কিছুটা দায়ী। ওয়াটার্লু যুদ্ধের দুদিন আগে তিনি ও তাঁর সেনাপতি নে (Ney) যথাক্রমে লিগনীতে ব্লুচারের প্রাশিয়ান বাহিনীকে ও কোয়াটার ব্রাসে ওয়েলিংটনের বৃটিশ বাহিনীকে পরাজিত করেন কিন্তু নেপোলিয়ন এই সময় বুঝতে পারেননি যে পরাজিত উভয় বাহিনী আবার মিলিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। ফলে তিনি এই দুই বাহিনীর পশ্চাৎধাবন না করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন, অবশ্য এই সময় তিনি শারীরিক ব্যাধিতে ভুগছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁর সেনাপতি গ্রাউচিকে ব্লুচারের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। ভুল

ম্যাটসিনির মত আরও বহু দেশপ্রেমী নাট্যকার, কবি ও কথাশিল্পী তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে ইটালীর সাহিত্যে একটি নবজাগরণ সৃষ্টি করলেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় দল

যুক্তরাষ্ট্রীয় দলের নেতা ছিলেন জিওবার্টি। তাঁর মতে ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্র পোপের নেতৃত্বাধীনে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হলে ইটালীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক হবে। এই সময় আবার পোপ নবম পায়াস তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি খুব প্রগতিবাদী এবং অষ্ট্রিয়া-বিরোধী। স্বভাবতই জিওবার্টি ও তাঁর অনুচরবৃন্দ ভেবেছিলেন যে এই পোপ ইটালীর মুক্তি যুদ্ধের প্রধান হোতা হবেন। কিন্তু ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পোপের স্বরূপ ধরা পড়ল। তিনি অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলেন না। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় দলের সব আশা নস্যাৎ হল।



ম্যাটসিনি

রাজতন্ত্রীয় দল

ম্যাটসিনির স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে বহু ইটালীবাসী মনে করেন যে ইটালীর রাজনৈতিক একতা ও স্বাধীনতা সম্ভব হবে যদি পিডমণ্ট সার্ডিনিয়ার রাজবংশ মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। অবশ্য জনসাধারণের এই চিন্তার পিছনে পিডমণ্ট সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস্ আলবার্টের অবদান ছিল। তিনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এক বিরাট সংগ্রামে নেমে পড়েন। কিন্তু শেষে তিনি অষ্ট্রিয়ার হাতে পরাজিত হন এবং পুত্র দ্বিতীয় ভিক্টর এমান্নুয়েলের হাতে রাজ্যভার তুলে দেন।

১৮৪৮-৪৯-এর ইটালীর অভ্যুত্থান ব্যর্থতার একটি মর্মান্তিক উদাহরণ সন্দেহ নেই। তবু পিডমণ্টের রাজবংশ এই অভ্যুত্থানে যে ভূমিকা নেন, তাতে ভবিষ্যতে এই রাজবংশের নেতৃত্বেই যে ইটালীর ঐক্যসাধন সম্ভব হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।

কাভুরের নেতৃত্ব

১৮৫০ হতে ১৮৭০ এই বিশ বছরে ইটালীর জাতীয় ঐক্য ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত গতিতে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যায়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইটালীবাসীদের স্বপ্ন সফল হয়। ইটালীর এই সাফল্যের মূলে

যার দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন পিডমণ্টের প্রধান মন্ত্রী **কাউণ্ট কাভুর**।

ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির সাধু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে সমগ্র ইটালীতে হতাশা দেখা দেয়। ইটালীর এই দুর্দিনে কাভুরের আবির্ভাব ঐক্যসাধনার অন্ধকার যুগে একমাত্র আশার আলো নিয়ে আসে। কাভুর প্রথমেই উপলব্ধি করলেন যে ইটালী হতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করতে না পারলে দেশে ঐক্য আসতে পারে না। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সার্ডিনিয়া রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। এই সার্ডিনিয়া পিডমণ্টের রাজা ছিলেন ভিক্টর দ্বিতীয় ইমানুয়েল। তিনিও ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতা মনেপ্রাণে চাইতেন। কাভুরের চেষ্টায় ছোট সার্ডিনিয়া রাজ্য ইটালীর ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরাভাগে এল।

কাভুর: কাভুর ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তিনি প্রথমে কৃষিকার্যে মন দেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় সার্ডিনিয়ার রাজা একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি

কাভুরের প্রাথমিক জীবন

সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এর আগে তিনি ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বহু স্থান ভ্রমণ করে ওই সব দেশের নানাবিধ উন্নতি লক্ষ্য করেন এবং নিজ রাজ্যে ওই দেশগুলির শাসন-ব্যবস্থা ও শিল্প-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সংকল্প করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বেই সমগ্র ইটালীর রাজনৈতিক একতালাভ সম্ভবপর। প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি সার্ডিনিয়ার আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে মন দিলেন। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজে সব রকমে সাহায্য করলেন। কৃষির উন্নতির

আভ্যন্তরীণ নীতি

জন্য কৃষকদের নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে উৎসাহিত করলেন। সমগ্র দেশে দ্রুত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা নিলেন। রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্যসূচী গ্রহণ করলেন। বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কয়েকটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করলেন। সামরিক বাহিনীকে তিনি নতুনভাবে গড়ে তুললেন।

পররাষ্ট্র নীতি: ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের ফলে যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তার দিকে লক্ষ্য রেখে কাভুর তাঁর পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করলেন। তিনি একজন সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং এর ফলে তিনিই প্রথম বুঝতে পারলেন যে বিদেশী শক্তির সাহায্য ছাড়া ইটালীর রাজনৈতিকঐক্য আসবে না। তিনি ইটালীর সমস্যাকে নিজের রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে ইউরোপীয়

বোঝাবুঝির ফলে গ্রাউচি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে সমর্থ হলেন না। ফলে ওয়াটার্লুতে তাঁর নিশ্চিত জয়লাভ সম্পূর্ণ পরাজয়ে পরিণত হল।

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ও তাৎপর্য—ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে। বিপ্লবের বহু-ঘোষিত স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ইউরোপের ইতিহাসকে এক নতুন পথে পরিচালিত করে। ইউরোপের জনসাধারণ স্বাধীনতার অর্থ করল জনপ্রিয় সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ভূমিদাস প্রথার অবসান। সাম্যের অর্থ করল 'বিশেষ সুবিধার অবসান'। আর 'মৈত্রী' বলতে বুঝল 'জাতীয়তাবাদ'।

ফ্রান্সে

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের পরে ফ্রান্সে পুরানো রাজতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তবুও বিপ্লবের সুফলগুলি থেকে যায়। সামন্ততান্ত্রিক বিশেষাধিকার, ভূমিদাসত্ব, সামাজিক বৈষম্য, চার্চের প্রাচীন ক্ষমতা, অযৌক্তিক কর-ব্যবস্থা, বিচার ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের অযোগ্যতা ফ্রান্সে আর ফিরে এল না। ফ্রান্সে শাসনতন্ত্র ক্রমেই গণতান্ত্রিক হতে থাকে এবং ব্যক্তির মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃতি লাভ করে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহনশীলতা জোরদার হয় এবং আইনের সাম্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিপ্লবের ভাবাদর্শ ফ্রান্স হতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়নের বিজয়াভিযান বহু প্রাচীন শাসনব্যবস্থা ও সমাজের উচ্ছেদ সাধন করে; শাসনতান্ত্রিক অধিকার ও দুর্নীতি বিলোপ পেয়ে আইনের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই ব্যক্তিতান্ত্রিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ দেখা দিতে থাকে। ব্যক্তির ওপরই সমাজ বা রাষ্ট্র নির্ভর করে—এই চিন্তাধারা বাস্তবে পরিণত হতে থাকে। নেদারল্যাণ্ড্‌স, জার্মানি ও ইতালীতে জাতীয়তাবাদ বিশেষ ভাবে দেখা দেয়। এসব অঞ্চলে ফরাসী বিপ্লবের নীতিগুলিও প্রসার লাভ করে। যে সব ইউরোপীয় রাজ্য ফ্রান্সের অধীনে আসেনি সেগুলিতেও বৈপ্লবিক নীতিগুলি জনসাধারণের মনে স্থান পেল। এই সব দেশে জাতীয়তাবাদ দেখা দিল। জাতীয় বাহিনী, জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত জাতীয়তাবাদকে জোরদার করল। সংক্ষেপে ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ মধ্যযুগীয় আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেল।

ইউরোপে

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্প বিপ্লব

সূচনা ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কল্যাণে উৎপাদন ব্যবস্থায় যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে তাকেই শিল্প-বিপ্লব বলে। মানুষের শ্রমের পরিবর্তে নানারূপ যন্ত্রশক্তির প্রয়োগে এই পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমে বাষ্পীয় শক্তি কাজে লাগান হয়, পরে বৈদ্যুতিক শক্তি, আধুনিক কালে পারমাণবিক শক্তির কথা শোনা যাচ্ছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তিই ছিল মানুষের সম্বল। শিল্পগুলি ছিল মূলতঃ কুটির শিল্প। এই কুটির শিল্পজাত পণ্যের বাজার ছিল সীমাবদ্ধ।

উপরিউক্ত অবস্থার বদলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে কয়েকটি বিরাট বিরাট এবং মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মানুষের দৈহিক শক্তির বদলে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রশক্তি ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রকৃতিকে মানুষ তার কাজে লাগাবার জন্য নতুন নতুন উপায় বের করতে থাকে। যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব ঘটে এবং বিরাট মূলধন, প্রচুর কাঁচামাল এবং অসংখ্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বেচা-কেনার বাজারও সম্প্রসারিত হয়। উৎপাদন পদ্ধতিতে বিরাট পরিবর্তন আসার ফলে উৎপাদন সম্পর্কেও মৌলিক পরিবর্তন এল। সমাজে নতুন শ্রেণী দেখা দিল। শিল্পোৎপাদন পদ্ধতিতে ও ক্ষেত্রে শ্রেণী-সম্পর্কে এবং ব্যাপকভাবে অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনকে পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছে বলে এই পরিবর্তনকে **শিল্প বিপ্লব** বলা হয়।

স্বরূপ

শিল্পবিপ্লব কথাটির তাৎপর্য

শিল্প-বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় আকস্মিক ও চমকপ্রদভাবে দেখা দেয়নি। এটি ধীরে ধীরে শান্ত গতিতে প্রকাশিত হয়। এই কারণে অনেকে এটিকে শিল্প-বিপ্লব না বলে **শিল্প-ক্রমবিকাশ** (Industrial Evolution) বলেছেন। শিল্প ক্রমবিকাশের বা বিপ্লবের প্রধান কারণ **নতুন বণিক শ্রেণীর উদ্ভব**। ষোড়শ শতাব্দী হতে বণিক সম্প্রদায় সমুদ্র পার হয়ে বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর সম্পদ

কারণ

আহরণ করেছিল। পূর্বে কারিগরেরা নিজ নিজ গৃহে জিনিসপত্র তৈরী করত এবং নিজেরাই উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করত। কিন্তু বণিকশ্রেণীর উদ্ভবের ফলে কারিগর ও ক্রেতার মধ্যে এই মধ্যম শ্রেণীর (বণিক শ্রেণীর) আবির্ভাব হল। এদের প্রচুর অর্থ ছিল, সেজন্য এরা নিজেদের কাজে কারিগরদের নিযুক্ত করতে লাগল। এইভাবে ধীরে ধীরে একটি একটি করে কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। যারা কারখানায় গেল, পূর্বে তারা ছিল স্বাধীন কারিগর। কিন্তু এখন মালিকের কারখানায় মজুরি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তারা স্বাধীনতা হারাল। একই কারখানায় বহু কারিগর একত্রিত হওয়ায় **শ্রম বিভাগ** ব্যবস্থার প্রবর্তন হল। শ্রম বিভাগ শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম কারণ। এর পর যখন বিভিন্ন যন্ত্রের আবিষ্কার এবং ক্রমে কারখানায় সম্ভাব্য সর্বক্ষেত্রে তা প্রয়োগ হল তখন শিল্প-বিপ্লব পুরোপুরিভাবে দেখা দিল। অতএব একথা অবশ্যই বলা চলে যে শিল্প-বিপ্লবের মূলে ছিল বিজ্ঞানের অবদান। কারণ যন্ত্রগুলির আবিষ্কার বিজ্ঞানের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। আবার মূলধনও শিল্প-বিপ্লবের আর একটি কারণ। প্রচুর মূলধন না থাকলে কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হত না।

শিল্প-বিপ্লবের প্রারম্ভে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন ছিল—কাঁচা মাল, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বিস্তৃত বাজার মূলধন। ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লব প্রথম দেখা দেয়, কারণ—ইংল্যাণ্ডের এই তিনটির মধ্যে কোনটিরই অভাব হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের অধীনে অনেক উপনিবেশ ছিল। সমৃদ্ধশালী ভারতবর্ষই তার কুক্ষিগত ছিল। অতএব এই সকল দেশ হতে ইংল্যাণ্ড প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাল পেল। আবার এই সকল দেশে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তার উৎপাদিত জিনিসগুলি এই সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হতে লাগল। এ ছাড়া ইংল্যাণ্ডের মূলধনেরও অভাব হয় নি। ভারতে যুগ যুগ ধরে যে অর্থ ও সম্পদ সঞ্চিত ছিল তা ইংল্যাণ্ডের শোষণের ফলে ভারতবর্ষ হতে ইংল্যাণ্ডে চলে গেল। এই অর্থ মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে ইংল্যাণ্ড শিল্প-বিপ্লবের পথে সর্বাগ্রে অগ্রসর হল।

প্রথমে কোথায় দেখা দিল

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করত। পল্লীসমাজ ও পল্লীজীবন ছিল আদর্শ। কৃষিকার্য ও পশুপালনই ছিল জীবিকা-নির্বাহের প্রধান উপায় কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধীরে ধীরে এই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হল। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাও পরিবর্তন হল। সংক্ষেপে, **কৃষি-প্রধান ইংল্যাণ্ড শিল্প প্রধান** হয়ে উঠল।

এই সময় ইংল্যাণ্ডে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্প-বিপ্লব ঘটে। আবার **বয়নশিল্পের** উপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাব সর্বপ্রথম দেখা দেয়।

কিভাবে দেখা দিল

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে **জন কে** নামক এক ব্যক্তি 'উড়ন্ত মাকু' (Flying Shuttle) তৈরী করলেন। এর ফলে বয়ন শিল্পের রূপান্তর ঘটল। ১৭৬৪ খৃঃ-এ হারগ্রিভ্‌স নামক একজন তাঁতী একটি উন্নত ধরনের স্থতা কাটবার যন্ত্র (Spinning Jenny) আবিষ্কার করেন। এর পরে **আর্করাইট, কম্পটন ও কার্টরাইট** এর চেয়ে ভাল ভাল যন্ত্র প্রস্তুত করলেন। এদের যন্ত্রগুলি জলশক্তির সাহায্যে চালিত হত। ফলে নদীর ধারে ধারে বহু বয়নশিল্পের কারখানা গড়ে ওঠে। এর ভেতর **জেমস ওয়াট** বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন।



জেমস ওয়াট

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

কার্টরাইট বয়নশিল্পে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার প্রচলিত করলে ইংল্যাণ্ডে আধুনিক যন্ত্রচালিত কারখানার উদ্ভব হয় এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব স্থরু হল। এই সকল যন্ত্র উদ্ভাবনের ফলে ইংল্যাণ্ড সারা পৃথিবীর বস্ত্র-বাজার একচেটিয়াভাবে কিছুকালের মত ভোগ করতে লাগল।

এদিকে নতুন যন্ত্রগুলি প্রস্তুতের জন্য প্রচুর লোহের ও কয়লার প্রয়োজন হল স্থতরাং একদিকে লৌহশিল্পের উন্নতি হল ও অপরদিকে কয়লাখনির কাজ বৃদ্ধি পেল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে **কর্ট** আরও উন্নতভাবে লৌহ প্রস্তুতের পদ্ধতি বের করেন। ইংল্যাণ্ড লৌহ ও ইস্পাতশিল্পেও পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী হল।

পূর্বে ইংল্যাণ্ডে যাতায়াতের ভাল রাস্তা ছিল না। এখন শিল্পের উন্নতির জন্য উন্নততর রাস্তাঘাটের প্রয়োজন হল। এই সময় **টেলফোর্ড** ও **ম্যাক্ অ্যাডম** পাকা রাস্তা ও **জেমস ব্রিণ্ডলি** চমৎকার খাল তৈরী করবার উপায় বের করেন। ফলে, দেশের সর্বত্র প্রশস্ত রাজপথ তৈরী হল ও অসংখ্য খাল কাটা স্থরু হল।

এর পর বাষ্প-চালিত জাহাজ আবিষ্কৃত হল। তারপর '৮১৪ খৃষ্টাব্দে

স্টীফেনসন প্রথম বাষ্পচালিত রেলওয়ে এঞ্জিন নির্মাণ করেন, ফলে রেলগাড়ির যুগ শুরু হল এবং যাতায়াত ও বাণিজ্য দ্রব্য বহনের আরও সু-ব্যবস্থা হল।



জর্জ স্টিফেনসন

শিল্পের ন্যায় কৃষিক্ষেত্রেও বিপ্লবের সূচনা হয়। এই সময় কৃষিকার্যে নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হল। পশুপালনের ব্যবস্থারও খুব উন্নতি দেখা দিল। **বেকওয়েল** বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরু ও ভেড়া প্রতিপালন আরম্ভ করেন।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজ-নৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আসে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের সম্পদ খুবই বৃদ্ধি পেল। ইংল্যাণ্ড "পৃথিবীর কারখানায়" পরিণত হল।

ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল

ইংল্যাণ্ডের সম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেল সত্য কিন্তু এটি দেশের সর্বশ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল না। অল্প কয়েকজন ব্যবসায়ী কারখানার মূলধন যোগান দিয়ে লাভের অধিক অংশ আত্মসাৎ করল। শ্রমিকগণের ভাগ্যে শুধু অমানুষিক পরিশ্রম, অসীম দারিদ্র্য, অবজ্ঞা ও পৈশাচিক অত্যাচার জুটল। এর ফলে শিল্পপতি ও মালিক শ্রেণীর সহিত শ্রমিকগণের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প ব্যয়ে ইংরাজ বণিকগণ অধিক দ্রব্য উৎপন্ন করবার সুযোগ পায় এবং তারা প্রাচ্যের বাজারে সস্তার প্রতিযোগিতায় জয়ী হল।

ইংল্যাণ্ডে কুটির শিল্পের অবনতি হল এবং পরবর্তীকালে একেবারে লোপ পেল। ইংল্যাণ্ডের অনেক জনবিহীন প্রান্তর বড় বড় শহরে পরিণত হল। জনসাধারণ শহরমুখী হল এবং গ্রামগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল।

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা কমতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও কলকারখানার দৌলতে বিত্তশালী হয়ে উঠল এবং তারা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপন করল। শিল্প-কেন্দ্রগুলি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচনের অধিকার পেলে অভিজাত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা কমে যায়। পরবর্তীকালে শ্রমিকশ্রেণী যখন ভোটাধিকার পেল তখন তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল।

আগেই বলা হয়েছে যে শিল্প-বিপ্লব শুধু ইংল্যাণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এবং আমেরিকা মহাদেশে শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ গিয়ে পৌছাল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্প-বিপ্লব

বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং জার্মানিতে শিল্পবিপ্লব অল্পকালের মধ্যেই প্রসারলাভ করে। এসব দেশের শিল্পোন্নতিতে প্রথম দিকে অবশ্য ইংরাজ পরিচালক এবং ইংরেজ মূলধন কাজ করেছিল। বেলজিয়ামের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ফ্রান্সে প্রথম রেলপথ তৈরী হয় ইংরাজদের সাহায্যে। তবে ফ্রান্সের পুঁজি খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। ফলে ফ্রান্সে শিল্প-প্রসার খুব দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। জার্মানিতে শিল্প-বিপ্লব বয়ন-শিল্পকে কেন্দ্র করে শুরু হয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই লৌহ শিল্পে জার্মানি খুব এগিয়ে যায়।

আমেরিকায়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প-বিপ্লবের প্রেরণা আসে ইংল্যাণ্ড হতে। এখানে শিল্প-বিপ্লব একটু দেরিতে শুরু হলেও এর গতি এখানে তীব্রতর হয়। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে নতুন নতুন কারখানা ও রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার পশ্চিমাঞ্চলের অনধিকৃত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের দিকে নিজের আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে থাকে। কালক্রমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার শিল্পের বাজারকে রক্ষা করার জন্য এক নীতি ঘোষণা করে :(মনরো নীতি)। পরবর্তীকালে শিল্পপ্রধান উত্তরাঞ্চলের সাথে কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চলের যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তার মূলে ছিল শিল্প-বিপ্লব প্রসূত অর্থনৈতিক প্রশ্ন।

শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হওয়ায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি পৃথিবীর অন্যান্য অংশে পড়ল। শিল্পে-অগ্রসর রাষ্ট্রগুলি তাদের শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ও বৃহত্তর বাজারের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র সুযোগ সুবিধা খুঁজতে লাগল এবং তাদের কারখানাগুলি চালাবার এবং শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করবার জন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন তাও সংগ্রহ করবার জন্য পৃথিবীর শিল্পে-অনুন্নত দেশগুলির প্রতি দৃষ্টি দিল। এর ফলে পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর দেশ দেখা দিল—**শিল্পে অগ্রসর ও শিল্পে অনগ্রসর দেশ**। শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলি

সাধারণত কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশগুলি আবার প্রায়ই ঘনবসতিপূর্ণ। অতএব এই সকল ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে শিল্পে-উন্নত দেশগুলির দু দিক দিয়ে সুবিধা হওয়ার কথা—তাদের কলকারখানাগুলি চালু রাখবার জন্য কাঁচামালের অভাব থাকবে না এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর লাভে বিক্রয়ের সম্ভাবনা (ঘন বসতিপূর্ণ বলে)। এই কারণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে নজর দিল।

সাম্রাজ্যবাদ

প্রথমে ইউরোপীয়গণ এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। ভারতবর্ষ ইংরাজদের অধিকারে চলে গেল। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজরা আধিপত্য স্থাপন করল। ইন্দোচীনে ফরাসী এল। বিশাল চীনদেশও রেহাই পেল না। সাম্রাজ্যলোলুপ দেশগুলির প্রভুত্ব চীনের অনেক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল। আফ্রিকার সমস্ত দেশ ইউরোপীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির অধীনে চলে গেল। এই সকল দেশ যদিও শোষিত ও লুণ্ঠিত হতে থাকল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিন্তু সম্প্রীতি রইল না। এক রাষ্ট্র অন্য এক রাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল এবং তাদের অধীনে যে সব উপনিবেশ ছিল সেগুলিতে নিজ দেশের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য আমদানী হতে দিল না। এর ফলে আন্তর্জাতিক রেষারেষি বৃদ্ধি পেল এবং বিশ্বযুদ্ধের পথ সুগম করে দিল।

সংক্ষেপে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ শিল্প বিপ্লবেরই পরোক্ষ ফল। সাম্রাজ্য নিয়ে শিল্পপ্রধান দেশগুলি যে পশুর ন্যায় হানাহানি করছিল এবং এখনও করছে তা শুধু শিল্পপ্রধান দেশগুলির ক্ষতি করেনি, মানব-জাতির উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হয়েছে। শক্তিশালী দেশগুলির বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়েছে এই তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিতে আধিপত্য বজায় রাখবার জন্য।

মানব-সভ্যতার উপর শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব বলে বা লিখে শেষ করবার নহে। জগতের প্রত্যেক দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানসিক ক্ষেত্রে শিল্প-বিপ্লব সত্যসত্যই বিপ্লব এনেছে। এখানে শিল্পে অনুন্নত বা উন্নত এ প্রশ্ন ওঠে না। অধুনা প্রত্যেক দেশই অল্পবিস্তর শিল্পে উন্নত হয়েছে। সকল রাষ্ট্রেরই একমাত্র চেষ্টা নিজ নিজ রাষ্ট্রকে শিল্পে আরও উন্নত করা। এই 'আরও-র' বুঝি শেষ নেই।

শিল্প-বিপ্লব প্রথমেই শহরমুখী সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক দেশেই এখন বড় বড় শহরের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের জনবিহীন প্রান্তর এখন জনমুখর হয়েছে।

এটা শিল্প-বিপ্লবেরই ফলে। কারণ বড় বড় কারখানা স্থাপনের ফলেই শহরের সৃষ্টি। এর ফলেই প্রাচীন সভ্যতার মৃত্যু ঘটেছে এবং প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। মানুষকে আরও আরামপ্রিয় করেছে। শিল্পদ্রব্য না হলে এখন মানব-সভ্যতা পঙ্গু হয়ে পড়বে।

আধুনিক সভ্যতা ও শিল্প-বিপ্লব

শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফলে খাদ্যের ঘাট্‌তি দেখা দিয়েছে। অবশ্য শিল্প-বিপ্লবের ফলেই বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য করে খাদ্যশস্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রত্যেক দেশেই শ্রমিকশ্রেণী বলে একটি শক্তিশালী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। যে দেশ শিল্পে যত উন্নত সে দেশে শ্রমিকশ্রেণী তত শক্তিশালী। দেশের রাজনীতিতে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে শ্রমিক দল একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। রাশিয়া প্রভৃতি দেশে সকলেই শ্রমিক বলে গণ্য হয়।

শিল্প-বিপ্লব মানুষের চিন্তাধারায় এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে। মানুষের মনে ধর্মের প্রভাব শিথিল হয়েছে। মানুষ অর্থকেই পরমার্থ বলে গ্রহণ করেছে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশে শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বে শিশুকে গৃহে শিক্ষা দেওয়া হত, এখন গৃহের স্থান নিয়েছে বিদ্যালয়।

শিল্প-বিপ্লবের সাথে সাথে বিভিন্ন বিজ্ঞান-সাধনা এগিয়ে চলল। চিকিৎসা বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নতি ঘটল। ভূগোল, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতির উন্নতি ঘটল।

যানবাহনের উন্নতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দিল। কলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নতুন মূল্যবোধ দেখা দিল। এ দুটি ক্ষেত্রে বাস্তবতাবাদের সূচনা হল।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে রেষারেষি চলেছে তাও শিল্প-বিপ্লবের ফল। আমেরিকা যে সমস্ত জগৎ জুড়ে তার প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে এবং পারছে তাও সম্ভব হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প শীর্ষস্থানে বলে। রাশিয়া যে আমেরিকাকে পরাজিত করতে চেষ্টা করছে তাও তার শিল্পে অভাবনীয় উন্নতির জন্য। ইংল্যাণ্ড যে দুটি সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধের পরও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে টিকে আছে তাও শিল্পোন্নতির জন্যই। খণ্ডিত জার্মানি ও পরাজিত জাপান যে পুনরায় নিজ নিজ

পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে তাও শিল্পোন্নয়নের জন্য। ভারতবর্ষ তার অসংখ্য দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চাইছে শিল্পোন্নতির মাধ্যমেই। ভারতের প্রথম চারটি পাঁচসালা পরিকল্পনার মূল নীতির দিকে লক্ষ্য রাখলেই এটা বুঝতে পারা যায়।

আধুনিক মানব-সভ্যতা শিল্পাশ্রয়ী বললে ভুল হবে না। উপরি-উক্ত আলোচনা হতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে আধুনিককালে মানবসভ্যতা সম্পূর্ণভাবে শিল্প-ভিত্তিক হয়ে পড়েছে। দেশের উন্নতি বলতে এখন অর্থনৈতিক উন্নতিই বুঝায় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে শিল্পোন্নতির উপর। অধুনা প্রত্যেক রাষ্ট্রই তার জাতীয় সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নতির কার্যে প্রয়োগ করছে। পরিশেষে, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে শিল্পোন্নতির সাথে সাথে যেন আমাদের মানবিক গুণাবলীরও উৎকর্ষ ঘটে। মানুষের মন যেন কারখানা-ধর্মী শিল্পগন্ধী না হয়ে পড়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভিয়েনা সিদ্ধান্ত—ইউরোপীয় সংঘ—মেটারনিক ব্যবস্থা

ভিয়েনা সম্মেলন ঃ নেপোলিয়ন তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা ইউরোপে এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করেন, ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর পতনের পর ইউরোপে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয় এবং তার সমাধানের জন্য সমবেত চেষ্টা করা হয়। ভিয়েনা সম্মেলন এই সমবেত চেষ্টাকে রূপদান করে।

ভিয়েনা সম্মেলন একটি সাধারণ সম্মেলন বা সভা ছিল না। সরকারীভাবে এর কোন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেননি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্থাপিত অনেকগুলি সন্ধি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত ও পুনরনুমোদিত হয় এবং এটাই ভিয়েনার শান্তি ব্যবস্থা বলে পরিচিত।

নেপোলিয়নকে যে সব রাষ্ট্র পরাজিত করেছিল সেই রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা ভিয়েনা শহরে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। তুর্কী সাম্রাজ্য ছাড়া আর সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে যোগ দেন। ফ্রান্সের প্রতিনিধিও এখানে স্থান পান। অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিক বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন। অনেক সংখ্যক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকলেও কার্যকালে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিনিধিরাই যা ঠিক করলেন তা-ই গৃহীত হল।

ভিয়েনা বৈঠকের সমস্যা ঃ ভিয়েনা সম্মেলন নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমত: ইউরোপকে পুনর্গঠন করার সমস্যা। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যৎ ফরাসী ভীতি হতে ইউরোপকে রক্ষা করা। তৃতীয়ত, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ভবিষ্যতে লাভালাভের প্রশ্নে যে সব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেগুলি মেনে চলার সমস্যা। চতুর্থত, পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। পঞ্চমত, জার্মানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। সবশেষে ছিল ক্ষতিপূরণ ও শক্তিসাম্য রক্ষা করার সমস্যা।

মূলগত নীতি ঃ উপরিউক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবর্গ কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করলেন যথা—(ক) আইনগত উত্তরাধিকার

নীতি (Legitimacy) (খ) শক্তিসাম্য নীতি (balance of power), (গ) পুরস্কার দানের নীতি (reward) এবং স্থিতাবস্থা নীতি (status quo)।

তিনটি নীতি

সম্মেলনের নেতৃবর্গ ঘোষণা করলেন যে উপযুক্ত শক্তি বণ্টনের ভিত্তিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া আরও ঘোষণা করলেন যে ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠন তাঁরা করতে চান।

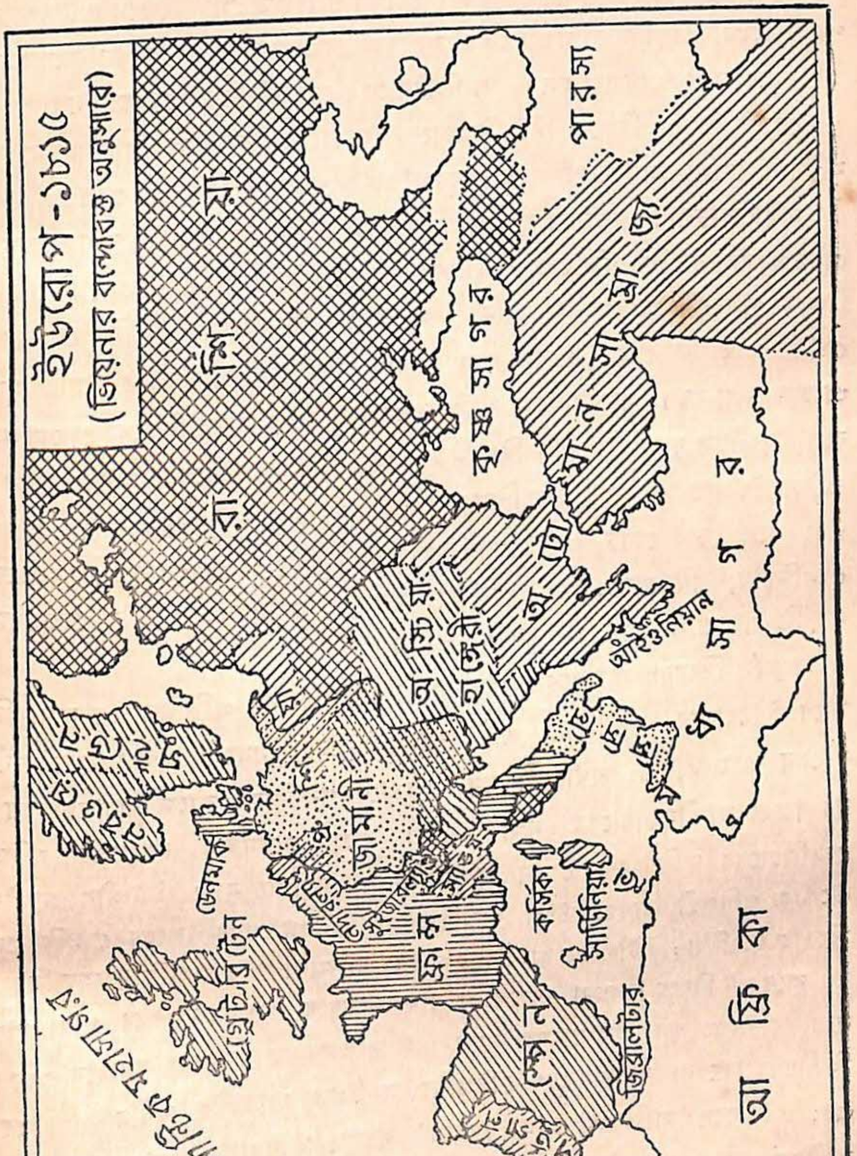
শক্তিসাম্য নীতির প্রয়োগ ঃ শক্তি-সাম্য নীতি প্রয়োগ করবার সময় সর্বাগ্রে এল ফ্রান্সের কথা। নতুন ফরাসী রাজ্য গঠিত হল ১৭৯০-এর সীমারেখাকে ভিত্তি করে। এই নতুন ফ্রান্স ভবিষ্যতে যাতে আর শান্তির বিঘ্নস্বরূপ না হতে পারে তার জন্য প্রথমত এর সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলি পাঁচ বছরের জন্য বিজয়ী বাহিনীর দখলে থাকবে বলে স্থির করা হল। দ্বিতীয়ত, ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হল। তৃতীয়ত, ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী দেশগুলিকে শক্তিশালী করা হল। উত্তর সীমান্তে হল্যাণ্ডকে শক্তিশালী করার জন্য অষ্ট্রিয়ার নিকট হতে বেলজিয়ামকে নিয়ে হল্যাণ্ডের সাথে জুড়ে দেওয়া হল। পূর্বসীমান্তে প্রাশিয়াকে রাইন অঞ্চল দেওয়া হল। জার্মানিতে একটি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করা হল। জার্মানিতে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়াল ৩৯টি। এই যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হল অষ্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়া হল সহ-সভাপতি। আলপাইন অঞ্চলে পিডমণ্টকে শক্তিশালী করার জন্য এর সাথে জেনোয়াকে জুড়ে দেওয়া হল।

সম্ভাব্য ফরাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

আইনগত উত্তরাধিকারের নীতির প্রয়োগ ঃ আইনগত উত্তরাধিকারের নীতি অনুসারে ফ্রান্স, স্পেন ও দুই সিসিলি রাজ্যে বুরবোঁরা সিংহাসন ফিরে পেল। হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ বংশ, সার্ডিনিয়া ও পিড্মণ্টে স্যাভয় বংশ তাদের অধিকার ফিরে পেল। ইটালীতে পোপ তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। রাইন অঞ্চলের বিতাড়িত জার্মান রাজারা নিজ নিজ রাজ্য ফিরে পেল। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এই নীতির প্রয়োগ করা হল না। ইংল্যাণ্ড যুদ্ধের সময় ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও স্পেনের যে সব উপনিবেশ দখল করেছিল সেগুলি আর ওই সমস্ত দেশকে ফিরিয়ে দেওয়া হল না। তেমনি ভেনিস ও জেনোয়ার প্রজাতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠার কথাই উঠল না।

পুরাতন ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা

ক্ষতিপূরণ নীতির প্রয়োগ ঃ বিজয়ীদের ক্ষতিপূরণ করবার উদ্দেশ্যে প্রাশিয়াকে পোমেরানিয়া, স্যাকসনীর দুই তৃতীয়াংশ, ওয়েষ্টফেলিয়া এবং প্রায় সমগ্র রাইন অঞ্চল, পোসেন, থর্ন এবং ড্যানজিগ দেওয়া হল। রাশিয়া পেল পোল্যাণ্ডের এক বিস্তীর্ণ অংশ এবং সম্পূর্ণ ফিনল্যাণ্ড। অষ্ট্রিয়া বেলজিয়াম ছেড়ে দিয়ে ইটালীতে লম্বার্ডি-


ইউরোপ-১৮১৫
(ভিয়েনার বন্দোবস্ত অনুসারে)
কৃষ্ণ সাগর
পারস্য
জার্মানী
ফ্রান্স
ডেনমার্ক
গ্রেটব্রিটেন
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
জিব্রালটার
আইওনিয়ান
আফ্রিকা

ভেনেসিয়া নিল। তাছাড়া টাইরল, সালসবার্গ প্রভৃতি অঞ্চলও অষ্ট্রিয়ার হাতে গেল। এর ফলে আল্পস্ হতে এড্রিয়াটিক পর্যন্ত অষ্ট্রিয়া রাজ্য বিস্তৃত হল। ইতালীর টাস্কানি, পার্মা, মডেনা প্রভৃতি রাজ্যগুলিতেও হ্যাপস্‌বুর্গ বংশের অধিকার স্থাপন করা হল। সুইডেনকে নরওয়ে দেওয়া হল। ব্যাভিরিয়াকেও কয়েকটি অঞ্চল দেওয়া হল।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চালিয়েছিল বলে ইংল্যাণ্ড মাণ্টা, মরিসাস, হেলিগোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু অংশ এবং সিংহল দ্বীপ পেল।

সমালোচনা ঃ ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যাবলীর বহু সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয় যে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ নিজেদের প্রবর্তিত নীতিগুলিও ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করেননি। আইনগত উত্তরাধিকার নীতি জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি। দ্বিতীয়ত শাস্তি নীতি সুবিধামত প্রয়োগ করা হয়। ডেনমার্ককে শাস্তি দেওয়া হল কিন্তু ব্যাভেরিয়াকে দেওয়া হল না। তৃতীয়ত বৃহৎ রাজ্যগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেছিল। অষ্ট্রিয়া, ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি নিন্দনীয়ভাবে প্রকাশ পায়। এবং ফলে ছোট ছোট রাষ্ট্রের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া হয়। নরওয়ে, বেলজিয়াম, ফিনল্যাণ্ড, পোমেরানিয়া স্যাক্সনী, পোল্যাণ্ড, লম্বার্ডি, ভেনেসিয়া প্রভৃতি রাজ্যগুলির স্বার্থ চিন্তা করাই হল না।

চতুর্থত ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রনায়কগণ প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি নিয়ে ইউরোপের পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। তাঁরা সকলেই স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁদের স্বার্থান্বেষী মন সুষ্ঠুভাবে পুনর্গঠনের কাজে বাধাস্বরূপ হয়। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সম্মান তাঁরা রক্ষা করেননি। হল্যাণ্ডের সহিত বেলজিয়ামের ভুক্তিকরণ কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নয়। ইটালীর জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী ব্যবস্থা তাঁরা করেছিলেন। এইজন্য পরবর্তীকালে বেলজিয়ামে বিদ্রোহ হয়েছিল ; ইটালীতে রাজনৈতিক ঐক্য না আসা পর্যন্ত অশান্তি দূর হয় নি।

কয়েকটি বিষয়ে ভিয়েনা সম্মেলনের সাফল্য সম্বন্ধে প্রশংসা না করে পারা যায় না। প্রথমত, খুব কম সময়ের মধ্যে এই সম্মেলন বহু সমস্যার সমাধান করে। দ্বিতীয়ত ভিয়েনা ব্যবস্থা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সমষ্টিগত গ্যারাণ্টির অধীন রাখা হয়, এবং এর ফলে 'জাতিসংঘ' ও 'জাতিপুঞ্জের' অগ্রদূত 'ইউরোপীয় সংঘ' স্থাপিত হয়। তৃতীয়ত জার্মানিতে যৌথরাষ্ট্র স্থাপন করে এই সম্মেলন ভবিষ্যৎ জার্মান ঐক্যসাধনের সহায়তা করেছিল। সর্বশেষে বলা যায় যে কোন শান্তি চুক্তিই বহুদিন ধরে শান্তি রক্ষা করতে পারেনা।

ভিয়েনা সম্মেলনের কার্যকলাপে দোষত্রুটি ছিল সকলেই মনে করেন কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে এই সম্মেলন তার কার্যাবলীর দ্বারা ইউরোপে প্রায় ৪০ বৎসর শান্তি বজায় রাখতে পেরেছিল।

অধুনা আমরা যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছি তাতে 'ভিয়েনা সম্মেলন' যে ব্যর্থ হয়েছিল তা বলতে লজ্জা বোধ করি। গত মহাযুদ্ধ বহু বছর হল শেষ হয়েছে। আজও পরাজিত রাষ্ট্রগুলির সাথে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি। পুনরায় যুদ্ধের কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ জগতে শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। অতএব ভিয়েনা সম্মেলনকে পরবর্তীকালের ঘটনার দ্বারা বিচার করলে চলবে না। তখনকার রাষ্ট্রনায়কগণকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাপুরুষ ভাবলে ভুলই করা হবে।

ইউরোপীয় সংঘঃ ফরাসী-ভীতি নেপোলিয়নের পতনের পর এবং ভিয়েনা সম্মেলনের পরও দূরীভূত হয় নি। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা যাতে শান্তি ব্যাহত করতে না পারে তার জন্য সর্ব-ইউরোপীয় পর্যায়ে এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হল। প্রধান চারটি শক্তি (ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া) পরস্পর এক চুক্তিপত্র সম্পাদিত করল। একে চতুঃশক্তি চুক্তি (Quadruple Alliance) বলা হয়। একে ভিত্তি করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে মিলন-নীতি স্থাপিত হল তাই Concert of Europe বা 'ইউরোপীয় সংঘ' নামে খ্যাত। ইউরোপের কূটনীতিবিদ্‌রা ইউরোপের শান্তি অব্যাহত রাখবার জন্য যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। ফ্রান্স যাতে আর সমগ্র ইউরোপের শান্তিকে বিনষ্ট করতে না পারে সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বৃহৎ চারটি রাষ্ট্র উদগ্রীব ছিল। তাদের একতার মধ্য দিয়েই Concert of Europe-এর উদ্ভব ঘটে। আর আলেকজাণ্ডারের 'পবিত্র চুক্তি' এবং মেটারনিক-ক্যাসালরির 'চতুঃশক্তি চুক্তি' এই পরিকল্পনার দুটি অংশ। 'পবিত্র চুক্তি' অবাস্তব ছিল এবং কেবলমাত্র ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ রইল। সে কারণে চতুঃশক্তি চুক্তিই Concert of Europe-এর মূল ভিত্তি। চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীই কনসার্টের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী হল।

ইউরোপীয় সংঘ

ভিয়েনা ব্যবস্থার রচয়িতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভিয়েনা ব্যবস্থাকে চালু রাখতে হলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন অপরিহার্য। একারণে যে দিন ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া প্যারিসের দ্বিতীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত করে (নভেম্বর ২০শে, ১৮১৫) ঠিক সেই দিনই তারা নিজেদের মধ্যে আর একটি চুক্তি সম্পাদিত

করল। এই চুক্তির দ্বারা চতুঃশক্তি মিতালিকে টিকিয়ে রাখা হল। এই চারটি শক্তি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করল যে তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চাউমণ্ট, ভিয়েনা ও প্যারিসের ব্যবস্থাগুলি অন্ততঃ বিশ বছর টিকিয়ে রাখবে। ইউরোপের শান্তি রক্ষায় চারটি শক্তি এই যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করল তার ফলেই দেখা দিল Concert of Europe বা ইউরোপীয় শক্তি সমবায়। তাছাড়া, চারটি রাষ্ট্র মেনে নিল যে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ইউরোপে শান্তি অব্যাহত রাখবে এবং এই উদ্দেশ্যে তারা কিছুদিন অন্তর বৈঠকে বসে সাধারণ স্বার্থ, জাতির স্বার্থ এবং ইউরোপের সামগ্রিক শান্তি রক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করবে।

কিভাবে দেখা দিল

এর রূপান্তর ঃ চতুঃশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। সমস্যা-পীড়িত ইউরোপে এটি নতুন আশার সঞ্চার করল। কারণ জনসাধারণের তখন একমাত্র কাম্যবস্তু ছিল শান্তি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চতুঃশক্তি চুক্তি প্রতিক্রিয়াশীল যন্ত্রে পরিণত হল। ইউরোপের সাধারণ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে স্বৈরাচারী শাসকবৃন্দের স্বার্থ রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য হল। ইউরোপীয় শান্তি রক্ষা অপেক্ষা স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষা করাই বৃহৎ শক্তিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হল। এই ক্রমাবনতি কনসার্ট অব ইউরোপের মৃত্যুঘণ্টা বাজাল। কনসার্ট অব ইউরোপের আবির্ভাব যেমন ইউরোপীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা, এর ক্রমাবনতি ও পতনও তেমনি স্মরণীয় দুঃখজনক ঘটনা।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে **আইলা-স্যাপেলে** প্রথম সভা ডাকা হয়। ফ্রান্স হতে মিত্র পক্ষের সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়, এবং ফ্রান্সকে চতুঃশক্তি চুক্তিতে যোগদান করতে অনুমতি দেওয়া হয়, কারণ ফ্রান্স প্যারিস সন্ধির শর্তসমূহ অতি দ্রুত পালন করে। এই ভাবে চতুঃশক্তি-চুক্তি প্রকৃতপক্ষে পঞ্চ-শক্তি চুক্তিতে পরিণত হল। এই বৈঠকে শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেগুলির সু-মীমাংসা হল। কিন্তু এই বৈঠকেই আবার স্পেনের উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ দমনে এবং ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুদের অত্যাচার নিবারণের ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। সুতরাং প্রথম বৈঠকেই কনসার্টের সভ্যবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহের লক্ষণ দেখা গেল এবং চতুঃশক্তি চুক্তিতে ভাঙন শুরু হল।

আইলা-স্যাপেল ১৮১৮

ট্রপো বৈঠক (১৮২০): কনসার্টের সভ্যদের মধ্যে যে মতবিরোধ ছিল তা এই বৈঠকে বিশেষভাবে দেখা যায়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের শুরুতে স্পেন, পর্তুগাল, পিডমণ্ট ও নেপল্‌সে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয় যার ফলে এই সব দেশের অত্যাচারী রাজারা উদারপন্থী শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। রাশিয়ার জার স্পেনের বিদ্রোহের সংবাদে খুবই বিচলিত হন এবং এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য অস্ট্রিয়া ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে ১৫০০০ রুশ সৈন্য পাঠাতে চান। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্স রুশ প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এই আশঙ্কায় রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। কিন্তু স্পেনের বিদ্রোহের ঠিক পরই যখন নেপল্‌সের বিদ্রোহের খবর মেটারনিকের নিকট পৌছাল তখন তিনি আর বিলম্ব করতে পারলেন না। যদি বিদ্রোহীরা নেপল্‌সে জয়ী হয় তা হলে ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব চলে যেতে পারে এই আশঙ্কা তিনি করলেন এবং নেপল্‌সের বিদ্রোহ ও অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কনসার্টের একটি বৈঠক সত্বর আহ্বান করার জন্য অনুরোধ জানালেন। কনসার্টের সকল সদস্যই বিপ্লব-বিরোধী ছিল বলে এই সব বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য ট্রপো নামক স্থানে সম্মেলন ডাকা হল।

মেটারনিক তখন কনসার্টে অবিসংবাদী নেতা। একারণে নেপল্‌সের বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি যা দাবি করলেন তা ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতা সত্বেও মেনে নেওয়া হল। স্পেনের বিদ্রোহ সম্বন্ধে ফ্রান্সের দাবি মুলতুবী রাখা হল। তাছাড়া বিদ্রোহ সম্বন্ধে একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া গ্রহণ করল। কংগ্রেসের নামে একটি ঘোষণাপত্র জারী করা হল যেটিকে ট্রপো ঘোষণাপত্র (Troppau Protocol) বলা হয়। এই ঘোষণাপত্রটির উদ্ভাবক ছিলেন স্বয়ং মেটারনিক। এতে বলা হল যে রাজার স্বেচ্ছাকৃত দান ভিন্ন কোন সাংবিধানিক সংস্কার স্বীকার করা হবে না। যদি কোন রাষ্ট্রে অন্য রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ও বিপ্লবের দ্বারা কোন শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহলে এই রাষ্ট্রটিকে ইউরোপীয় রাষ্ট্র সম্মেলনের সদস্য পদ হতে বের করে দেওয়া হবে এবং সম্মেলনের সদস্যরা ইচ্ছা করলে একজোটে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ দ্বারা সেই রাষ্ট্রে পূর্বেকার শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারবে।

ট্রপো ঘোষণাপত্র

ইংল্যাণ্ড এই ঘোষণাটিকে বিপ্লব বন্ধ করার অজুহাতে এক রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি-পত্র বলে মনে করল এবং ইংল্যাণ্ড বরাবরই এরূপ নীতির বিরোধী ছিল। একারণে সে ট্রপো ঘোষণারও বিরোধিতা করল এবং এটিকে স্বীকার করল না।

ইংল্যাণ্ডের নীতি

ট্রপো বৈঠকে সদস্যবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ বিশেষভাবে দেখা দেয় বলে কোনরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। কংগ্রেসের অধিবেশন কয়েকমাসের জন্য মুলতুবী রাখা হল।

এই মুলতুবী অধিবেশন বসল ১৮২১ খৃষ্টাব্দে **লাইবেক** নামক স্থানে। এই বৈঠকে ইটালীর ব্যাপারে অষ্ট্রিয়ার বিশেষ স্বার্থ আছে বলে স্বীকার করা হল এবং একারণে তাকে নেপল্‌স ও পিডমণ্টে বিদ্রোহ দমন করবার অধিকার দেওয়া হল। অষ্ট্রিয়া খুব সহজেই নেপল্‌স ও পিডমণ্টের বিদ্রোহ দমন করল। নেপল্‌সের সিংহাসনে অত্যাচারী ফার্ডিন্যাণ্ড পুনরায় বসলেন।

ভেরোনার বৈঠক ১৮২২ঃ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ভেরোনাতে তৃতীয় সম্মেলন ডাকা হয় এবং স্পেনের বিপ্লব ও গ্রীক বিদ্রোহ ছিল এর আলোচ্য বিষয়। এই সম্মেলন ফ্রান্সকে স্পেনে বিদ্রোহ দমনের ভার দিল; এবং ফরাসী সৈন্যরা স্পেনের গণ-বিপ্লব দমন করল। ইংল্যাণ্ড স্পেনের ব্যাপারে ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ জানাল। এর কিছুদিনের মধ্যেই স্পেনের আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলি মাতৃভূমি স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অষ্ট্রিয়া প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এই সব বিদ্রোহী উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে বলে হুমকি দেখালে ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্যানিং পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করলেন যে ইংল্যাণ্ড এরূপ কার্যে সক্রিয়ভাবে বাধা দেবে। এরপর ইংল্যাণ্ড খুব তাড়াতাড়ি স্পেনীয় আমেরিকান উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল। ইতিমধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সুবিখ্যাত 'মনরো নীতি' ঘোষণা করায় ইংল্যাণ্ডের সুবিধা হল। এই নীতিতে বলা হয় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা মহাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ কোনক্রমেই বরদাস্ত করবে না। গ্রীক বিদ্রোহ সম্বন্ধে এই বৈঠক বিশেষ কিছু করল না। রাশিয়া গ্রীসে তুরস্কের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল কিন্তু এতে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে ভেবে ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া এর বিরোধিতা করল। একারণে ভেরোনা সম্মেলনে গ্রীক সমস্যাকে চাপা দেওয়া হল।

ভেরোনা বৈঠকেই চতুঃশক্তি চুক্তির কার্যতঃ অবসান হল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার জার সেণ্ট পিটার্সবার্গে প্রাচ্য সমস্যা আলোচনা করবার জন্য দুটি সভা ডাকেন। কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হয়।

বিফলতার কারণঃ বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই চতুঃশক্তি-সংঘই প্রথম

ব্যর্থতা

আন্তর্জাতিক সংস্থা। কিন্তু এটি কার্যকরী হয়নি। এর ব্যর্থতার কারণ সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। কনসার্টের চরিত্র, সংগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই এর পতনের বীজ উপ্ত ছিল।

প্রথমতঃ, এই সংঘটি কয়েকটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত হয়েছিল। এরা

প্রত্যেকেই ফরাসী-বিপ্লব-প্রসূত ভাবধারার বিরোধী ছিল। বিপ্লবের প্রতি তীব্র ঘৃণার ফলে তারা এক ঐতিহাসিক শক্তিকে অস্বীকার করল। ফলে এর পতন অবশ্যম্ভাবী হল। দ্বিতীয়তঃ, সদস্য-রাষ্ট্রগুলি আপন আপন স্বার্থ সম্বন্ধেই সজাগ ছিল বেশী। এর ফলে 'খোলা মন' নিয়ে কোন রাষ্ট্রই অধিবেশনে যোগ দেয় নি। এরূপ মনোভাব বর্তমান থাকলে অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয়তঃ, ইংল্যাণ্ড প্রথম থেকে সহযোগিতা করছিল না। অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতি ইংল্যাণ্ড পছন্দ করল না। ট্রপো ঘোষণা ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও গৃহীত হয়। ভেরোনাতে ইংল্যাণ্ডের মতামত অগ্রাহ্য করা হল। ক্যানিং তখন কনসার্টের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করলেন। ইংল্যাণ্ডের এই মনোভাব ও সংস্রব ত্যাগ কনসার্টকে শক্তিহীন করল। সবশেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বলিষ্ঠ মনোভাব এই সংঘটির মৃত্যু ঘটাল।

ঐতিহাসিক মূল্য

তবে এটি স্বীকার করতেই হবে যে চতুঃশক্তি চুক্তি যৌথ নিরাপত্তা নীতি ও আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত দেয়, এবং এটি নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের ফলস্বরূপ ছিল। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত জাতিগুলির সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হতেই চতুঃশক্তি চুক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল।

মেটারনিক ব্যবস্থাঃ ১৮১৫ হতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের প্রধান রাজনৈতিক পুরুষ ছিলেন মেটারনিক, এজন্য এই যুগটিকে মেটারনিকের যুগ এবং তাঁর সময়ের ইউরোপের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে 'মেটারনিকের ব্যবস্থা' বলা হয়।



মেটারনিক

প্রথম জীবন ও চরিত্রঃ তিনি জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর পিতা অবশ্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। বাল্যকাল হতেই মেটারনিকের প্রতিভার স্ফূরণ হয়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নিজ প্রতিভাবলে অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার হন। এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কূটনীতিতে ঐসময় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তাঁর মনোবল ও কূটনীতি নেপোলিয়নের পরাজয়ের

অন্যতম প্রধান কারণ বলে অনেকে মনে করেন এবং এর ফলে তিনি ইউরোপীয় রাজনীতিতে অর্ধ-শতাব্দীকাল অবিসংবাদী নেতা ছিলেন। মেটারনিক সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সাধুতা, নৈতিকতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতির রাজনীতিতে কোনস্থান নেই বলে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

জীবনী

মেটারনিক ব্যবস্থা কাকে বলে ও তার স্বরূপঃ সাম্রাজ্যের প্রধান কর্ণধার রূপে মেটারনিক বহুজাতিভিত্তিক অষ্ট্রিয়া রাজ্যের দুর্বলতা ভালভাবেই জানতেন। একারণে তাঁর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়ার স্বার্থরক্ষা করা। তিনি পতনোন্মুখ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এবং এর জন্যই তিনি তাঁর বহু নিন্দিত **মেটারনিক ব্যবস্থা** গড়ে তুললেন। তথাকথিত মেটারনিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল যেমন করেই হোক অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করা, এবং স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রাখা। তিনি অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে এক ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করবার চেষ্টা করেন নি, কারণ তিনি জানতেন এটি অসম্ভব, অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনৈক্য ও দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। বহু পুরাতন Divide and Rule নীতিই এই ব্যবস্থার চালিকা শক্তি ছিল। এই নীতির বাস্তব পরিণতি দেখা গেল যখন মেটারনিক বোহেমিয়ায় জার্মান সৈন্য ও কর্মচারী রাখলেন এবং লম্বার্ডিতে হাঙ্গেরীয় সৈন্যদের নিয়োগ করলেন। জার্মানীতে এই ব্যবস্থার কার্যকরী রূপ দেখা গেল যখন মেটারনিক জার্মান কনফেডারেশনটিকে টিকিয়ে রাখবার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করলেন। কারণ কনফেডারেশনের সভাপতি ছিল অষ্ট্রিয়া। জার্মানীতে যাতে কোন একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হতে না পারে মেটারনিক সর্বদাই সেই চেষ্টা করতেন। তা ছাড়া জাতীয়তাবাদ ও উদারনৈতিক আন্দোলন জার্মানীতে যাতে দানা বাঁধতে না পারে তার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকারের দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। জার্মান কনফেডারেশনের মাধ্যমে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে সিদ্ধ করেন। এই সময় প্রাশিয়া তার আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে জার্মানীতে মেটারনিকের ব্যবস্থা জয়যুক্ত হল।

লক্ষ্য ও নীতি

জার্মানীতে মেটারনিক ব্যবস্থা

জার্মানীতে কনফেডারেশনের ডায়েট মারফৎ মেটারনিক তাঁর ব্যবস্থা কার্যকরী করতে সক্ষম হন। কিন্তু ইটালীতে জার্মান কনফেডারেশনের মত কোনরূপ

রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠতে পারেনি। একারণে ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার প্রভাব স্থাপন করতে মেটারনিককে বেশ বেগ পেতে হয়। ইটালীতে হাপসবার্গ বংশীয় যে সব রাজা রাজত্ব করতেন তাঁদের মারফৎ মেটারনিক তাঁর ব্যবস্থা চালু করতে চেষ্টা করেন। তাছাড়া গুপ্ত পুলিশ সংস্থার মাধ্যমেও তিনি এই ব্যবস্থাকে বাস্তবে পরিণত করতে উদ্যোগী হন। স্বৈরতন্ত্রী রাজাদের মধ্যে যাতে ঐক্যভাব না গড়ে উঠতে পারে তার জন্য মেটারনিক চেষ্টা করেন। ইটালীতে স্বৈরতন্ত্রী রাজারা বাধ্য হয়ে মেটারনিকের মুখাপেক্ষী হল এবং এই সুযোগে তিনি তাঁর ব্যবস্থা চালু করলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ করা হল, সমস্ত গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করা হল। কিন্তু এত চেষ্টা করেও মেটারনিক ইটালীতে তাঁর ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে পারলেন না। তিনি ইটালীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটি যৌথ রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেন কিন্তু পোপ ও সার্ডিনিয়ার রাজার বিরোধিতার জন্য এটি সম্ভব হল না। একারণে ইটালীতে তাঁর ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা দুর্বল ছিল।

ইটালীতে

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মেটারনিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে সমস্ত গণ-আন্দোলন দমন করা। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে অষ্ট্রিয়ায় তাঁর প্রবর্তিত স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা টিকে থাকবে না যদি না ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে না রাখা হয়। একারণে তিনি কনসার্টের মাধ্যমে ইউরোপে তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কংগ্রেসের যুগে যে সব বৈঠক বসেছিল প্রতিটিতে মেটারনিক ছিলেন প্রধান এবং মূল শক্তি। তিনি 'কনসার্ট অব্ ইউরোপ'কে আভ্যন্তরীণ গণ-আন্দোলন দমনে ও পূর্বতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যবহার করলেন। এদিক হতে ট্রপোর প্রটোকল ইউরোপীয় ক্ষেত্রে মেটারনিক ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মেটারনিক ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর খুঁটিনাটি দৈনন্দিন বিবরণ জানবার জন্য গুপ্তচর বাহিনী, দালাল প্রভৃতি নিয়োগ করতেন। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট তিনি আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ প্রস্তাব পাঠালেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে অষ্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশের ডাক চলাচল করবে। এই প্রস্তাব প্রায় সব রাষ্ট্রগুলিই গ্রহণ করে। ফলে বিভিন্ন দেশের সরকারী চিঠিপত্রাদি অষ্ট্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাবার সময় তিনি সেগুলি গোপনে পড়বার ব্যবস্থা করলেন এবং বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসকদের মনোভাব জানতে সক্ষম হন।

বিদেশী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে

মেটারনিক ব্যবস্থার পতন ঃ মেটারনিক ব্যবস্থা কিন্তু চিরস্থায়ী হল না। যে বিপ্লবকে তিনি চিরদিনের জন্য বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন তা ১৮৪৮-এ পুনরায় দেখা দিল এবং এই বিদ্রোহ তাঁর ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিল। তিনি নিজে অষ্ট্রিয়া হতে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচলেন। মেটারনিকের ব্যবস্থা যে চিরস্থায়ী হতে পারে না তা প্রথম হতেই বোঝা যায়। তিনি বিপ্লবকে ঘৃণা করতেন কিন্তু বিপ্লবের পেছনে বিপ্লবীদের যে সব দাবি ছিল সেগুলির প্রতি তিনি নজর দিতে চাননি। উদারনীতি ও জাতীয়তাবাদ যে বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি তা তিনি বুঝতে চাননি। একারণে তিনি দমননীতির সাহায্যে গণ-অভ্যুত্থান প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন; জনসাধারণের দাবিগুলির যথার্থতা সম্বন্ধে তিনি কোনদিনই জানতে চেষ্টা করেন নি। যুগের সাথে তাল রেখে চলবার চেষ্টা তিনি করেন নি। তিনি চেষ্টা করেছিলেন পুরানো ঘুণে-ধরা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার, যা সাময়িকভাবে সম্ভব হলেও স্থায়ী হতে কখনই পারে না। সংক্ষেপে, তিনি তাঁর ব্যবস্থার দ্বারা মানবসমাজের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে চাইলেন, যেটি করা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। একারণেই তাঁর ব্যবস্থা তাসের ঘরের ন্যায় ভেঙে পড়ল। যে অষ্ট্রিয়াতে তিনি বিপ্লবী মতবাদের অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করেছিলেন সেই অষ্ট্রিয়াতেই গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের স্রোত তাঁকে ও তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থাকে ভাসিয়ে দিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লব

জুলাই বিপ্লব

১৮৩০-এর জুলাই মাসে চরম স্বৈরাচারী ফরাসী সম্রাট দশম চার্লসের প্রতিক্রিয়াশীল জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ফ্রান্সে যে সার্থক বিদ্রোহ ঘটেছিল তা সমসাময়িক যুগের এক যুগান্তকারী ঘটনা। উদারনীতি ও রক্ষণশীলতার আপসহীন সংগ্রামের ইতিহাসে সংগ্রামী ফরাসী জনসাধারণের অবদান অবিস্মরণীয়। মেটারনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসেবে জুলাই বিপ্লব ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

ভিয়েনা সম্মেলন (১৮১৫) ন্যায্য অধিকার নীতি গ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলন ফরাসী বিপ্লবের অন্ধকার দিকটা দেখেছিল। এর ফলে ভিয়েনায় উপস্থিত রাষ্ট্রনায়কগণ বিপ্লব-পূর্ব অবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করতে চাইলেন। ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ রাজবংশ পুনরায় অধিষ্ঠিত হল।

বিপ্লবের কারণ ঃ অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করে উদারনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। তিনি একটি শাসনতান্ত্রিক সনদ জারি করেন এবং ঐ সনদ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতে চাইলেন। এর ফলে একটি প্রতিনিধি সভা গঠিত হল এবং জনসাধারণকে ধর্ম ও বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হল। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশীদিন টিকল না। রক্ষণশীল দল এর বিরোধিতা করতে থাকল। রক্ষণশীল দলের অধিকাংশই ছিল বিপ্লবপূর্ব যুগের অভিজাত সম্প্রদায়। তারাই বিপ্লবের ফলে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তারা জনসাধারণের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করল। এই দলের নেতা ছিলেন অষ্টাদশ লুই-এর ভ্রাতা চার্লস। এই সময় ফরাসী সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ডিউক ডি বেরিকে হত্যা করা হয়। রক্ষণশীল দল উদারপন্থী দলকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করল। এর ফলে ফ্রান্সে প্রতিক্রিয়াশীল দল শক্তিলাভ করে। ১৮২৪ খৃঃ-এ অষ্টাদশ লুই-এর মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর ভ্রাতা যিনি রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন দশম চার্লস-রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। প্রাক্‌বিপ্লব যুগের ফ্রান্সকে তিনি ভুলতে পারলেন

উদারনীতিবাদ

স্বৈরতন্ত্র

না। অভিজাতদের ও চার্চের যে সকল অস্বাভাবিক অধিকারগুলি ছিল তা পুনরায় বলবৎ করতে চাইলেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ তাঁর শাসনে বিরক্ত হল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দশম চার্লস বহুনিন্দিত জনসাধারণের চক্ষুশূল পলিগন্যাক-কে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করলেন। জাতীয় সভা প্রধান মন্ত্রীর কার্যকলাপের সমালোচনা করল এবং তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করল। রাজা চার্লস জাতীয় সভা ভেঙে দিলেন। নবনির্বাচিত সভাও যখন রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর সমালোচনা করল তখন এই সভাও ভেঙে দেওয়া হল। তাঁর পরামর্শে প্রধান মন্ত্রী পলিগন্যাক স্বৈরতন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে চারটি বিশেষ ঘোষণা বা অর্ডিনান্স জারী করলেন। (১) জাতীয় সভা ভেঙে দেওয়া হল, (২) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হল, (৩) ভোটদাতাদের সংখ্যা হ্রাস করা হল এবং সম্পত্তির ভিত্তিতে নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করা হল, (৪) নতুন ভোটার তালিকা অনুযায়ী নতুন জাতীয়সভা নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হল এবং এতে রাজার মনোনীত সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল।

উগ্রতর প্রতিক্রিয়া দশম চার্লস

এসব অর্ডিনান্স ঘোষণার ফলে চার্লসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ ফেটে পড়ল। থিয়ার্স-এর নেতৃত্বে সংবাদপত্রের সম্পাদকরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত থাকল না, চার্লস-এর এই সংবিধানবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে বিদ্রোহ করবার জন্য আহ্বান জানাল। সংবিধানপন্থী ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির চার্লসের এই স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির সমালোচনা করল। প্যারিসের জনসাধারণ 'মন্ত্রিসভা নিপাত যাক, সনদ দীর্ঘজীবী হক' ইত্যাদি ধ্বনি সহকারে প্যারিসের রাস্তাঘাট মুখরিত করল। সংক্ষেপে বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হল; ২৮শে জুলাই প্যারিসে বিদ্রোহ দেখা দিল।

চার্লস কর্তৃক ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের চার্টার অকার্যকরী করা এবং তাঁর চার্টার-বিরোধী কার্যই জুলাই বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ। প্যারিসের জনসাধারণের দাবিতেও চার্টারের কথা উল্লেখ ছিল, সাংবাদিকদের প্রতিবাদেও এটির উল্লেখ করা হয়েছিল। এবং যেহেতু চার্লস চার্টারের শর্তগুলি ভেঙেছেন সেহেতু চার্লসকে রাজা বলে মানতে জনসাধারণকে নিষেধ করা হয়।

জুলাই বিপ্লব তিনদিন স্থায়ী ছিল। এই বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করল প্রাক্তন সৈনিকরা, গুপ্ত সমিতির সদস্যরা, প্রজাতন্ত্রীগণ এবং ছাত্রদল ও শ্রমিকশ্রেণী। বিপ্লব প্রধানত প্যারিসেই সীমিত ছিল। চার্লসের সৈন্যবাহিনী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়তে রাজী না হওয়ায় চার্লসের পক্ষে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া অন্যপথ ছিল না।

পলায়ন করবার পূর্বে চার্লস অর্ডিন্যান্স গুলি প্রত্যাহার করে চার্টার অনুযায়ী রাজ্য শাসন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গৌরবময় তিন দিনের বিপ্লব ঘটে গিয়েছে।

জুলাই বিপ্লবের ফলাফল—ফ্রান্সে ঃ রাজতন্ত্রবিরোধী জনতা জুলাই বিপ্লবকে সফল করলেও পরিষদের সভ্যবৃন্দ ও প্যারিসের ক্ষমতাশালী সংখ্যালঘিষ্ঠরা প্রজা-তন্ত্রের বিরোধী ছিল। তাছাড়া ইউরোপীয় রাজতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা সহজ হত না। একারণে বুরবোঁ বংশের অন্যতম শাখা অর্লিয়েন্স বংশের লুই ফিলিপকে সিংহাসনে স্থাপন করা হল। লুই ফিলিপ রাজবংশীয় হলেও বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। লুই ফিলিপ অবশ্য জনসাধারণের অধিকার সমূহ স্বীকার করলেন এবং অষ্টাদশ লুই প্রদত্ত চার্টার অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসেবে দেশ শাসন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে জুলাই বিপ্লবের ফলাফল ফ্রান্সে বিশেষ দেখা যায় না। এক রাজবংশের পরিবর্তে আর এক রাজবংশ স্থাপিত হল। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে এই বিপ্লব যে ফ্রান্সে এক বিরাট পরিবর্তন এনেছিল তা বুঝতে পারা যায়।

প্রথমত, লুই ফিলিপ রাজা হলেন সত্য কিন্তু তিনি বিপ্লবের ফলে রাজা হলেন। একারণে তিনি যে রাজতন্ত্র স্থাপন করলেন তা পূর্বেকার বুরবোঁ রাজতন্ত্রের সমচরিত্রের ছিল না। তিনি হলেন নাগরিক রাজা (citizen king)। তাছাড়া, লুই ফিলিপ জনসাধারণের অধিকার মেনে নিলেন এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী রাজ্য শাসন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দ্বিতীয়ত, ভিয়েনা কংগ্রেস ও কনসার্ট অব ইউরোপে এতদিন যে জনসাধারণের স্বার্থ-বিরোধী নীতি মেনে চলেছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজন্যবর্গকে মানতে বাধ্য করেছিল জুলাই বিপ্লব সেই নীতির বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ রাজবংশের পতনে অর্লিয়েন্স বংশের প্রতিষ্ঠায় ভিয়েনা বৈঠকে গৃহীত বৈধাধিকারস্বত্বের (Legitimacy) নীতিকে চরম আঘাত হানল। লুই ফিলিপ জনসাধারণের ইচ্ছায় রাজা নির্বাচিত হন এবং স্বভাবতঃই জনসাধারণের সদিচ্ছার ওপর তাঁর ক্ষমতা নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং যে ভগবৎদত্ত রাজক্ষমতা বা Divine Right kingship, বুরবোঁ রাজবংশের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত সেই ভগবৎ দত্ত রাজক্ষমতার অবসান হল। তৃতীয়ত, যে অভিজাত ও যাজকদের ক্ষমতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা দশম চার্লস ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন, জুলাই বিপ্লবের ফলে এক দিকে

যেমন চার্লসের সে ব্রত ব্যর্থ হল অন্যদিকে অভিজাত ও যাজক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হল। কারণ জুলাই বিপ্লবের ফলে সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলি দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত হল। ফ্রান্স সামাজিক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে গেল। এদিক হতে দেখলে ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব ১৭৮৯-এর বিপ্লবের পরিপূরক বলা যেতে পারে।

ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যে জুলাই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া ঃ ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের ঢেউ ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে যথাসময়ে পৌছালো। এই বিপ্লবের ফলাফলে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দেশপ্রেমিকরা আবার জাতীয়তাবাদ ও স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আন্দোলন শুরু করল। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল যে সব রাজশক্তি পনের বছর ধরে বিপ্লবের স্রোত নিরুদ্ধ করে রেখেছিল, এখন আবার হঠাৎ তার প্রবাহে তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

বেলজিয়মের স্বাধীনতা ঃ ফ্রান্সে 'জুলাই বিপ্লবের' পরেই অক্টোবর মাসে বেলজিয়মে বিপ্লবের সূচনা হল। ভিয়েনা সম্মেলন এই দেশটাকে হল্যাণ্ডের সহিত মিলিত করে দিয়েছিল; কিন্তু এই দুটি দেশের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। এজন্যই হল্যাণ্ডবাসী ডাচ্ বা ওলন্দাজদের শাসনপদ্ধতি বেলজিয়মবাসীদের অসহ্য হয়ে উঠেছিল। হল্যাণ্ড বেলজিয়মের উপর ডাচ্ আইন জারি করে ডাচ্ ভাষাকেই সরকারী ভাষা রূপে প্রবর্তিত করে, এবং সেনাদলে, রাজকার্যে ও শিক্ষাকেন্দ্রে ডাচ্‌দের অধিকার স্থাপন করে বলে দেশভক্ত বেলজিয়মবাসীদিগকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। তারা হল্যাণ্ডের অধিকার হতে মুক্তিলাভ করবার জন্য বিদ্রোহী হল। ফ্রান্স এটা সমর্থন করল; ইংল্যাণ্ডও এই ক্ষুদ্র দেশের দুর্ভোগ দূর করতে চাইল; রাশিয়া অষ্ট্রিয়া বা প্রাশিয়াও এতে বাধা দিতে আসল না। অবশেষে লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সিদ্ধান্তে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল।

বেলজিয়ম

রাশিয়ার শাসনাধীন পোল্যাণ্ডের অধিবাসী পোলগণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হতে বিদ্রোহের সূচনা করল; কিন্তু তারা বেলজিয়মবাসীদের মতো কৃতকার্য হতে পারল না। দূরবর্তী ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাদের কোন সাহায্য করল না; প্রাশিয়া বা অষ্ট্রিয়াও তাদের দিকে দৃষ্টি দিল না। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস (পূর্বতন জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের ভ্রাতা) কঠোর হস্তে তাদের দমন করে তাদের স্বাধীনতার আশা দূর করে দিলেন। ইটালীতেও জাতীয়তামূলক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু তা তেমন কার্যকরী

পোল্যাণ্ড

হয়নি। ইটালীর অন্তর্গত পোপের অধিকৃত স্থানগুলির অধিবাসীরা পোপের বিরুদ্ধে এবং পার্মা ও মোডেনার জনগণ হ্যাপস্‌বার্গ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু মেটারনিক সম্পূর্ণরূপে তাদের দমন করে দিয়েছিলেন। জার্মানীর স্যাক্সোনি, হ্যানোভার প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নানা দাবিদাওয়ার জন্য ভীষণ আন্দোলন করে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখালে রাজন্যবর্গের অনুমোদনে তারা অনেক সুযোগ-সুবিধা পেল। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ায় অবশ্য বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে গণ-অভ্যুত্থানে মেটারনিক ভীত হলেন। তিনি জার্মান কনফেডারেশনের অধিবেশন ডাকলেন এবং ফেডারেল ডায়েটকে বিপ্লব-বিরোধী আইন পাস করতে বাধ্য করলেন। যে সব রাজ্যের রাজারা জনসাধারণের চাপে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা এই সুযোগে নতুন শাসনতন্ত্র বাতিল করে পুনরায় স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রবর্তন করলেন। জুলাই বিপ্লবের সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্পেন ও পর্তুগালের জনসাধারণ আংশিকভাবে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা আদায় করল। অবশ্য এর পিছনে কেবলমাত্র জুলাই বিপ্লবের প্রভাব ছিল না, স্পেনে সুদীর্ঘকাল ধরে উত্তরাধিকারমূলক গোলযোগ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল অবস্থাও এই পরিবর্তনের জন্য কিছুটা দায়ী ছিল। সুইজারল্যাণ্ডেও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তিত হয়। সুইস্ যৌথরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ক্যাণ্টনের শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্রের নাম-গন্ধ ছিল না। জুলাই বিপ্লবে উৎসাহিত হয়ে এই সব ক্যাণ্টনের জনসাধারণ আন্দোলন শুরু করে। ফলে ক্যাণ্টনগুলির শাসনকর্তৃপক্ষগণ জনসাধারণের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

ইটালী

জার্মানী

স্পেন ও পর্তুগালে

জুলাই বিপ্লবের প্রতিধ্বনি ইংল্যাণ্ডেও শোনা গেল। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল শাসন কর্তৃপক্ষ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিকে আর অগ্রাহ্য করতে পারল না। ফলে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভাই প্রথম সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ করতে বাধ্য হল।

জুলাই বিপ্লবের তাৎপর্য ঃ কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে জুলাই বিপ্লব কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছিল। এই বিপ্লব কেবলমাত্র বিপ্লবী চেতনাকে উদ্দীপিত করেছিল, আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত হয়নি। একমাত্র বেলজিয়ম ছাড়া অন্য কোন দেশে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান সাফল্যলাভ করেনি এবং সেকারণেই গণসার্বভৌমত্ব অধিকাংশ দেশেই স্বীকৃত হল না। একারণে ভিক্টর হুগো এই বিপ্লবকে মাঝপথে থমকে যাওয়া বিপ্লব বলছেন। এমন কি ফ্রান্সেও জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিলাভ করেনি।

তবে এটা ঠিকই জুলাই বিপ্লব একেবারে ব্যর্থ হয়নি। বেলজিয়মের স্বাধীনতা মেনে নেওয়ার ফলে ভিয়েনা সম্মেলনে পুনর্গঠিত ইউরোপের কাঠামোতে ফাটল ধরল। যদিও পোল্যাণ্ড, ইটালী ও জার্মানীতে বিদ্রোহ ফলপ্রসূ হয়নি তবুও একথা সর্বৈব সত্য যে জুলাই বিপ্লব ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের জনসাধারণের মনে এক নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করল এবং ভবিষ্যতের জন্য বিপ্লবী ভাবধারার কীর্তিসমূহ—সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও শাসনতান্ত্রিক অধিকারের নীতিগুলি নিরাপদ ভিত্তিতে স্থাপিত হল। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ যে একেবারে ধ্বংস করা যায় না জুলাই বিপ্লব তাই প্রমাণ করে। এ দুটি শক্তি সাময়িকভাবে ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি দ্বারা কোণঠাসা হয়েছিল মাত্র এবং যখনই সুযোগ এল পুনরায় আত্মপ্রকাশ করল। সুতরাং জুলাই বিপ্লবের মধ্যেই পরবর্তীকালে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বৃহত্তর বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল।

১৯৪৮-এর বিপ্লব—বিপ্লবের বছর

পটভূমিকা : ১৮৪৮-এর ১২ই জানুয়ারী সিসিলির রাজধানী পার্লামোর জনতা রাজপথে জমায়েত হয়ে অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় ফার্ডিন্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এর পর একমাসের মধ্যেই ইটালীর বিভিন্ন শহরে এরূপ বিদ্রোহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। ১৮৪৮-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী ফ্রান্সের আইন সভার নিম্নকক্ষে রক্ষণশীল গিজো মন্ত্রিসভার সমর্থনকারীদের সংখ্যা খুবই কমে গেল এবং বিরোধী দলগুলি ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সংস্কার ভোজসভা আন্দোলন শুরু করবে বলে ঘোষণা করল। লুই ফিলিপের সরকার ভীত হয়ে যখন এই সংস্কার ভোজসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল তখন প্যারিসের জনসাধারণ বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করল। এই দুটি ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা দুটি দুধরনের গণ-অভ্যুত্থানের বা বিপ্লবের ইঙ্গিত দেয়, যার ফলে কয়েক মাসের মধ্যে কম করেও ইউরোপের প্রায় পনেরটি রাষ্ট্রের জনসাধারণ বিপ্লবের পথ বেছে নেয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ১৮৪৮-৪৯ ইটালী, জার্মানী ও হাঙ্গেরীতে যে সব বিদ্রোহ ঘটেছিল সেগুলি **পার্লামো অভ্যুত্থানের** পথকে অনুসরণ করেছিল—বিদেশী শাসনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী জনপ্রিয় অভ্যুত্থান। সাধারণতঃ এগুলি কুখ্যাত মেটারনিক ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দমননীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। আর সুইজারল্যাণ্ড, গ্রেটবৃটেন ও বেলজিয়ামের গণ-আন্দোলনগুলি ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিসের

বিপ্লবের পর্যায়ক্রম

জনসাধারণ লুই ফিলিপের শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করে তার অনুকরণে ঘটেছিল। এই অভ্যুত্থানগুলিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বলা যেতে পারে। এই গণ-আন্দোলনগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করল। সুতরাং ১৮৪৮-৪৯ এর বিপ্লবগুলির মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অবশ্য পার্থক্য থাকলেও এদুটির মধ্যে মিলও প্রচুর ছিল এবং এদুটি একজোটে ইউরোপে এক মহাপ্লাবন সৃষ্টি করল, যে প্লাবনের মুখে মেটারনিক ব্যবস্থা ভেসে চলে গেল এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশ হতেই সামন্ত প্রথা লোপ পেল।

বিপ্লবের কারণঃ (ক) ফ্রান্সে এই সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়েছিল। ন্যায্য অধিকারবাদীগণ, ক্যাথলিকগণ, প্রজাতান্ত্রিকগণ, সমাজতান্ত্রিকগণ, বোনাপার্টির সমর্থকগণ, কেউই ফিলিপের শাসনে সন্তুষ্ট ছিল না। এক একটি দল বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে লুই-এর রাজত্বের প্রতি ঘৃণার মনোভাব ব্যক্ত করল। যেমন ন্যায্য অধিকারবাদীগণ ফিলিপের রাজতন্ত্রকে অবৈধ বলে বিশ্বাস করত তেমনই বোনাপার্টিদল তাঁর বৈদেশিক নীতিকে পঙ্গু, দুর্বল ও দেশের পক্ষে অমর্যাদাকর বলে মনে করত। সেরূপ সমাজ-তান্ত্রিকগণ ফিলিপের আভ্যন্তরীণ নীতিকে বুর্জোয়া-ঘেঁষা বলে এর বিনাশ চাইল। ফিলিপ ও তাঁর মন্ত্রিদের পক্ষে এতগুলি দল ও উপদলকে সন্তুষ্ট করা সাধ্যাতীত ছিল।

লুই ফিলিপের বিরোধীদল

লুই ফিলিপ উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থনে দেশ শাসন করছিলেন। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রথা তখন ছিল না। ভোটদানের অধিকার ছিল কেবলমাত্র সম্পদ-শালীদের। লুই ফিলিপের সরকার উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত। সমগ্র ফ্রান্সে মাত্র দুলক্ষ ভোটার ছিল। এই মুষ্টিমেয় ভোটারদের সরকারের পক্ষে হাত করা বিশেষ কষ্টকর ছিল না। ফলে সরকারের মনঃপূত লোকরাই আইন সভায় নির্বাচিত হত। এদের আবার নানারূপ দুর্নীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে সরকারের বশে রাখা হত। সদস্যরাও জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করে দেখত। ফলে আইন সভায় সরকার পক্ষ সর্বদাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করত। একারণে আইনতঃ জুলাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করবার উপায় ছিল না। কিন্তু পরিশেষে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনগণ লুই ফিলিপের শাসনকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করল এবং পুনরায় বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিল।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাধান্য

লুই ফিলিপ জোরদার পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেননি। পররাষ্ট্রনীতিতে তিনি শান্তিবাদী ছিলেন। এই নীতির ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হতে পারে, কিন্তু

গণমানসে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে না। ফ্রান্সের জনসাধারণ যখন বলিষ্ঠ ও গৌরবময় পররাষ্ট্র নীতি আশা করছিল তার বদলে পেল দুর্বল, পঙ্গু ও অমর্যাদাকর পররাষ্ট্রনীতি। ফ্রান্স এই সময় কূটনীতিতে ইংল্যাণ্ডের নিকট বারবার পরাজিত হয়। ফিলিপের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করল।

বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা

ফ্রান্সে শিল্পায়নের ফলে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল। এর ফলে দেশে গুরুতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক পরিবর্তন যে একান্ত দরকার তা লুই ফিলিপের সরকার মনে করলেন না। শিল্পায়নের ফলে দেশের পুঁজিপতিরা লাভবান হল, শ্রমিক শ্রেণীর দুঃখকষ্ট আরও বৃদ্ধি পেল। পুঁজিপতিরা মুনাফা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে বেশি করে শোষণ শুরু করে। লুই ফিলিপের সরকার শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের দিকে কোন নজর দিল না, বরঞ্চ নানারূপ দমনমূলক আইনের দ্বারা তাদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হল। এর ফলে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সরকার-বিরোধী মনোভাব তীব্র হল।

শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ

লুই ফিলিপের সরকার কোনরূপ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল না। এ ব্যাপারে সরকারের স্থাণুনীতি জনসাধারণের নিকট অসহ্য হয়ে উঠল। সরকার-বিরোধী দলগুলি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য বারবার আবেদন জানিয়ে ভগ্নমনোরথ হয়। বিরোধীদলগুলি অবশ্য শাসন ব্যাপারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন চায়নি। তারা আইন সভার গঠন ব্যবস্থার পরিবর্তন, ভোটারের সংখ্যাবৃদ্ধি, ভোট দেবার আর্থিক যোগ্যতার সীমা কমানো প্রভৃতি চেয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী গিজো এগুলি সরাসরি অগ্রাহ্য করে দেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে চালু ব্যবস্থাই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। আইন সভায় সরকারী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলে বিরোধীদল কিছুই করতে পারল না। পরিশেষে তারা বিপ্লবের পথ বেছে নিতে বাধ্য হল।

বিভিন্ন দল জনসাধারণকে বিদ্রোহে যোগদান করতে আহ্বান জানাল। ফ্রান্স যেন এই সময় আগ্নেয়গিরির ওপর নিদ্রা যাচ্ছিল। অগ্ন্যুৎপাত দেখা দিল ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন এক বিরাট জনসভা বে-আইনী বলে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হল। রাস্তায় রাস্তায় অবরোধ প্রথা সৃষ্টি করা হল। প্যারিস নগরী আবার বিপ্লবের বাণীতে মুখরিত হল। লুই ফিলিপ উপায়ান্তর না দেখে পলায়ন করলেন। ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এটিকে **দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র** বলে।

ভোটের অধিকার নিয়ে বিবাদ ও বিপ্লব

ফলাফলঃ বিপ্লবের আশু সাফল্য ফ্রান্সে বিশেষভাবে দেখা গেল। ফ্রান্সে লা-মার্টিনের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিকদের যুক্ত অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হল। সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের নীতি নেওয়া হল। জাতীয় রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেবার সকলের অধিকার আছে বলে ঘোষণা করা হল। কাজ পাবার অধিকার মেনে নেওয়া হল। সরকারী তত্ত্বাবধানে জাতীয় কলকারখানা স্থাপিত হল। এই ভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন যুগ এল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য লোপ পেল। জনসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হল। শ্রমিক শ্রেণীর সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হল। সুতরাং ১৮৪৮-এর বিপ্লবকে রফা হিসেবে গণ্য করা যায় না। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করা হয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করবার চেষ্টা চলে। এবং ভিয়েনা সম্মেলনের প্রতিক্রিয়াশীল কাঠামো ভেঙে পড়ে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়াঃ ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারী বিপ্লব কেবল মাত্র ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র ইউরোপ এক প্রবল আলোড়নে আলোড়িত হল। ইউরোপের পনেরটি রাজ্যে বিপ্লব তরঙ্গ গিয়ে পৌছাল এবং ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিপ্লবী বছরের সৃষ্টি করল। এই বিপ্লব যেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইঙ্গিত জানাল। জার্মানীর বিভিন্ন রাষ্ট্র, প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, ইতালী প্রমুখ ইউরোপের ১৫টি রাষ্ট্রে এই বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সর্বত্র স্বৈরাচারী সরকারের সাময়িকভাবে পরাজয় ঘটল।

অস্ট্রিয়ায়ঃ অষ্ট্রিয়ায় এই ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। ভিয়েনা, বোহেমিয়া, মিলান ও হাঙ্গেরীতে বিপ্লব প্রবল আকার ধারণ করে। মেটারনিক তাঁর রাজ্য (অষ্ট্রিয়া) হতে পালিয়ে যান। তাঁর পতনের সাথে সাথে তাঁর সৃষ্ট প্রাচীন অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থারও পতন হল। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট প্রগতিবাদীদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন এবং জনসাধারণকে একটি নতুন সংবিধান দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা এতে সন্তুষ্ট হল না। তারা একটি সংবিধান গঠনের দাবি জানাল। সম্রাট এটি মেনে নিলেন। সংবিধান পরিষদ নতুন সংবিধান রচনায় ব্যস্ত রইল। কিন্তু ইতিমধ্যে রক্ষণশীলরা পুনরায় ক্ষমতা হস্তগত করল। বৃদ্ধ সম্রাট ফার্ডিনাণ্ড পদত্যাগ করলেন। নতুন সম্রাট ফ্রান্সিস উদারনৈতিক সংস্কারগুলি প্রত্যাহার করে নিলেন। হাঙ্গেরীতে এই বিপ্লব **লুই কসুথের** নেতৃত্বে শুরু হল।

অষ্ট্রিয়াতে বিপ্লব

হাঙ্গেরীতে

হাঙ্গেরী স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং মার্চ মাসের আইনের দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যেও জাতিগত চেতনা দেখা দিল। ফলে জাতিতে জাতিতে বিভেদ শুরু হল। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া সম্রাট বিপ্লবের প্রথম আঘাত সহ্য করে প্রত্যাঘাত করবার মত ক্ষমতাবান হলেন। ইটালীতে বিদ্রোহ দমন করা হল। হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে ধ্বংস করা হল। হাঙ্গেরীর স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ লোপ করা হল।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা পেল

জার্মানীতে ঃ ১৮৪৮-এর ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ জার্মানীতে তরঙ্গ তুলল। প্রাশিয়ার রাজধানী বার্লিনে জনতার বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। রাজা চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন এবং সংবিধান তৈরী করার জন্য প্রতিনিধিসভা আহ্বান করেন। ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, উরটেমবার্গ, স্যাক্সনি প্রভৃতি রাজ্যেও প্রগতিবাদীদের চাপে রাজারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সম্মত হলেন। ঐক্যবদ্ধ জার্মানী প্রতিষ্ঠার কাজও এগিয়ে চলল, সমগ্র জার্মানীর ছয়শো প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কফোর্ট নামক স্থানে মিলিত হলেন। এই সাধারণ সভা ইতিহাসে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট নামে পরিচিত। ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট অবশ্য সফলতা অর্জন করতে পারেনি। সদস্যদের মধ্যে বহু বাদানুবাদের পর এই পার্লামেণ্ট এক শাসনতন্ত্র তৈরী করল। বংশগত রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়বার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই রাষ্ট্রের সম্রাট হবার জন্য প্রাশিয়ার রাজাকে আহ্বান জানান হল। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজা অষ্ট্রিয়ার ভয়ে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। ফলে ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের কার্য বিফল হল। জার্মানীতে আবার পুরানো ব্যবস্থা ফিরে এল।

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট

অন্যান্য রাজ্যে ঃ ইংল্যাণ্ড, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও বলকান অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

ইটালীতে ঃ ইটালীর পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া, নেপলস্, রোম প্রভৃতি অঞ্চলে বিপ্লব দেখা দিল। শাসকরা গণতান্ত্রিক সংবিধান মঞ্জুর করতে বাধ্য হলেন। তিন মাসের মধ্যেই অষ্ট্রিয়াধীন ভেনিস ও লম্বার্ডি ভিন্ন ইটালীর প্রায় সমগ্র অঞ্চলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। এরপর ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হল। মেটারনিকের পতনের সংবাদ ইটালীতে পৌঁছানো মাত্র মিলান এবং ভেনিসে বিদ্রোহ শুরু হল। মডেনা ও পার্মার শাসকরা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। অষ্ট্রিয়ার সৈন্য দল মিলান ত্যাগ

বিপ্লবের সাময়িক সাফল্য ও ব্যর্থতা

করল। ভেনিসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। পিডমন্টের রাজা চার্লস্ আলবার্ট অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এই জাতীয় সংগ্রামের নেতা হলেন এবং অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই যুদ্ধ বিফলতায় পর্যবসিত হয়। কাস্টোজার যুদ্ধে চার্লস্ আলবার্ট অস্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাজিত হন। কাস্টোজার যুদ্ধ কিন্তু ইটালীতে বিপ্লব-এর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করল না। ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি পোপকে বিতাড়িত করে রোমে একটি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। কিন্তু ফ্রান্সের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট লুই নেপোলিয়ন এক ফরাসী-বাহিনী প্রেরণ করলেন পোপকে স্বীয় অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্সের এই সৈন্যবাহিনী রোমের প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করল। একে একে ইটালীর সর্বত্রই বিপ্লব দমিত হল। অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল তবে এটা ঠিক যে ১৮৪ -৪৯-এর জাতীয় সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও ইটালীকে ভবিষ্যৎ চলার পথের কিছুটা সন্ধান দিয়েছিল।

ব্যর্থতার কারণ

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র বিদ্রোহের বহ্নি ব্যাপ্ত হয়েছিল। উৎপীড়িত জনসাধারণ স্বেচ্ছাচারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করল। কিন্তু পরিশেষে সকল স্থানেই বিদ্রোহীদের পরাজয় হল। তবুও এটি স্বীকার্য যে ১৮৪৮-এর বিপ্লব ইউরোপের গণতান্ত্রিক ও জাতীয় আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দকে বিপ্লবের বৎসর বলা হয়। ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিপ্লব দেখা যায়। কিন্তু সর্বত্রই পরিচালনায় ত্রুটি ছিল বলে বিপ্লব ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পিছনে অনেক কারণ ছিল। প্রধান কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সৈন্যদল বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয় নি। যে বিপ্লব সৈন্যদলের সাহায্য পেয়েছিল সে বিপ্লব কখনই ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু ১৮৪৮-এর বিপ্লব এটি পায় নি। এছাড়া বিপ্লবীদের মধ্যে উদ্দেশ্যের অসমতা, তাদের প্রচেষ্টায় সমন্বয়ের অভাব ছিল। উপযুক্ত নেতা বিপ্লবীদের মধ্যে ছিল না।

এই বিপ্লবের তাৎপর্য ঃ তবে একথা বলা যায় যে এই বিপ্লব একেবারে ব্যর্থ হয়নি। এটিকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের মহড়া বলা যেতে পারে। ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংবিধান ও সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ায় পুরনো শাসন ব্যবস্থায় ভাঙন ধরল এবং স্বৈরতন্ত্রের সেই জৌলুস আর ফিরে এল না। এটি ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকল। মেটারনিক ব্যবস্থার পতন ঘটল। ভূমিদাসত্ব প্রথার অবসান ঘটল। প্রজাতন্ত্রী আদর্শ জোরদার হল এবং সমাজতন্ত্রীরা নিজ মতবাদ প্রকাশ করবার সুযোগ পেল। তাছাড়া, ১৮৪৮-এর বিপ্লব মেহনতী জনতার জয়যাত্রার শুভসূচনা করল। জনতাই বিপ্লবকে জয়যুক্ত করেছিল। এর ফলে ভবিষ্যতে প্রত্যেক দেশের সরকার বিশ্বাস করল যে জনতাই রাজনীতির বাহক ও ধারক। অতএব জনতাকে হাত করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল এবং সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের জন্য আওয়াজ তোলা হল।

সপ্তম অধ্যায়

দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র ঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন ও দ্বিতীয় সাম্রাজ্য

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্র বিপ্লবে রাজা লুই ফিলিপ সিংহাসনচ্যুত হয়ে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কবি লার্মাটিন সাথে সাথে চেম্বার অব ডেপুটিজ-এ ফ্রান্সের অস্থায়ী সরকারের নাম ঘোষণা করলেন। পরিষদের কয়েকজন উদারনৈতিক সদস্যদের নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা এই সরকারকে মানতে চাইল না। অস্থায়ী সরকার সমাজতন্ত্রীদের হাত করবার জন্য চেষ্টা করল। বহু আলোচনার পর সাধারণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে একটা রফা হল। এতে ঠিক হল যে অস্থায়ী সরকার ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে ইচ্ছুক, অবশ্য এ সম্বন্ধে যথাসময়ে জনসাধারণের মতামত নেওয়া হবে। উদারনৈতিকরা সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিল। উগ্র গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা সর্বজনীন ভোটাধিকার দাবি করল এবং এমন প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করতে চাইল যে সরকার ফ্রান্সে সামাজিক ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তন করবে।

অস্থায়ী সরকারের কার্যাবলী ঃ অস্থায়ী সরকার শ্রমিক শ্রেণীর নিকট জনপ্রিয় হবার জন্য তাড়াতাড়ি কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করল। প্যারিস শহরে শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হল। প্রদেশসমূহেও এই নীতি বলবৎ করা হল। বিপ্লবের মূলমন্ত্র 'Right to work' সরকার মেনে নিল। এবং প্যারিসে বেকার লোকের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে জাতীয় কর্মশালা (National workshop) খোলা হল। এগুলিতে শ্রমিকদের কোন কাজের ব্যবস্থা ছিল না, সরকার হতে খুব অল্প বেকার ভাতা দেওয়া হতে থাকল। মনে হয় সমাজতন্ত্রী দলকে লোকচক্ষে হেয় করবার জন্যই এরূপ করা হয়েছিল। অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করল যে এপ্রিল মাসে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাচনের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া ঃ সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীলদের সুবিধা হল। কৃষককুল ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে চিন্তিত হয়ে পড়ল। জাতীয় কর্মশালার সংবাদ তারা ইতিমধ্যেই পেয়েছিল। তারা মনে করল সমাজতন্ত্রীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেলে জমির ওপর মালিকানা স্বত্ব ও

তুলে দেবে। একারণে এই নির্বাচনের ফলাফল পূর্ব হতেই ঠিক হয়ে গেল। এই নির্বাচন শেষে দেখা গেল শতকরা ৮৪ জন ভোট দিয়েছিল এবং এদের মধ্যে অধিকাংশই ভোট দিয়েছিল বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। ফলে সংবিধান সভায় ৮৭৬টি আসনের মধ্যে সমাজতন্ত্রীরা মাত্র ১০০টি আসনে জয়ী হয়। সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাজতন্ত্রী বা উদারনৈতিক দলভুক্ত বা প্রজাতন্ত্রী। মে মাসে এই সংবিধান সভার অধিবেশন বসলে অস্থায়ী সরকার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা এই সভার নিকট হস্তান্তরিত করে দেয়। সংবিধান সভা দেশের শাসনকার্য চালিয়ে যাবার জন্য একটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করল। এই কাউন্সিল হতে সমাজতন্ত্রীদের বাদ দেওয়া হল। ফলে বামপন্থীরা বল প্রয়োগ করে ক্ষমতা হস্তগত করবার চেষ্টা করল। মে মাসের ১৫ তারিখে এক বিরাট বামপন্থী সশস্ত্র জনতা সংবিধান সভা আক্রমণ করে দখল করে নেয় এবং এই সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। হোটেল ডি ভিলিতে ব্লাঙ্কী, বারবেন প্রমুখ উগ্র বামপন্থী নেতারা এক আপতকালীন প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার স্থাপন করলেন। এটিকে ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিপ্লব বলা যায়। প্যারিসের জনতা এই বিপ্লবের দ্বারা ফ্রান্সের অন্যান্য অঞ্চলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে চাইল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হল।

নতুন সংবিধান—দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ: এদিকে শাসনতন্ত্রের রচনা সম্পূর্ণ হল। এই শাসনতন্ত্রে 'কাজ পাবার অধিকার' স্বীকার করা হল না। তাছাড়া, দেশের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হাতে দেওয়া হল যিনি চারবছরের জন্য জনসাধারণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে ঠিক হল। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এক-কক্ষ-বিশিষ্ট আইন সভা গঠিত হবে বলে বলা হল। ৭৫০টি আসন-বিশিষ্ট এই আইন সভার নির্বাচন প্রতি তিন বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতির কার্যকাল চার বছর করা হয় এবং একবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবে না বলে উল্লেখ করা হয়। রাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হল। সামরিক বেসামরিক বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, আইনের খসড়া রচনা প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির কর্ম পরিসরের মধ্যে আনা হল। এর ফলে সামরিক একনায়কতন্ত্রের পথ সুগম হল।

রাষ্ট্রপতির পদে লুই নেপোলিয়ন: ১৮৪৮-এর শেষের দিকে নতুন শাসনতন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলে দেখা গেল যে নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর 'নেপোলিয়ন' নামটাই তাঁকে নির্বাচনে জয়ী করে। পারিবারিক ঐতিহ্যের অধিকারী লুই নেপোলিয়নকে

জনসাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতীক বলে মনে করল এবং এর জন্যই তারা তাঁকে বিপুল ভোটাধিক্যে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করল। লুই নেপোলিয়ন সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিলেন এবং ঘোষণা করলেন 'যারা এই চালু শাসনতন্ত্র বদলাতে চেষ্টা করবে তাদের তিনি দেশের ও জাতির শত্রু বলে মনে করবেন।'

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পথে: লুই নেপোলিয়ন খুবই দূরাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তার সামনে একমাত্র আদর্শ ছিল জ্যেষ্ঠতাত নেপোলিয়ানের জীবনী। তিনি চালু শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেখালেও মনে প্রাণে ওটি গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন যে ফ্রান্সের অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রজাতন্ত্র চায় না। এবং প্রজাতন্ত্রের দুর্বলতা তিনি সহজেই ধরে ফেললেন। ১৮৪৯-এর সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ফরাসীরা বর্তমান শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। নতুন আইন সভায় রাজতন্ত্রীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। নেপোলিয়ন খুব সর্তকভাবে নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে বসবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন এবং নিজেই সেই সুযোগ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলেন। প্রথমত, তিনি সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদগুলিতে নিজের সমর্থকদের নিযুক্ত করলেন। দ্বিতীয়ত জনসংযোগের জন্য সমগ্র দেশ ভ্রমণ করলেন এবং জনসাধারণকে তাঁর আদর্শ ও নীতি সম্বন্ধে অবহিত করলেন। তৃতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ রোমান ক্যাথালিকদের সন্তুষ্ট করবার জন্য রোমে পোপের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটি ফরাসী সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন এবং রোমে ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডি প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদে দ্বিধা করলেন না। চতুর্থত, কয়েকটি আভ্যন্তরীণ ঘটনাকে কাজে লাগালেন। এদিকে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে আসায় তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। তাঁর পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী তিনি আর রাষ্ট্রপতি পদে থাকতে পারবেন না। প্রথমে তিনি আইন সভার সদস্যদের মতিগতি বুঝে নিলেন। যখন অনুমান করলেন যে তারা সংবিধানের পরিবর্তন করবে না তখন অনুগত সৈন্যদলের সাহায্যে আইন সভার অধিকাংশ সদস্যের বন্দী করলেন (২রা ডিসেম্বর, ১৮৫১) এবং জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করলেন যে প্রজাতন্ত্র ও জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করবার জন্যই তিনি এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। এটা প্রমাণ করবার জন্য তিনি সর্বজনীন ভোটাধিকার পুনরায় চালু করলেন। এরপর তিনি জনসাধারণকে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে থাকবার মেয়াদ দশবছর করতে বললেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ সেই সময় তাঁকে ফ্রান্সের

রক্ষাকর্তা বলে মনে করেছিল। এ কারণে তাঁকে দশ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করতে জনসাধারণ দ্বিধা করল না। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জন্য নতুন এক শাসনতন্ত্র চালু করলেন। এই শাসনতন্ত্রে লুই নেপোলিয়ন নিজের হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা করলেন। সংক্ষেপে ফ্রান্সে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার কার্যকরী সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হল। এর সাথে সাথে সমগ্র দেশে দমননীতি চালান হল এবং লুই নেপোলিয়নের বিরোধী পক্ষদের শক্তি চূর্ণ করে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, ফ্রান্সের জনসাধারণ সানন্দে এই নতুন শাসনতন্ত্র মেনে নিল। লুই নেপোলিয়ন এইবার প্রজাতন্ত্র রাজ্যটিকে সাম্রাজ্যে পরিণত করতে ইচ্ছুক হলেন। অবশেষে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রায় সর্বসম্মত ভোটের বলে লুই নেপোলিয়ন তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের উত্তরাধিকারী রূপে **তৃতীয় নেপোলিয়ন** নামে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

জীবনী ঃ লুই নেপোলিয়ন ছিলেন সম্রাট নেপোলিয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন নেপোলিয়ন তাঁর ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। লুই নেপোলিয়নের ভাগ্যে কিন্তু সুখভোগ বেশিদিন ছিল না। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর তিনি ও তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের জীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে এল। লুই নেপোলিয়নের কৈশোর ও যৌবন দুঃখকষ্টের মধ্যে কাটল। ১৮৩৬ এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে স্টাসবুর্গ ও বুলোনে লুই নেপোলিয়ন বিদ্রোহের দ্বারা ফরাসী সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৮৩৬-এর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর তিনি ফরাসী সরকারের হাতে ধরা পড়েন এবং আমেরিকায় তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হয়। সেখান হতে তিনি পুনরায় ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন এবং ৮৪০-এ ফ্রান্সে অবতরণ করেন। এবার ধৃত হয়ে তাঁর ছ বছরের জন্য জেল হয়। কিন্তু জেলখানা হতে তিনি ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। ইংল্যাণ্ডে তিনি স্পেশাল কনেস্টবলের চাকরি নেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হল তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করলেন। ফ্রান্সে নতুন উদ্দীপনায় ফিরে এলেন এবং জনসাধারণের সমর্থনে জাতীয় সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। এর পর তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে নয়া ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সের সম্রাট হলেন।

উদ্দেশ্য ও কর্মনীতি ঃ লুই নেপোলিয়ন নিজেকে তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। যৌবনে তিনি সম্রাট নেপোলিয়নের জীবনী ও কর্মকীর্তি সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে নিজে যে মূল্য নিরূপণ

বিধি প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সাথে তিনি যে বাণিজ্যিক চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন সেটি এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই হয়েছিল। এর ফলে ফ্রান্সের বণিক শ্রেণী ছাড়া অন্যান্যদের বিশেষ সুবিধা হয়।

সামাজিক সংস্কার: দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমত, তিনি দেশময় হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এসব হাসপাতালে গরীবদের যাতে বিনা খরচায় সুচিকিৎসা হয় সেদিকে নজর রাখলেন। এছাড়া আতুরাশ্রম স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হল। দরিদ্রদের সেবাকার্যের জন্য অসংখ্য সেবা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হল। গরীব জনসাধারণ যাতে বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনতে পারে তার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। দেশের বেকার সমস্যা কিভাবে দূর করা যায় সে সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করেন এবং সরকারের আনুকূল্যে কয়েকটি কারখানা গড়ে তোলা হয়।

শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ দূর করবার জন্য তৃতীয় নেপোলিয়ন বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। কারণ ১৮৪৮ এর পর যে সব অভ্যুত্থান ফ্রান্সে ঘটেছিল সেগুলি প্রধানত শ্রমিকদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাছাড়া, শ্রমিকশ্রেণীর উপর সমাজতন্ত্রী ও গোঁড়া বামপন্থীদের প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। একারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন শ্রমকল্যাণমূলক কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কারখানায় নিযুক্ত থাকাকালীন শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে শিল্প বীমা প্রবর্তন করেন। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও ন্যায্য কারণে ধর্মঘট করা আইনসংগত বলে ঘোষণা করলেন। এর ফলে শ্রমিকদের অসন্তোষ যেমন কিছুটা কমল অন্যদিকে তারা তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন মেনে নিল।

প্যারিস নগরীর উন্নয়ন: প্যারিস নগরীকে ইউরোপের সৌন্দর্য, রুচি, সংস্কৃতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের পীঠস্থান রূপে গড়ে তোলবার জন্য তিনি তৎপর হলেন। তাছাড়া, প্যারিসকে নতুনভাবে গড়ে তোলবার আর একটা কারণও ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নের পূর্বে যে তিনটি বিপ্লব ঘটেছিল তার সূচনা হয় প্যারিসে। তাছাড়া ১৮৩০ ও ১৮৪৮এর বিপ্লব দুটি মূলতঃ প্যারিসের জনসাধারণের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিসের ঘিঞ্জি বস্তী অঞ্চলের সরু গলিগুলিতে সরকারী পুলিশ বা রক্ষীদলের পক্ষে লড়াই করার নানা অসুবিধা ছিল। নেপোলিয়ন ভাবলেন এগুলি যদি অপসারণ করা যায় তাহলে

একদিকে যেমন প্যারিসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, অপর দিকে প্রশস্ত রাজপথ তৈরি করার ফলে ভবিষ্যৎ বিপ্লবীদের সরকারের রক্ষীদলের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ হবে না। সুতরাং প্যারিসকে সৌন্দর্যময়ী করবার অন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হল। প্রখ্যাত স্থপতি Baron Haussman-এর পরিচালনায় একাজ চলতে থাকল। অচিরেই প্যারিস ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। ফলে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনে ফ্রান্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির পরিচয় পেল।

দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৭০-৭১) ঃ এই পর্যায়ে তৃতীয় নেপোলিয়নের আভ্যন্তরীণ শাসন নীতির বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি এই সময়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের প্রবর্তন করেন। অবশ্য এর পিছনে কয়েকটি কারণও ছিল। প্রথমত এই সময় হতে তাঁর পররাষ্ট্র নীতিতে ব্যর্থতা দেখা দেয়। যে আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলিতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন সেগুলি ফ্রান্সের দিক হতে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আর পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতার সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দিল। রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়াসী হল। এদের বিরুদ্ধে দমনমূলক নীতি গ্রহণ না করে দেশে নেপোলিয়ন কিস্তিবন্দী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। অতএব তিনি যে কিছুটা উদারনৈতিক মতাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৮৬০ হতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যকে এক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত করেন।

বৈদেশিক নীতি ঃ তৃতীয় নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর রাজত্বের প্রথম আট বছরের বৈদেশিক নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মর্যাদা খুবই বৃদ্ধি করে। প্যারিস ইউরোপীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়, বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদীরা তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্যপ্রার্থী হয়। এই সময়ের মধ্যে ইউরোপে এমন কোন আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটেনি যার সাথে তৃতীয় নেপোলিয়নের যোগ ছিল না। আবার তাঁর অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতিই তাঁর পতনের অন্যতম কারণ হয়েছিল। যখন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থতার সম্মুখীন হলেন, তৎনই ফ্রান্সের অভ্যন্তরে তাঁর বিরোধী দলগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে সমর্থ হয়। ফলে তিনি তাঁর অভ্যন্তরীণ নীতিতে পরিবর্তন আনেন। আবার এই পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যর্থতার জন্য তাঁকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার

বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামতে হয় এবং তিনি পরাজিত হন। এর সাথে সাথে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তাঁরও জীবনে ঘন অন্ধকার নেমে আসে।

বৈদেশিক নীতিতে নেপোলিয়ন শান্তিপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেন—'The Empire is peace' কিন্তু তাঁর কার্যাবলী প্রমাণ করল তিনি শান্তিপূর্ণ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না! বরঞ্চ নিজের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা, নেপোলিয়নীয় গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এক শ্রেণীর জঙ্গীবাদী ফরাসীদের মনস্তুষ্টির জন্য বলিষ্ঠ পররাষ্ট্রনীতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে পড়েন।

স্বরূপ : তৃতীয় নেপোলিয়ন ভালভাবেই জানতেন যে লুই ফিলিপের পতনের অন্যতম কারণ তাঁর দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি। সে কারণে তৃতীয় নেপোলিয়ন চমকপ্রদ পররাষ্ট্রনীতি দ্বারা ফ্রান্সকে ইউরোপের রাজনীতিতে সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন এবং ফরাসী জনসাধারণকে এর দ্বারা তাঁর প্রতি অনুগত রাখলেন। তাঁর রাজত্বের প্রথম আট বৎসর তিনি পররাষ্ট্রনীতিতে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হতে তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে দেউলিয়া ভাব দেখা দেয়।

সাফল্যের যুগ : বৈদেশিকনীতির সাফল্যের যুগে তিনি বহু কৃতিত্ব অর্জন করেন। এমন কি যখন দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন ফরাসী সৈন্যের সাহায্যে পোপকে রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এর ফলে ফ্রান্সের ভেতরে ও বাইরের ক্যাথলিকদের ধন্যবাদার্হ হন।

দ্বিতীয়ত, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি ইংল্যাণ্ডের সাথে একজোটে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন কারণ তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠতাত স্বনামধন্য প্রথম নেপোলিয়নের পরিণাম স্মরণ করে রাশিয়ার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতেন। তাঁর ধারণা ছিল 'মস্কো অভিযানই' প্রথম নেপোলিয়নের পতনের প্রধান কারণ। এখন যদি তিনি রাশিয়ার শক্তি খর্ব করতে পারেন তবে একদিকে যেমন তাঁর জ্যেষ্ঠতাতের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া হবে অন্যদিকে ফ্রান্সের রোমান ক্যাথলিকরা উল্লসিত হবে এবং তাঁর শক্তি ফ্রান্সে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফরাসীসৈন্য বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। এই যুদ্ধান্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্র হিসেবে প্যারিস নগরীকে নির্বাচিত করা হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে ফ্রান্স পুনরায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। তৃতীয় নেপোলিয়ন ঘরে বাইরে বিরাট খ্যাতি অর্জন করলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজেকে জাতীয়তাবাদের সমর্থক বলে ঘোষণা করেন প্যারিসের সন্ধিতে যখন ওয়ালাসিয়া ও মোলডাভিয়ার ওপর

রুশ আধিপত্য দূর করা হয় সেই সময় তিনি এ দুটি প্রদেশকে নিয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। এবং তাঁর এই প্রস্তাবের ফলস্বরূপ এই দুটি প্রদেশ রুমানিয়া নাম নিয়ে তুরস্কের নামমাত্র প্রভাবাধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁর তৃতীয় কাজ হল ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে সাহায্য করা। তিনি প্লমবিয়ার্সে-কাভুরকে আহ্বান করলেন এবং তার সাথে এক অলিখিত চুক্তি করলেন। তিনি অস্ট্রো-সার্ডিনিয়ান যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামলেন। হঠাৎ ভিলাফ্রাঙ্কা নামক স্থানে যুদ্ধ বিরতিতে স্বাক্ষর করলেন। তাঁর এই কাজ ইটালীয়বাসীরা বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল বলে মনে করল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে তৃতীয় নেপোলিয়নের ইটালীয় নীতিতে কোন সামঞ্জস্য ছিল না।

ব্যর্থতার যুগ : এর পর তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে বিফলতার যুগ দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কার্যকালে সাহায্য পাঠান নি। এর ফলে একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদীরা অসন্তুষ্ট হল, অপর দিকে রাশিয়ার জার তাঁর রুশ বিরোধী আচরণ ভুলতে পারলেন না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি এর প্রতিশোধ নেন। সুতরাং পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর সুনাম নষ্ট হল। বৈদেশিক নীতিতে যখন তিনি ব্যর্থতার সম্মুখীন ঠিক সেই সময়েই তৃতীয় নেপোলিয়ন উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত মেক্সিকোতে এক ফরাসী তাঁবেদার রাষ্ট্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেছিলেন যে বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারলে জনসাধারণ তাঁর প্রতি আরও আনুগত্য দেখাবে এবং বৈদেশিক নীতিতে তাঁর ব্যর্থতার কথা ভুলে যাবে। একারণে তিনি সুদূর মেক্সিকোতে এক ফরাসী বাহিনী প্রেরণ করেন। মেক্সিকো সাধারণতন্ত্র এই বাহিনীর নিকট পরাজিত হলে তিনি একজন তাঁবেদারকে মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যখন বাধা দেয় তখন নেপোলিয়ন তাঁর সৈন্যদল অপসারণ করতে বাধ্য হন। ব্যর্থ মেক্সিকো-অভিযান নেপোলিয়নের তথা ফ্রান্সের মর্যাদা নষ্ট করে এবং তাঁর পতনের পথ সুগম করে দেয়। তিন বছর মেক্সিকো ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় তৃতীয় নেপোলিয়ন ইউরোপীয় রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব খাটাতে পারলেন না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের অষ্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে এবং এর পূর্বে অনুষ্ঠিত ডেনিস যুদ্ধে তাঁকে বাধ্য হয়ে নিরপেক্ষ থাকতে হয়। স্যাডোয়ার যুদ্ধে প্রাশিয়ার হাতে অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে

পরাজিত হল। এর ফলে ফ্রান্সের স্বার্থহানি হল। ফ্রান্সের সীমান্তে শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সের পক্ষে মারাত্মক হল। এস্থলে স্যাডোয়ায় অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসীরা নিজেদের পরাজয় বলে মনে করল এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের ওপর খুবই রুষ্ট হল। তাঁর প্রতি ফরাসী জনসাধারণের যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল। তৃতীয় নেপোলিয়ন এটি বুঝতে পেরে নিজের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জঙ্গীবাদী নীতি গ্রহণ করলেন। এবং এই নীতি অনুযায়ী তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমার্ককে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে, দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা যেন বিপন্ন না করা হয়। তিনি আরও দাবি করলেন যে প্রাশিয়া যেভাবে শক্তিবৃদ্ধি করছে তা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে কারণে ইউরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখবার জন্য ফ্রান্সেরও শক্তিবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন এবং এখন ফ্রান্সের 'ক্ষতিপূরণ' স্বরূপ কিছু পাওয়া উচিত। কিন্তু তিনি বিসমার্কের কূটনীতির নিকট পরাজিত হলেন। স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে প্রাশিয়ার সাথে ফ্রান্সের সম্পর্ক এতই তিক্ত হল যে দুটি রাষ্ট্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের কিনারায় দাঁড়িয়েই ক্ষান্ত হল না, যুদ্ধকেই চরম ও পরম বলে গ্রহণ করল। প্রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন কেবলমাত্র পরাজিতই হলেননা, তাঁকে ফ্রান্সের সিংহাসনও হারাতে হল।

তৃতীয় নেপোলিয়নের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা: তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্রে বিপরীতধর্মী দোষগুণের সমন্বয় দেখা যায়। কখনো তিনি গণতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেন, কখনো তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন।

যে ভাবে তিনি সাধারণ অবস্থা হতে সম্রাট পদে উন্নীত হন, তাতে তাঁর সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করে জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কেড়ে নিলেন। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন এবং তাঁর সময়ে ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব পুরোপুরিভাবে দেখা দেয়। তিনি ধনী-নির্ধন সকলকেই সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন। তিনি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করেন নি। ফলে তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়। কারণ অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে রাজনৈতিক অগ্রগতি জড়িত।

বৈদেশিক নীতিতে প্রথমে তিনি সফলতা অর্জন করলেও পরে সর্বাধিক বিফলতা দেখা দেয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহের ফলে তাঁর প্রতি রাশিয়া খুবই রাগান্বিত হল। ইটালীর ক্ষেত্রে তিনি দোদুল্যমান নীতি গ্রহণ করেন।

ফলে অষ্ট্রিয়া তাঁর প্রতি বিরূপ হল, অপরদিকে ইটালীর শ্রদ্ধা হারালেন। মেক্সিকো অভিযান তাঁর সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে।

তবু বিরাট ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইউরোপের ইতিহাসে তাঁর দান কম নয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন অশান্ত, পীড়িত ও বিশৃঙ্খল ফ্রান্সে শান্তি, নিরাপত্তা ও গৌরব আনয়ন করেন। তিনি এক চমকপ্রদ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে জনসাধারণের বিশ্বাস ও আনুগত্য অর্জন করেন। তাঁর অনেক দোষত্রুটি ছিল সন্দেহ নেই, তবুও তিনি যে অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন সেকথা যেন সকলের স্মরণ থাকে। তাঁর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিষ্পিষ্ট অধিবাসীদের প্রতি সহানুভূতি ও জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন সর্বকালেই প্রশংসা পাবে।

তৃতীয় নেপোলিয়ন এক সময় বলেছিলেন যে তাঁর পূর্ববর্তী দুটি রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটার কারণ হল এ দুটি রাজবংশ শ্রেণী-বিশেষের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিল ; জাতির সর্বসাধারণের উন্নতি কিসে হবে সে নিয়ে তারা চিন্তা করেনি এবং এর জন্যই তাদের পতন ঘটে। তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসনকালের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য তিনি যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাতে সকল শ্রেণীই উপকৃত হয়েছিল।

সমস্থায় পরিণত করলেন এবং অষ্ট্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করবার জন্য অষ্ট্রিয়া-বিরোধী শক্তি-সমন্বয় গড়তে চেষ্টা করলেন। এর জন্য প্রথমেই তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পত্র পত্রিকায় ইটালীর সমস্থা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখলেন।



কাভুর

ইতিমধ্যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হল। কাভুরের চেষ্টায় পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া এই যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষে যোগ দিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সার্ডিনিয়া বাহিনী বিশেষ কৃতিত্ব দেখাল এবং ইউরোপে সুখ্যাতি অর্জন করে। যুদ্ধশেষে কাভুর প্যারিসের শান্তি বৈঠকে (১৮৫৬) যোগ দেন এবং ইটালীর দুঃখ দুর্দশার কথা বৈঠকে উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের নিকট নিবেদন করেন। ফলে ইটালীর সমস্থা সম্বন্ধে সমবেত রাষ্ট্রনায়করা অবহিত হন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ইংল্যাণ্ডও ইটালীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। প্যারিস বৈঠক হতে কাভুর মহানন্দে দেশে ফিরলেন। এর পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কাভুর প্লমবিয়ার্স নামক স্থানে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন এবং বৈঠক শেষে নেপোলিয়নের সাথে **প্লমবিয়ার্সের গোপন চুক্তি** সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে স্থির হল যে ফ্রান্স ও পিডমণ্ট যুগ্মভাবে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। লম্বার্ডি ও ভেনেসিয়া অষ্ট্রিয়ার নিকট হতে কেড়ে নিয়ে পিডমণ্টের সাথে যুক্ত করা হবে। পার্মা, মডেনা, টাসকেনি নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করা হবে। রোম এবং পোপের রাজ্যের কোন পরিবর্তন করা হবে না। নেপলস যেমন ছিল তেমনি থাকবে। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে, পিডমণ্টের পক্ষে যুদ্ধে নামার জন্য ফ্রান্স স্যাভয় ও নীস পাবে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ

প্যারিস সম্মেলন

তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে চুক্তি

দেশে ফিরে কাভুর কেবল সুযোগ খুঁজতে লাগলেন এবং যে কোন ছুতোয় অষ্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ বাধাবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

ইটালীর ঐক্যসংগ্রামের প্রথম পর্যায়ঃ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই সুযোগ দেখা দিল। অষ্ট্রিয়া সার্ডিনিয়ার সৈন্যবাহিনীকে তিন দিনের মধ্যে ভেঙে দেবার দাবি জানালে এবং সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালে যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব কাভুর সানন্দে বলেছিলেন, "অক্ষ নিক্ষিপ্ত হয়েছে আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি।" এবং এর সাথে সাথেই অস্ট্রো-সার্ডিনিয়া যুদ্ধ শুরু হল এবং প্লমবিয়ার্সের চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স পিডমণ্টে সার্ডিনিয়ার পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করল। মিত্রপক্ষের সৈন্যদল মাজেণ্টা ও সলফেরিনোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সৈন্য-দলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করল। লম্বার্ডি ও মিলান মিত্রশক্তির হাতে এল। কেবল ভেনেসিয়া হতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করতে পারলেই ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার অধিকার একেবারে চলে যাবে। আবার এর ভেতর পার্মা, মডেনা, টাসকানি এবং রোম অঞ্চলে জনসাধারণ বিদ্রোহ করল এবং সার্ডিনিয়ার সাথে তাদের রাষ্ট্রগুলির সংযুক্তি-দাবি করল। কিন্তু হঠাৎ তৃতীয় নেপোলিয়ন কাভুরের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং অষ্ট্রিয়ার সাথে ভিলাফ্রাঙ্কা নামক স্থানে যুদ্ধবিরতিতে স্বাক্ষর করলেন। পরে এই যুদ্ধ বিরতি জুরিখের সন্ধিতে পরিণত হয়। সন্ধি অনুসারে স্থির হয় যে সার্ডিনিয়া লম্বার্ডি পাবে কিন্তু ইটালীর অন্যান্য রাজ্যে পূর্বাবস্থা ফিরে আসবে।

অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ

যুদ্ধের অবসান

তৃতীয় নেপোলিয়নের আচরণে কাভুর হতবাক হলেন। পিডমণ্ট একাই যুদ্ধ চালিয়ে যাবে বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ধীর-স্থির পিডমণ্ট-রাজ এতে রাজী না হওয়ায় কাভুর পদত্যাগ করলেন কাভুরের পক্ষে নৈরাশ্যের কারণ হলেও জুরিখের সন্ধিতে ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের অগ্রগতিই সূচিত হয়।

যুদ্ধের ফলাফল

মধ্য ও দক্ষিণ ইটালীর অন্তর্ভুক্তিঃ কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার ইটালীতে দেখা দিল তাতে ভাটা পড়ল না। ভিলাফ্রাঙ্কা ইটালীয়দের স্বাধীনতার স্পৃহা, তাদের একতার আকাজ্ক্ষা আরও বাড়িয়ে দিল। এই সময় ইটালীর জন-সাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাজ্ক্ষা এতই প্রবল হল যে, মধ্য ইটালীর পার্মা, টাসকেনি, মডেনা ও রোমগ্না প্রভৃতি রাজ্যের জনসাধারণ প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করে সার্ডিনিয়ার সাথে একতাবদ্ধ হবার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতিমধ্যে কাভুর পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং নেপোলিয়নের সাথে নতুন এক চুক্তি করলেন। স্থির হল পার্মা, মডেনা ও টাসকেনি পিডমণ্টের সাথে

মধ্য ইটালীতে বিপ্লব ও গণভোট

যুক্ত হবে। ফ্রান্স অবশ্য স্যাভয় ও নীস পাবে। গণভোটের মাধ্যমে অবিলম্বে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হল।

ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্যের ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ের নায়ক হলেন গ্যারিবল্ডি।

গ্যারিবল্ডি—গ্যারিবল্ডি এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পনের বছর বয়সে তিনি বাড়ি হতে পালিয়ে যান এবং নৌবিদ্যায় শিক্ষালাভ করে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন হন। এই সময় তিনি ম্যাটসিনির সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর আদর্শে ও বক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সহকর্মীরূপে কাজ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের ফলে ইটালীর পিডমণ্টে যে বিদ্রোহ হয় তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাঁকে নির্বাসনে থাকতে হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তিনি ইটালীতে ফিরে আসেন এবং সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর রাজনৈতিক গুরু ম্যাটসিনি রোমনগরীতে এক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। গ্যারিবল্ডি এই প্রজাতন্ত্রে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পরে তিনি রোম রক্ষার জন্য ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন। শেষে অবশ্য তাঁকে রোম ছেড়ে চলে যেতে হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিপ্লবী জীবন



গ্যারিবল্ডি

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নেপলস্ ও সিসিলিতে জনসাধারণ বিদ্রোহ করলে তিনি বিপ্লবীদের সাহায্য করতে মাত্র এক হাজার 'লালকোর্তা' নিয়ে সিসিলি জয় করতে যান। গ্যারিবল্ডি সৈন্যবাহিনী নিয়ে সিসিলিতে অবতরণ করলে সেখানকার জনসাধারণ তাঁকে বরণ করে নিল। অভূতপূর্ব জনসমর্থন পেয়ে গ্যারিবল্ডি তিন মাসের মধ্যে সমগ্র সিসিলি অধিকার করলেন এবং নিজেকে সিসিলির সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করলেন। এরপর তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নেপলসে

সিসিলির অভ্যুত্থান

গ্যারিবল্ডির বিজয়াভিযান


ইতালীর ঐক্য
সুইজারল্যাণ্ড
স্যাভয়
লোম্বার্ডি
মিলান
ভেনিশিয়া
পাইডমন্ট
পার্মা
মডেনা
পোপের রাজ্য
নিস
টাস্কেনি
মার্চেস
এল্‌বা
কর্সিকা
রোম
আড্রিয়াটিক সাগর
অ্যাপুলিয়া
ক্যাম্পানিয়া
সার্ডিনিয়া
ন্যাপল্‌স
ভূমধ্যসাগর
ক্যালাব্রিয়া
সিসিলি
পাইড্‌মন্ট সার্ডিনিয়া রাজ্য
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সংযুক্ত
১৮৬০ " "
১৮৬১ " "
১৮৬৬ " "
১৮৭০ " "

এলেন। তাঁর পৌছান সংবাদ পেয়ে নেপলসের জনসাধারণ অত্যাচারী বুরবোঁ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিস প্রাণভয়ে গেটা নামক দুর্গে আশ্রয় নিলেন। গ্যারিবল্ডি যুদ্ধ বুঝতেন, কিন্তু রাজনীতির ধার ধারতেন না। নেপলস জয় করে তিনি রোম ও ভেনিস জয় করবার কথা ঘোষণা করলেন। কাভুর মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কারণ গ্যারিবল্ডি রোম আক্রমণ করলে তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং অষ্ট্রিয়া একজোটে পিডমণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করত। কাভুর প্রথমে গ্যারিবল্ডিকে রোম আক্রমণ না করবার জন্য অনুরোধ জানালেন কিন্তু গ্যারিবল্ডি এটি ভীরুতার নামান্তর বলে মনে করলেন। এরূপ সঙ্কটময় অবস্থায় কাভুর এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। গ্যারিবল্ডির হাত হতে রোম ও পোপকে রক্ষা করবার জন্য উত্তর দিক হতে পোপের রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং সহজেই পোপের রাজ্য জয় করে তিনি রাজা ভিক্টর এমানুয়েলকে নেপলসে পাঠালেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভিক্টর দ্বিতীয় এমানুয়েল যখন নেপলস্-এ প্রবেশ করেন গ্যারিবল্ডি তাঁকে 'ইটালীর রাজা' বলে অভিহিত করেন। রাজা ইমানুয়েল তাঁকে প্রচুরভাবে পুরস্কৃত করতে চান; কিন্তু এই নির্লোভ পুরুষসিংহ কপর্দক না নিয়ে নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রে মহানন্দে চলে গেলেন। এরূপ আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেম মানুষকে দেবতার আসনে বসায় এবং জীবনীকে মহাকাব্যের রূপ দেয়। গ্যারিবল্ডি ইটালীর স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর সেনাপতি বলে গণ্য হয়েছেন।

কাভুরের মনোভাব

পোপের রাজ্য, নেপলস্ ও সিসিলির অন্তর্ভুক্ত

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তুরিনে সংযুক্ত ইটালীর পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসল। ভিক্টর এমানুয়েলকে রাজমুকুট দিয়ে 'ইটালী রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হল। ভেনিস এবং রোম ভিন্ন সমগ্র ইটালী ঐক্যবদ্ধ হল। এর কিছুদিনর পরই কর্মক্লান্ত কাভুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ইটালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা

ইটালীর ঐক্যের দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ভেনিস ও রোম ঐক্যবদ্ধ ইটালীর সাথে যুক্ত হতে বেশি দেরি হল না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সাথে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ হলে ইটালী প্রাশিয়ার পক্ষে এই যুদ্ধে যোগ দেয়। প্রাশিয়ার নিকট অষ্ট্রিয়া পরাজিত হয়। যুদ্ধ-শেষে প্রাগের সন্ধি অনুসারে অষ্ট্রিয়া ইটালীকে ভেনিস দিতে বাধ্য হয়।

অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ইটালীর ভেনিস লাভ

ইটালীর ঐক্যের তৃতীয় পর্যায়ঃ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ফ্রান্স সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধ চলবার সময় ফ্রান্স তার সৈন্যদল রোম হতে সরিয়ে নেয়। ফলে ইটালীয় বাহিনী রোম দখল করে নেয়। ইটালীর রাজধানী রোমে স্থাপন করা হল। এর সাথে সাথে ইটালীর ঐক্য সম্পূর্ণ হল।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে রোম লাভ

ইটালীর ঐক্য-আন্দোলনে বিভিন্ন নেতার অবদানঃ ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য-আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে কাভুরই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁকেই নব্য ইটালীর স্রষ্টা বলা হয়। তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি ভিন্ন ইটালীর ঐক্য সম্ভব হতনা। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে বিদেশী সাহায্য ছাড়া অষ্ট্রিয়ানদের ইটালী হতে তাড়ান যাবেনা। এবং তাদের তাড়াতে না পারলে ইটালীর স্বাধীনতা আসবে না। তিনি ইটালীর সমস্যাকে তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে ইউরোপীয় সমস্যায় পরিণত করলেন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিলেন। ফ্রান্স তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করল। ইংল্যাণ্ডও তাঁকে সাহায্য করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন শুরু হল তখন তিনি ধৈর্য, সাহস ও দক্ষতার সাথে এটিকে পরিচালিত করেন। মধ্য ইটালীর বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে রাজতন্ত্রী পথে পরিচালিত করেন। গ্যারিবল্ডির হাত হতে ক্ষমতা গ্রহণ করবার জন্য রাজা এমানুয়েলকে নেপলস্-এ পাঠিয়ে তিনি অসামান্য রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দেন। পরিশেষে বলা যায় যে ইটালীর জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্যে তিনি ইটালীকে এক জাতিতে পরিণত করেন—এটাই তাঁর জীবনের সাধনা ছিল। ম্যাটসিনির প্রেরণা, গ্যারিবল্ডির রণনৈপুণ্য এবং এমানুয়েলের নির্ভীক দেশপ্রেম বৃথায় ব্যয়িত হত যদি না কাভুর এগুলির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করতেন।

কাভুর

কাভুরের কৃতিত্ব

রাজা ভিক্টর এমানুয়েল-এর ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি দৃঢ়চেতা ও স্থিরবুদ্ধি নৃপতি ছিলেন। তিনি এক সংকটময় অবস্থায় পিডমণ্টের সিংহাসনে বসেন। অষ্ট্রিয়া তাঁকে পিডমণ্টের শাসনতন্ত্র নাকচ করে দিতে বলে কিন্তু তিনি অষ্ট্রিয়ার এই আদেশ অগ্রাহ্য করেন। ফলে পিডমণ্ট ইটালীর মুক্তি আন্দোলনের নেতারূপে গণ্য হয় এবং ইটালীতে রাজতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কাভুরকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত তিনিই করেছিলেন। আবার কাভুরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে

রাজা এমানুয়েলের ভূমিকা

ভিলাফ্রাঙ্কার চুক্তিকে মেনে নিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। রোম ও নেপলস্ এ গিয়েও তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রাম যাতে সফলতা লাভ করে তার জন্য তিনি সর্বপ্রকার চেষ্টা করেন। এবং এসব কারণে ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি এক গৌরবময় স্থান নিয়ে রয়েছেন।

গ্যারিবল্ডি ইটালীর স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনাপতি বলে গণ্য হয়েছেন। তরুণ বয়সে তিনি ইটালীর প্রায় সমস্ত বিপ্লবগুলিতেই যোগ দেন। ম্যাটসিনির তিনি ছিলেন সুযোগ্য শিষ্য। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সিসিলির জন সাধারণ তাঁকে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়। গ্যারিবল্ডি তাঁর মাত্র এক হাজার 'লালকোর্তা' নিয়ে সিসিলি দ্বীপ হতে অত্যাচারী বুরবোঁ রাজাকে বিতাড়িত করেন। সিসিলি জয় করে তিনি নেপলস্ জয় করেন এবং রাজা এমানুয়েল নেপলস্‌এ প্রবেশ করলে তিনি তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখান এবং নিজে সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করে জনসাধারণকে রাজানুগত্য স্বীকার করে নেবার জন্য মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানান। তিনি দেশের স্বার্থে নিজেকে বিলুপ্ত করে দেন। এখানেই তাঁর প্রকৃত মহত্ব। তাঁর আত্মত্যাগের আদর্শ ইটালীর যুবকবৃন্দের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

গ্যারিবল্ডির অবদান

ম্যাটসিনির অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কার্বোনারীর সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত আন্দোলনের পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি গণবিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করেন। ইটালী যখন একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র তখন তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীন ও অখণ্ড ইটালীর স্বপ্ন দেখেন। তিনি ইটালীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগান। অখণ্ড ইটালী গঠনের জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল তিনি তাঁর লেখনী ও কার্যাবলীর দ্বারা তা সম্পূর্ণ করেন। এ কারণে তাঁকে ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয়।

ম্যাটসিনির ভূমিকা

নবম অধ্যায়

জার্মানীর ঐক্য সাধন

জার্মানীর ঐক্য-আন্দোলন : উনিশ শতকে জার্মানীর অবস্থাও ইটালীর ন্যায়ই ছিল। নেপোলিয়ন কতকগুলি জার্মান রাজ্য নিয়ে দক্ষিণ জার্মানীতে একটি যুক্ত জার্মান রাজ্য গঠন করেন। জার্মানরা নেপোলিয়নের অধীন থাকাকালীন নিজেদের এক জাতি হিসেবে ভাবতে শিখল এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বুঝল। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানীকে পুনরায় খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত করা হল। কিন্তু জার্মান জাতি আর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাইল না। তারা ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করল। পরবর্তীকালে প্রাশিয়া এই সংগ্রামের নেতৃত্ব করে এবং জার্মানীর ঐক্য সাধন সম্ভব হয়।

নেপোলিয়নের নিকট বারংবার পরাজিত হয়ে জার্মানগণের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ বিশেষভাবে দেখা দেয়। প্রাশিয়া জার্মানীর পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। প্রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদ আরও উগ্ররূপে ফুটে ওঠে। এই রাষ্ট্রের চিন্তানায়করা শিক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্পে রাষ্ট্রের জনসাধারণকে শক্তিশালী করে তোলেন। ভিয়েনা সম্মেলনে জার্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সংঘবদ্ধ করে ৩৯টিতে পরিণত করা হয় এবং একটি শিথিল যৌথ রাজ্য গঠন করা হয়। এই যৌথ রাজ্যটি ছিল অসংবদ্ধ। অষ্ট্রিয়া পুনরায় জার্মানীতে কর্তৃত্ব করতে আরম্ভ করে। যৌথরাজ্যের একটি পরিষদ ছিল। অষ্ট্রিয়া এই পরিষদের সভাপতি হয় এবং প্রাশিয়াকে সহ-সভাপতি করা হয়। ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে পরিষদের অধিবেশন বসত। অস্ট্রিয়া এই পরিষদের মাধ্যমে জার্মানীতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে। জার্মানীর কোন রাষ্ট্রেই যাতে কোন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত না হয় তার জন্য মেটারনিক সবিশেষ চেষ্টা করেন। দক্ষিণ জার্মানীর কয়েকটি রাজ্য ভিন্ন জার্মানীর সর্বত্রই অনুদার স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। প্রাশিয়ার রাজা অষ্ট্রিয়ার ভয়ে কোন প্রগতিবাদী সংস্কার স্থাপন করতে পারেননি।

জার্মান যৌথরাজ্য

মেটারনিকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি

জার্মান রাজ্যগুলিতে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত প্রগতিবাদ ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত

ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধারা প্রাধান্যলাভ করেছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্টবার্গ নামক স্থানে একটি যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হলে মেটারনিক এটিকে বিদ্রোহ বলে মনে করেন। এর দু'বছর পর রক্ষণশীল নাট্যকার কোট্‌জেবুয়েকে একটি ছাত্র হত্যা করলে মেটারনিক অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

দমননীতি

গোটা জার্মানীতে প্রগতি আন্দোলন চিরদিনের জন্য নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে কার্লসবাডে জার্মান রাষ্ট্রনায়কদের এক সভা ডাকলেন। এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের ওপর লক্ষ্য রাখবার জন্য, সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য, প্রগতিপন্থী সংবিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন বন্ধ করবার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রবর্তন করা হল ইতিহাসে এগুলি কার্লসবাড ডিক্রীস্ বলে পরিচিত। সর্বক্ষেত্রে প্রগতি আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করাই ছিল এই আদেশগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। কার্লসবাড আদেশসমূহ প্রায় দশবৎসর ধরে জার্মানীতে দমননীতি অব্যাহত রাখে।

১৮৩০-এর বিপ্লব : ১৮৩০-এর ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া জার্মানীতে রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি করে। স্যাক্সনি, হ্যানোভার হেসের শাসকদের নিকট হতে জনসাধারণ প্রগতিবাদী সংবিধান আদায় করে নেয়। কিন্তু মেটারনিকের বিরোধিতার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এই শাসনতন্ত্রগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়।

১৮৩০-এর বিপ্লব ব্যর্থ হলেও এ থেকে ভবিষ্যতের দুটি আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলো—প্রথমটি জোলভারিন আন্দোলন এবং দ্বিতীয়টি জার্মান জাতীয়তাবাদ।

জোলভারিন ও জার্মানী : ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়া নেহাৎ অর্থনৈতিক কারণেই তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে একটি শুল্ক সংঘের বা জোলভারিনের সৃষ্টি হয়। ক্রমে জার্মানীর অন্যান্য রাষ্ট্র এই শুল্ক সংঘে যোগ দেয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব মেনে নেয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে অষ্ট্রিয়া ব্যতীত জার্মানীর সকল রাষ্ট্রই এতে যোগ দিয়েছে। এই শুল্ক সংঘ জার্মানীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাত্মবোধ সৃষ্টি করে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ সুগম করে দেয়। অষ্ট্রিয়া ছাড়া যে জার্মানী নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই আত্মপ্রত্যয় জোলভারিন এনে দেয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করবার বাস্তব ও মানসিক ভিত্তি তৈরী হয়।

সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ও ঐক্য-আন্দোলন : অপরদিকে জার্মান মনীষীরা লেখনীর মাধ্যমে ঐক্যের জন্য জার্মানীর ভাবমানস তৈরী করেন। ফিক্‌টে, স্টেন, হেগেল, হেসার, বোজার, ডলম্যান, ক্যাণ্ট, শিলার প্রভৃতি সকলের অবদানের ফলে জার্মানীদের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত হয়।

১৮৪৮-এর বিপ্লব: ১৮৪৮ এর ফরাসী বিপ্লবের প্রতিধ্বনিস্বরূপ জার্মানীর বিভিন্ন রাজ্যে বিপ্লব দেখা দিল। এই সময় প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান জাতিকে এক করার প্রস্তাব ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রাশিয়ার রাজার অষ্ট্রিয়া-ভীতি প্রবল থাকায় এটি সম্ভব হয়নি। ফলে গণতান্ত্রিক উপায়ে জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করবার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হল। এর পর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় সত্য—কিন্তু সে ঐক্যের ভিত্তি ছিল প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি এবং বিসমার্কের কূটনৈতিক দক্ষতা।

ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট

প্রাশিয়ার নেতৃত্ব: ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্টের ব্যর্থতার সাথে সাথে গোটা জার্মানীতে আবার প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থা ফিরে এল। প্রাশিয়ার রাজা নিজরাজ্যে সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলন ধ্বংস করলেন এবং অন্যান্য রাজ্যের গণ-অভ্যুত্থানও প্রাশিয়ার সেনাবাহিনী পাঠিয়ে কঠোরভাবে দমন করলেন। প্রাশিয়ার রাজা নিজের মনোমত এমন এক নতুন সংবিধান প্রবর্তন করলেন যাতে পার্লামেণ্টে কেবলমাত্র জমিদার ও ধনিক শ্রেণী সদস্যপদ লাভ করতে পারে। অবশ্য এই সময় প্রাশিয়ার রাজা ৪র্থ ফ্রেডারিক উইলিয়াম গোটা জার্মানীর ওপর প্রাশিয়ার নেতৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন। ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেণ্ট ভেঙে যাবার পর তিনি অষ্ট্রিয়াকে বাদ দিয়ে অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ জার্মানী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ১৭টি জার্মান রাষ্ট্র তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়। ফলে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই নতুন জার্মান ইউনিয়নের পার্লামেণ্ট আরফুট নামক স্থানে মিলিত হল। প্রাশিয়ার এই কাজেও অষ্ট্রিয়া বিরক্ত হল এবং প্রতিবাদ জানিয়ে দাবি করল যে জার্মানীতে ১৮১৫-এর যৌথরাজ্য-ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রাশিয়ার প্রচেষ্টা ও অস্ট্রিয়ার বিরোধিতা

প্রাশিয়া অষ্ট্রিয়ার ধমকে ভীত হয়ে নবগঠিত ইউনিয়ন ভেঙে দিল। ফলে অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে জার্মান যৌথ রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হল। অষ্ট্রিয়ার নিকট প্রাশিয়ার এই নতি স্বীকারকে 'ওলমুজের অপমান' বলা হয়।

ওলমুজের অপমান

১৮৫৯-৬১ খৃষ্টাব্দের ইটালীর নবজাগরণ গোটা জার্মানীতে, বিশেষ করে প্রাশিয়ায় এক বিরাট উৎসাহ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করল। প্রগতিবাদীরা পুনরায় জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শাসন ও রাজনৈতিক ঐক্য আনবার জন্য আন্দোলন শুরু করল। ইটালীতে অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ে জার্মানরা মনে করতে লাগল যে তাদের দেশের ঐক্য একমাত্র প্রাশিয়ার নেতৃত্বেই

ঐক্য আন্দোলনের নতুন পর্যায়

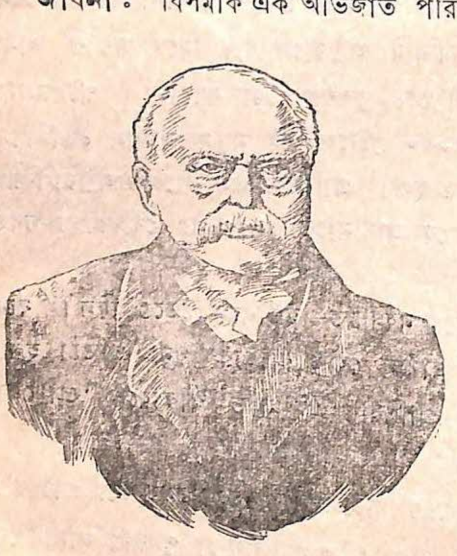
সম্ভব। এই সিদ্ধান্তে পৌছাবার আগে তারা ভেবে দেখল যে, ক্ষুদ্র পিডমণ্ট যদি ইটালীর নেতৃত্ব নিতে পারে তবে প্রাশিয়া জার্মানিতে কেন তা পারবে না। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করবার আকাঙ্ক্ষা সব চেয়ে তীব্র ভাবে দেখা দিল প্রাশিয়ার রক্ষণশীল অভিজাত ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যে।

এদিকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১ম উইলিয়ম প্রাশিয়ার রাজা হন। তাঁর সিংহাসনারোহণের ফলে প্রাশিয়ার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হল। তিনি একদিকে যোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাশিয়াকে জার্মানির অবিসংবাদী নেতাতে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রথমেই তিনি প্রাশিয়ার সৈন্য বাহিনী পুনর্গঠিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করতে চাইলেন। কিন্তু প্রাশিয়ান পার্লামেণ্ট ব্যয়াধিক্যের অজুহাতে তাঁর এই কাজে বাধা দিল। ফলে প্রাশিয়ার এক শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। উইলিয়ম বিরক্ত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে চাইলেন। শেষে সামরিক মন্ত্রী রুন ও প্রধান সেনাপতি মলট্‌কির পরামর্শে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে অটোভন্ **বিসমার্ককে** প্রধান মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করলেন।

বিসমার্ক-এর ক্ষমতা লাভ

জীবনী ঃ বিসমার্ক এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র-জীবনে প্রতিভার কোনরূপ পরিচয় তিনি দেখাতে পারেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন কিন্তু চাকরির একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে নিজের ক্ষেত-খামারের কাজে মন দেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন এবং নিজেকে রাজতন্ত্রের উগ্র সমর্থকরূপে প্রকাশ করেন। ১৮৪৮-এর বিপ্লবকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি প্রথম হতেই প্রজা-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন এবং সামরিক শক্তিতে তাঁর পুর্ণ আস্থা ছিল। জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র সামরিক শক্তির দ্বারাই সম্ভব, বক্তৃতা বা ভোটের দ্বারা নয়—তাঁর প্রাণের কথা ছিল।

প্রথম জীবন



বিসমার্ক

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম উইলিয়ম প্রাশিয়ার সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিসমার্ক প্রাশিয়ার মন্ত্রিসভার সভাপতিরূপে নিযুক্ত হন। এর আগে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রে (ফ্রান্স, রাশিয়া) প্রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তার জ্ঞানলাভ হয়। মন্ত্রিসভার সভাপতি হিসেবে তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল কাটিয়ে দেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী তিনিই জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন।

বিসমার্কের জীবনের স্থির লক্ষ্য ছিল প্রাশিয়াকে সম্মিলিত জার্মানীর নেতৃত্বাসনে প্রতিষ্ঠা করা এবং ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত করা। তিনি সহজেই উপলব্ধি করলেন যে জার্মানীর ঐক্যবন্ধনের প্রধান অন্তরায় অষ্ট্রিয়া এবং ইউরোপীয় প্রধানশক্তিতে পরিণত করার অন্তরায় ফ্রান্স। তিনি সামরিক শক্তিকে অজেয় করে তুললেন। বিরোধীদলের মুখ বন্ধ করবার জন্য তিনি পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ রাখলেন এবং সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করলেন। তিনি এক সময় বলেছিলেন যে, সামরিক শক্তির সাহায্যে যে কোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান সম্ভব। সামরিক শক্তির সাহায্যেই জার্মানীর ঐক্য বন্ধনের ন্যায় বৃহৎ ও জটিল সমস্যার সমাধান হয়েছিল। এর জন্য বিসমার্ককে তিনটি যুদ্ধ করতে হয়েছিল—ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের সাথে।

ডেনমার্কের সাথে যুদ্ধঃ শ্লেজউইগ হলস্টেন স্থান দুটিকে কেন্দ্র করে বিসমার্ক ডেনমার্কের সাথে যুদ্ধে নামলেন। এ দুটি স্থান ডেনমার্কের অধিকারে থাকলেও হলস্টেন ছিল জার্মান যৌথরাষ্ট্রের অন্যতম সদস্য। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের লণ্ডন সন্ধির দ্বারা ঠিক হয় যে, এই দুটি স্থান ডেনমার্ক-এর শাসনাধীনে থাকলেও তাদের ডেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কিন্তু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এদুটি অঞ্চলকে ডেনমার্কের সাথে যুক্ত করবার কথা ঘোষণা করা হলে এর বিরুদ্ধে গোটা জার্মানীতে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো, কারণ এই অঞ্চল দুটিতে বহু সংখ্যক জার্মান বাস করত। প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া যুগ্মভাবে ডেনমার্ককে এ দুটি অঞ্চল সংযুক্ত করা থেকে বিরত থাকবার জন্য নির্দেশ দিল। ডেনমার্ক যখন এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করল তখন অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুক্ত বাহিনী ডেনবাহিনীকে পরাজিত করে এ দুটি অঞ্চল অধিকার করে নিল। যুদ্ধ শেষে এই অঞ্চল দুটির শাসন ব্যবস্থা কি হবে তা নিয়ে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। অবশেষে

শ্লেজ্‌উইগ -হলস্টেন প্রশ্ন

ডেনমার্কের বিরুদ্ধে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

গেষ্টিনের চুক্তি দ্বারা ঠিক হল যে শ্লেজউইগ ও হলস্টেনে অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার যুগ্ম-শাসন প্রবর্তিত হলেও প্রাশিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত হলস্টেনের শাসনভার দেওয়া হল অষ্ট্রিয়াকে আর শ্লেজউইগ রইল প্রাশিয়ার অধীনে। বিসমার্ক ভবিষ্যতে যাতে অষ্ট্রিয়ার সাথে এই নিয়ে যুদ্ধ করা যায় সেদিকে নজর রেখেই এরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, নিতান্ত সাময়িক ভাবেই কাগজ দিয়ে অষ্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার সম্পর্কের ফাটল বন্ধ করা হয়েছে। শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে প্রাশিয়ার এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বিসমার্ক ভবিষ্যতে অষ্ট্রিয়ার সাথে সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখলেন।

অস্থায়ী ব্যবস্থা

অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ (১৮৬৬): বিসমার্ক বিশ্বাস করতেন যে জার্মানীতে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার একত্রে অবস্থান করা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং তিনি জার্মানী হতে অষ্ট্রিয়াকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর হন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার আগে তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ কূটনীতির দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করলেন যাতে অস্ট্রিয়া যুদ্ধের সময় একক রইল; অন্য কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করল না। বিসমার্ক প্রথমেই ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে বিয়ারিজ নামক স্থানে মিলিত হলেন এবং সম্রাটের নিকট হতে অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে নেপোলিয়নের দুর্বলতা ছিল। তিনি ইটালীর স্বাধীনতা সংগ্রামে সামরিক সাহায্য দিয়েছিলেন। জার্মানীর ক্ষেত্রে তিনি একেবারে না করতে পারলেন না, অস্ট্রো-প্রাশিয়ান কলহে নিরপেক্ষ থাকবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। এছাড়া ফ্রান্সের নিরপেক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ জার্মানীর কিছু স্থান বা বেলজিয়াম ফ্রান্স পেতে পারবে বলে বিসমার্ক ইংগিত দেন। অবশ্য পুরস্কার কিংবা অন্য কোন বিষয়ে দু'জনের মধ্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি। নেপোলিয়নের সাথে সাক্ষাতের আগেই বিসমার্ক রাশিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পোল-বিদ্রোহ দমন করতে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে তিনি সাহায্য করেন। ফলে রাশিয়ার সাথে প্রাশিয়ার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এর পর বিসমার্ক নবগঠিত ইটালী রাজ্যের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত করলেন। ঠিক হল যে ইটালী অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে সাহায্য করবে; বিনিময়ে ইটালী ভেনেসিয়া পাবে। ইংল্যাণ্ডও যে অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন বিসমার্ক। এইভাবে অস্ট্রিয়াকে

যুদ্ধের প্রস্তুতি

বিসমার্কের কূটনীতি

নির্বান্ধব করে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়া আক্রমণের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কিন্তু তিনি বহির্জগতের নিকট দেখাতে চাইলেন যে অস্ট্রিয়াই আক্রমণকারী।

কূটনৈতিক প্রস্তুতি শেষ করে বিসমার্ক হঠাৎ জার্মান কনফেডারেশনের গঠনবিধি সংস্কার করবার কথা জোর গলায় বলতে থাকলেন এবং প্রাশিয়ার প্রতিনিধিকে সরিয়ে এনে কনফেডারেশনের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এরপর তিনি ঘোষণা করলেন যে, অষ্ট্রিয়া হলস্টেনে প্রাশিয়া-বিরোধী প্রচার কার্য চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে অষ্ট্রিয়া শ্লেজউইগ-হলস্টেন প্রশ্নটি জার্মান যৌথ রাজ্যের ডায়েটে পেশ করল। কিন্তু গেষ্টিন সম্মেলনে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ডায়েটের বাইরে এই প্রশ্নটির মীমাংসা হবে। সুতরাং চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে বিসমার্ক হলস্টেনে সৈন্য পাঠালেন এবং স্থানটি দখল করে নিলেন। এতে অষ্ট্রিয়া ডায়েটে প্রস্তাব করল যে, জার্মান সংযুক্ত রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীগুলি প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাঠানো হোক। প্রাশিয়া এর উত্তরে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। এই যুদ্ধ মাত্র সাত সপ্তাহ চলেছিল। **স্যাডোয়ার যুদ্ধে** অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হ'ল, এবং **প্রাগের সন্ধি** দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হল। অষ্ট্রিয়াকে কোন স্থান হারাতে হল না এবং তার নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণও দাবি করা হল না। কিন্তু অষ্ট্রিয়াকে জার্মান কনফেডারেশন চিরতরে ত্যাগ করতে হল এবং জার্মানীতে প্রাশিয়ার নেতৃত্ব তাকে স্বীকার করে নিতে হল। অষ্ট্রিয়াকে অবশ্য ইটালীতে ভেনেসিয়া ছেড়ে দিতে হল। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 'উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাশিয়ার শাসনতন্ত্রই এই সমগ্র অঞ্চলের শাসনতন্ত্র হল। স্যাডোয়ার জয়ের ফলে প্রাশিয়ার জনসংখ্যা ৪৫ লক্ষ বেড়ে গেল।

যুদ্ধের অজুহাত

অস্ট্রিয়ার পরাজয়

জার্মানীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান

স্যাডোয়া যুদ্ধের গুরুত্ব: স্যাডোয়ার যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ে মধ্য-ইউরোপের শক্তিসাম্যে পরিবর্তন এল। প্রাশিয়া ইউরোপের ইতিহাসে নতুন মর্যাদা পেল। মধ্য ইউরোপের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু ভিয়েনা হতে বার্লিনে সরে গেল। এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ে ফরাসী স্বার্থের হানি হল। ফ্রান্সের সীমান্তে শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সের পক্ষে মারাত্মক হল। একারণে স্যাডোয়ায় অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ফরাসীরা নিজেদের পরাজয় বলে মনে করল। এই যুদ্ধের ফলে ইটালীর ঐক্য সাধনের ইতিহাসে একটি পর্যায়

অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ফলাফল

শেষ হল। প্রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে রক্ষণশীল ও সমরবাদী বিসমার্কের নীতিরই জয় হল এবং তাঁর সাফল্য তাঁর প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার ভাব নিয়ে এল। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও স্যাডোয়ার পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অষ্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং ফলে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে দ্বৈতরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল।

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ (১৮৭০): উত্তর জার্মানী প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হলেও দক্ষিণ জার্মানী তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলছিল। ফ্রান্স দক্ষিণ জার্মানীর এই স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য সবরকম চেষ্টা করছিল এবং প্রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত ও ঈর্ষান্বিত হল। তৃতীয় নেপোলিয়ন বিসমার্ককে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে, দক্ষিণ জার্মানীর রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা যেন বিপন্ন না করা হয়। তিনি আরও দাবি করলেন যে প্রাশিয়া যেভাবে শক্তিবৃদ্ধি করছে তা ফ্রান্সের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সে কারণে ইউরোপে শক্তিসাম্য বজায় রাখবার জন্য ফ্রান্সেরও শক্তিবৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন এবং এখন ফ্রান্সের 'ক্ষতিপূরণ' স্বরূপ কিছু পাওয়া উচিত। তৃতীয় নেপোলিয়নের উদ্ভট দাবিতে বিসমার্ক-এর দৃঢ় ধারণা জন্মালো যে ফ্রান্সের সাথে প্রাশিয়ার যুদ্ধ ইতিহাসের যুক্তি অনুযায়ী অবশ্যম্ভাবী। তিনি ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন। এদিকে যুদ্ধ-প্রস্তুতির সাথে সাথে তিনি প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ বাধলে প্রাশিয়া যে জয়ী হবেই তা তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে দক্ষিণ-জার্মানীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি যে জাতীয়তাবাদী জনমতের চাপে প্রাশিয়ার দিকে যোগ দিতে বাধ্য হবে সে সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ বাধবার আগে তিনি কূটনীতির দ্বারা ফ্রান্সকে নির্বান্ধব করবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি রাশিয়াকে বোঝালেন যে, ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ হলে রাশিয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের প্যারিসের চুক্তিতে কৃষ্ণসাগর সম্বন্ধীয় ধারাগুলি নাকচ করবার সুযোগ পাবে। এর ফলে রাশিয়া বিসমার্ককে সম্ভাব্য ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবার প্রতিশ্রুতি দিল। ইটালীও নিরপেক্ষ থাকবে বলে কথা দিল। অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষতা নীতি ভিন্ন অন্য কোন কথাই চিন্তা করল না। ইংল্যাণ্ড তৃতীয় নেপোলিয়নের পররাজ্যগ্রাস নীতি ভাল চোখে দেখল না। ফলে বিসমার্কের সুবিধা হল। অতএব দেখা যাচ্ছে যে যুদ্ধ বাধবার আগে বিসমার্ক তাঁর কূটনীতি দ্বারা ফ্রান্সকে সম্পূর্ণভাবে মিত্রহীন রাখতে পেরেছিলেন।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

বিসমার্কের কূটনীতি

এবার বিসমার্ক যুদ্ধের অজুহাত খুঁজতে লাগলেন। স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে বিসমার্ক তাতে যুদ্ধের অজুহাত খুঁজে পেলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনে এক বিদ্রোহের ফলে রানী ইসেবেলা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে স্পেনের সিংহাসন খালি হয়। স্পেনবাসী প্রাশিয়ার হোহেনজোর্লান বংশীয় লিওপোল্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসাবার প্রস্তাব করে। কিন্তু ফ্রান্সের রাজনৈতিক চাপে লিওপোল্ড ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। কিন্তু ফ্রান্স এতেও সন্তুষ্ট হল না। ফ্রান্স তার জার্মানীস্থ রাজদূতকে প্রাশিয়ার রাজার সাথে দেখা করবার নির্দেশ দিল এবং বলা হল রাষ্ট্রদূত যেন প্রাশিয়ার রাজার নিকট হতে এরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যাতে ভবিষ্যতে হোহেনজোর্লান রাজবংশের কেউই স্পেনের রাজসিংহাসনের জন্য প্রার্থী না হন। এই সময়ে প্রাশিয়ার রাজা এমস্ নামক স্বাস্থ্যনিবাসে ছিলেন। ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাঁর সাথে দেখা করে ফরাসী সরকারের দাবি জানালে রাজা এরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তারযোগে তাঁর সাথে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কথাবার্তা বিসমার্ককে জানালেন। বিসমার্ক প্রথমে সেনাপতিদের নিকট হতে প্রাশিয়ার সমরপ্রস্তুতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে টেলিগ্রামের মূল বক্তব্য না বদলিয়ে তিনি ওটির সংক্ষিপ্তসার এমনভাবে তৈরী করলেন যে জার্মানরা পড়ে মনে করবে যে ফরাসী রাষ্ট্রদূত তাদের প্রিয় রাজাকে অপমানিত করেছে, অন্যদিকে ফরাসীরা মনে করবে যে তাদের রাষ্ট্রদূত অপমানিত হয়েছে। বিসমার্ক যা চেয়েছিলেন তাই-ই হল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সই প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর ফলে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র ফ্রান্সকে আক্রমণকারী বলে মনে করল। যুদ্ধ শুরু হলে দেখা গেল যে প্রাশিয়ার সামরিক ব্যবস্থা এরূপ নিখুঁত ও সুপরিকল্পিত ছিল যে যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মান সৈন্যদের কোনরূপ অসুবিধা হল না। এদিকে ফ্রান্সের সমর-প্রস্তুতি কিছুই ছিল না। ফ্রান্সের মিত্রশক্তি বলতে কাউকে দেখা গেল না। অপরদিকে দক্ষিণ-জার্মানীর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে প্রাশিয়ার দিকে যোগ দিল।

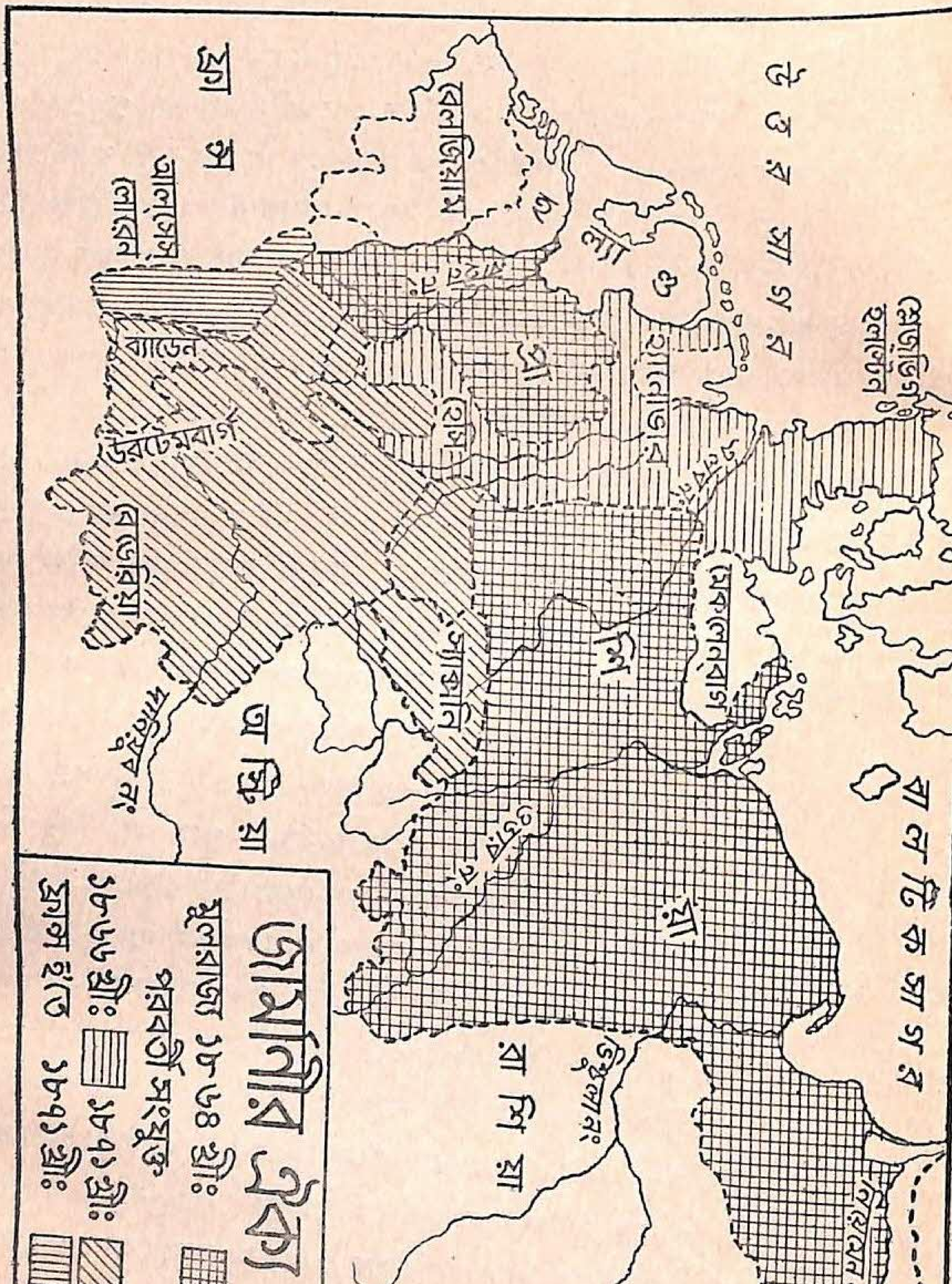
যুদ্ধের অজুহাত

এমস্ টেলিগ্রাম

জার্মানীর ঐক্য

ইতিমধ্যে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রধান ফরাসী সৈন্যসহ **সেডানের** রণক্ষেত্রে জার্মানদের হাতে বন্দী হলেন। বিজয়ী জার্মান সৈন্য প্যারিসে প্রবেশ করল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করল। ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধি অনুযায়ী ফ্রান্স প্রাশিয়াকে

ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়


উত্তর সাগর
বাল্টিক সাগর
হল্যাণ্ড
বেলজিয়াম
হ্যানোভার
মেকলেনবার্গ
স্যাক্সনি
ব্যাডেন
উরটেমবার্গ
ব্যাভেরিয়া
আলসেস্ লোরেন
ফ্রান্স
অষ্ট্রিয়া
রাশিয়া
জার্মানীর ঐক্য
মূলরাজ্য ১৮৬৪ খ্রীঃ
পরবর্তী সংযুক্ত
১৮৬৬ খ্রীঃ
১৮৭১ খ্রীঃ
ফ্রান্স হ'তে ১৮৭১ খ্রীঃ

আলসাস ও লোরেন নামক প্রদেশ ছুটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়। আরও ঠিক হয় যে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত একটি বাহিনী ফ্রান্সে থাকবে।

ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধি

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী ভার্সাইয়ের সিস্ মহলে প্রাশিয়ার রাজাকে জার্মান সম্রাট বলে ঘোষণা করবার সাথে সাথে জার্মানীর ঐক্য সম্পূর্ণ হল। জার্মানী ইউরোপের সামরিক শক্তিরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

জার্মানীর জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ

দশম অধ্যায়

রাশিয়া (১৮৫৫-১৮৯৪)

সূচনা

১৮৫৫ হতে ১৮৯৪ পর্যন্ত এই কয়টি বছর রাশিয়ার ইতিহাসে প্রস্তুতির যুগ বলে গণ্য করা হয়। এই সময়ে রাশিয়ায় শিল্পবিপ্লবের ফলাফল পুরোপুরিভাবে দেখা দেয়নি, যদিও শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল এবং নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি-গুলিকে শক্তি যুগিয়েছিল। এই যুগে রাশিয়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে তার প্রভাব বিশেষ খাটাতে পারেনি। কিন্তু ঠিক এই যুগেই রাশিয়ার অভ্যন্তরে সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়, নানারূপ সংস্কার ওপর হতে প্রবর্তিত হয় কিন্তু রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়নি। রাশিয়ায় যে সব সামাজিক সংস্কার সাধিত হয়, সেগুলি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধারা অনুযায়ী না হয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে হয়েছিল, রাশিয়ার শাসন ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আনা হয়নি বলে রাজনীতির সাথে সমাজ-জীবনের কোন সম্পর্ক গড়ে উঠল না। ফলে রাশিয়ায় এক বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় প্রথম নিকোলাসের পুত্র দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হলেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসানের সাথে সাথেই তিনি আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য চেষ্টিত হলেন। এই যুদ্ধের

ফলে ইউরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রভাব যেমন কমে গেল তেমনি আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা সোচ্চার হল। স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা এবং রাশিয়ার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় জনসাধারণ আস্থা হারাল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিজেই মনে করলেন যে যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের কারণ হল তার সমাজ ও শাসনব্যবস্থা। একারণে তিনি সংস্কার কার্যে অগ্রসর হলেন। তবে জারের সর্বময় কর্তৃত্ব যাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর রাখলেন।

বিভিন্ন সংস্কার কার্য: সিংহাসনারোহণের সাথে সাথেই নতুন জারের সংস্কার কার্য শুরু হয়। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দশ বছর সংস্কার কার্যের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। প্রথমেই তিনি ডেকাব্রিস্টদের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন অথচ নির্বাসনে দিন যাপন করছিলেন তাঁদের মুক্তি দিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশের স্বাধীনতা দিলেন ; বিদেশে ভ্রমণে উৎসাহ দিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারী বাধা-নিষেধ তুলে নিলেন। সংক্ষেপে নিকোলাস প্রবর্তিত কড়া সেন্সর প্রথার অবসান ঘটালেন।

ভূমিসংস্কার ও ভূমিদাস প্রথার অবসান: ক্রিমিয়ার যুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার একটি ঘোষণা জারী করলেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে জারের প্রত্যেক প্রজাই যাতে আইনের চোখে সমান মর্যাদা পায় এবং তার শ্রমলব্ধ উপার্জন শান্তিতে ভোগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া হবে। সমগ্র রাশিয়ায় এই ঘোষণাটিকে ভূমিদাস প্রথার অবসানের সূচনা বলে মনে করা হল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি Edict of Emancipation বা এক মুক্তিনামার দ্বারা রাশিয়া হতে ভূমিদাস প্রথা বিলোপের নির্দেশ দিলেন।

ভূমিদাস প্রথার অবসানের ফলে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হল তা আলোচনা করার পূর্বে ভূমিদাসদের অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ রাশিয়ায় প্রাচীন কাল হতেই ভূমিদাস প্রথা চালু ছিল। কালক্রমে এই প্রথা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। রাশিয়ার ভূমির মালিক ছিল জারবংশীয় এবং প্রায় দেড়লক্ষ অভিজাত পরিবার।

ভূমিদাসদের অবস্থা

এরা নিজেরা চাষ করতে পারত না বলে সার্ফদের দ্বারা চাষ করাত। সার্ফদের সাথে জমির সম্পর্ক ছিল নিবিড়। যে খামারে তারা চাষ করত সে খামার সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ ছিল—এক ভাগের (প্রধান অংশের) উৎপন্ন ফসল সম্পূর্ণভাবে মালিক পেতেন, ভূমিদাসরা চাষ করে

দিত ; অন্যভাগে ভূমিদাসরা নিজ নিজ অংশ চাষ করত এবং উৎপন্ন শস্য তারাই পেত। তবে এই ভূমির ওপর তাদের কোন স্বত্ব থাকত না। এবং এর জন্য তাদের খাজনাও দিতে হত। সার্ফরা ক্রীতদাস ছিল না সত্য কিন্তু তারা জমি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারত না। একারণে তাদের ভূমিদাস বলা হয়েছে। নিজের নিজের জমির সাথে তারা এমনভাবে জড়িত ছিল যে ওই জমি হস্তান্তরিত হলে সার্ফরাও হস্তান্তরিত হত। সার্ফদের মালিকের সীমাহীন ক্ষমতা ছিল। প্রয়োজন হলে তাদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থাও মালিকরা করতে পারত।

জার আলেকজাণ্ডার সব দিক বিবেচনা করে এই প্রথা তুলে দিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাশিয়া হতে সার্ফপ্রথা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হল। এই প্রথার অবসান ঘটিয়ে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন এবং রাশিয়ার প্রাক বিপ্লব যুগের ইতিহাসে তাঁকে মুক্তিদাতা জার বলে (Tsar Liberator) ভূষিত করা হয়।

ফলাফল ও সমালোচনাঃ ভূমিদাসদের মুক্তিনামায় চারটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল—: (ক) সার্ফদের রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার প্রদান করা হল, (খ) তারা ভূমিদাসত্ব হতে মুক্তি পেল, তারা অংশত জমির মালিক হল ; (গ) কিন্তু এই মালিকানা সরাসরি তাদের না দিয়ে মির (Mir) নামক গ্রাম্য যৌথ সংস্থাকে দেওয়া হ'ল। (ঘ) কৃষকদের জমির মালিকানা পাওয়ার বিনিময়ে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হ'ল। এই ক্ষতিপূরণের অর্থ কৃষকদের হয়ে 'মির' জমিদারদের দিতে বাধ্য থাকবে বলা হল। যেহেতু তাদের অর্থের অভাব ছিল, সে কারণে সরকার হতে জমির মূল্য ধার্য করে জমিদারদের দেওয়া হল, এবং কৃষকদের নিকট হতে শতকরা ৬ ভাগ সুদে ৪৯ কিস্তিতে এই অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা হল।

ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ফলে রুশ কৃষকরা আইনত স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তারা পেল না। কৃষকরা ব্যক্তিগতভাবে জমি ভোগ করতে পেল না। মির (Mir) বা গ্রাম্য-সংস্থা জমির মালিক হল অর্থাৎ জমির উপর যৌথ মালিকানা স্থাপন করা হল। জমি দেখাশুনা করার দায়িত্ব রইল মিরগুলির ওপর এবং মিরগুলিই জমির ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য দায়ী রইল। অর্থাৎ ভূমিদাস প্রথার অবসানের ফলে কৃষকরা ব্যক্তির অধীনতা হতে মুক্তি পেল সত্য কিন্তু তার বদলে যৌথ দায়িত্ব বর্তাল। মির-এর কর্তৃত্ব জমিদারদের কর্তৃত্বের মতই তাদের নিকট অসহ্য মনে হল।

কৃষকদের পক্ষে মুক্তি-নামা শুভাশুভ ফল দিলেও অভিজাতদের নিকট এটি আশীর্বাদ স্বরূপ মনে হল। তারা একদিকে রাশিয়ার কৃষিযোগ্য ভূমির অর্ধেক খাসে রাখতে পারল এবং অন্যদিকে সার্ফদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হতেই শুধু রেহাই পেল না, নিকৃষ্ট জমির বদলে ক্ষতিপূরণ পেল। এর ফলে রাশিয়ায় অভিজাত শ্রেণী দুর্বল না হয়ে আরও শক্তিশালী হল। অভিজাতরা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের উদার মনোভাবাপন্ন নীতির বিরোধিতা করল না, বিরোধিতা করল বুদ্ধিজীবীরা।

অর্থনৈতিক দিক হতে দেখলে ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধন রাশিয়ার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করল না বা কৃষিকার্যে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হল না। যেহেতু মৃত্যুর পর পুত্ররাই জমির মালিকানা স্বত্ব পেত একারণে মিরগুলির একটি দায়িত্ব হল নতুন বংশধরদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টন করে দেওয়া। জমি খণ্ডিত হতে থাকল এবং চাষের পক্ষে অযোগ্য হল। এর ফলে একজনের যখন জমির পরিমাণ কমে গেল তখন জমির প্রতি টান আর রইল না। কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা তারা ছেড়ে দিল।

তবুও এটি অনস্বীকার্য যে ভূমিদাস প্রথার অবসানে রাশিয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা হল। দেশ হতে এক বিরাট সামাজিক অবিচার তুলে দেওয়া হল এবং বিশ্বে রাশিয়া নৈতিক শ্রদ্ধার পাত্র হল। এর কারণ হল রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলোপ করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হয়নি বা রক্তপাত ঘটেনি। কিন্তু রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথা বিলোপের প্রায় চার বছর পর দাসত্ব প্রথা বিলোপের প্রশ্নে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

অন্যান্য সংস্কার ঃ ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধনই জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের একমাত্র সংস্কার কার্য নয়, শাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগেই তিনি সংস্কার সাধন করেন।

বিচার বিভাগ ঃ ভূমিদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ফলে সার্ফদের উপর জমিদারদের কর্তৃত্বেরও অবসান ঘটল। এ কারণে জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত বিচারালয়গুলিকে টিকিয়ে রাখার আর কোন প্রয়োজন থাকল না। এর বদলে নতুন বিচারালয় স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল। জার :আলেকজাণ্ডার বিচার বিভাগে সংস্কার প্রবর্তনের এই সুযোগ ছাড়লেন না। তিনি রাশিয়ার বিচার বিভাগ ঢেলে সাজাবার মনস্থ করলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এক ঘোষণার দ্বারা এই সংস্কার শুরু করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই এই সংস্কারকার্য সম্পূর্ণ হল। এর ফলে এক দিকে যেমন বিচারকদের চাকরির স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা বিধান, প্রকাশ্য

বিচার ও জুরি প্রথা দ্বারা বিচারের বন্দোবস্ত হল, অন্যদিকে দেশে আইনের শাসন চালু করার সার্থক প্রয়াস চলল।

স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দান: ভূমিদাস প্রথার বিলোপসাধনে কৃষককুল নানা কারণে অসন্তুষ্ট হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে। এই সুযোগে রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা উগ্র বামপন্থী ছিলেন তাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার করলেন। এমন কি তাঁরা জারতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা চালালেন। এরকম অবস্থায় জার মনে করলেন যে ভূমিদাসের মুক্তির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সাথে চালু প্রথা-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গতিবিধান প্রয়োজন; পশ্চিম ইউরোপের অনুকরণে রাশিয়াতে আধুনিকীকরণের প্রয়োজন তিনি অনুভব করলেন। তিনি আশা করলেন যে আধুনিকীকরণের ফলে দেশে অধিকাংশ লোক গোঁড়া বামপন্থী আন্দোলন হতে দূরে থাকতে চেষ্টা করবে। ফলে বিপ্লব দেখা দেবে না।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে জার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এক ঘোষণার দ্বারা সমগ্র রাশিয়ায় স্বায়ত্ত-শাসনের বুনিয়াদ স্থাপন করলেন। এই ঘোষণার দ্বারা তিনি প্রতি জেলায় Zemstvo বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠনের অনুমতি দিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় সকল শ্রেণীর জনসাধারণের ভোট দেবার অধিকার ছিল। জেলা Zemstvo সমূহের সদস্যরা প্রাদেশিক Zemstvo-এ তাদের প্রতিনিধি পাঠাত। Zemstvoগুলির ওপর স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান এরাই করত। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দায়িত্বও এদের ওপর দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি, জেলখানা প্রভৃতির তদারকী করবার ক্ষমতা এদের ছিল। প্রথম দুবছরে জেলা Zemstvoগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে অর্ধেক ছিল অভিজাত ও অর্ধেক ছিল কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রাদেশিক Zemstvo-গুলিতে অভিজাতদের সংখ্যা বেশি ছিল। কৃষকরা জমিদারদের সাথে একজোটে কাজ করতে সমর্থ হয়, কোথাও মনোমালিন্য দেখা দেয়নি। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। অবশ্য অর্থের অভাবে Zemstvoগুলি তাদের ইচ্ছানুযায়ী জনহিতকর কার্যাবলী সুসম্পন্ন করতে পারত না। অবশ্য এর জন্য দায়ী Zemstvoগুলি ছিল না।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার: দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার দেশের শিক্ষা সম্বন্ধেও চিন্তা করেছিলেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করেন। ১৮৬৪

খৃষ্টাব্দে তিনি একটি আইনের দ্বারা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করলেন। রুশ ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করতে হবে। অ-রুশভাষী অঞ্চলের জন্য কোন পৃথক ব্যবস্থা করা হল না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ লোকদের ছেলেরাও যাতে ভর্তি হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হল। বালিকাদের জন্য পৃথক স্কুলের ব্যবস্থা হল।

অন্যান্য সংস্কার: ১৮৭০-এ তিনি রাশিয়ার শহরগুলিতে Zemstvoর মত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার অনুমতি দিলেন। অবশ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদেশপাল বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখা হল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জার সামরিক বিভাগেও সংস্কার সাধন করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কাউন্সিল অব্ মিনিস্টার বা মন্ত্রিসভা স্থাপন করা হল। তবে মন্ত্রিসভার স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা রইল না। কারণ জারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হতে জারের নির্দেশে সরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসেব বের করা হতে থাকল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অব রাশিয়া স্থাপন করা হল দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের জন্য।

শিল্পায়ন: দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে শিল্পের ক্ষেত্রে রাশিয়া বেশ কিছুটা উন্নতি করে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর বিদেশী পুঁজির সাহায্যে রেলপথ প্রসারিত হল। এই রেলপথ প্রসারের ফলে রাশিয়া শিল্পায়নের পথে অনেকটা এগিয়ে গেল। বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এবং কার্পাস শিল্পে প্রভূত উন্নতি দেখা দিল। কয়লা ও খনিজ শিল্পের বুনিয়াদ এই সময় স্থাপিত হয় এবং ইস্পাত শিল্পও ইংল্যাণ্ডের সহায়তায় গড়ে ওঠে। অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় রাশিয়ার শিল্পায়নের কাজ ধীর গতিতে চলতে থাকল। শিল্পে অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রমজীবী সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ফলে শ্রমিকরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলির সাথে আলেকজাণ্ডারের প্রবর্তিত সংস্কারগুলির বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। সংস্কারগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল স্বৈরাচারী জারের দ্বারা। এগুলির দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলন বন্ধ করা গেল না। রাশিয়ার প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল বিপ্লবী আন্দোলন। আপামর জনসাধারণ এতে যোগ দেয়নি। তবে এর উৎপত্তির মূলে ছিল বুদ্ধিজীবীরা এবং উনিশ শতকের রাশিয়ার সাংস্কৃতিক আন্দোলন। রাশিয়ার

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন অভিজাত বা শহরে বসবাসকারী শিল্পে বা বাণিজ্যে নিযুক্ত কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এবং সাহিত্যিক। এঁদের দ্বারাই উনিশ শতকে রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি দেখা যায়।

পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ: রাশিয়ায় জাতীয়তাবাদের প্রসারে জার আলেকজাণ্ডার ও তাঁর কর্মচারীরা বিশেষ চিন্তিত হলেন না। তবে পোল্যাণ্ড ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ তাঁদের চিন্তিত করে তুলল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পোল্যাণ্ডে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি দেখা দেয় এবং সামান্য কারণে পোলেরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। রুশ সরকার এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য একটি বিশেষ নীতি গ্রহণ করল—কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এই বিদ্রোহ হতে তাদের দূরে সরিয়ে রাখল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কঠোর হস্তে পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করলেন। পোলদের আগে যে সব স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা কেড়ে নেওয়া হল এবং সর্বপ্রকারে পোল্যাণ্ডের স্বাতন্ত্র্যবোধ নষ্ট করবার চেষ্টা চলল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের পোলিশ বিদ্রোহ ব্যর্থ হল।

পোল বিদ্রোহ রাশিয়ার সর্বপ্রকার উদারনীতির সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করল। প্রতিক্রিয়াশীলরা জারের দুর্বলতা ও উদারনীতিকে এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী করল। এদিকে পোল বিদ্রোহের সুযোগে নিহিলিস্ট (Nihilist) নামে রাজনৈতিক বিপ্লবী দল দেশময় বিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা জার সরকারকে ভাবিয়ে তুলল। এসব কারণে জার সংস্কারবিমুখ হলেন এবং দমননীতি অনুসরণ করতে শুরু করলেন।

তিনি সংবাদপত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেন এবং বিচার-ব্যবস্থার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রত্যাহার করলেন। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হল। কিন্তু এত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও নিহিলিস্ট দলের কর্মীরা ধ্বংসাত্মক কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে থাকল—বহু সরকারী কর্মচারী এদের হাতে নিহত হল। জারের প্রাণনাশেরও চেষ্টা চলল। এর ফলে জার আলেকজাণ্ডার তাঁর দমননীতির বদলে জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ প্রসারিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি কমিশন ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত করেন। এই কমিশন অনুসন্ধানের পর জারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট যে দিন জার অনুমোদন করে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করবেন ঠিক করলেন ঠিক সেই দিনই তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। এই শোচনীয় ঘটনার ফলে রাশিয়ায় উদারনীতি অনুসারে রাজ্য শাসন করার চেষ্টা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

বৈদেশিক নীতিঃ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার জোরদার নীতির সাহায্যে রাশিয়াকে প্রাক-ক্রিমিয়া যুগের গৌরবে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন এবং প্যারিসের সন্ধিপত্রের রুশ বিরোধী শর্তগুলি তিনি ভেঙে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হলেন।

প্রথমে তিনি ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হল। বল্‌কান অঞ্চলে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থ ও রাশিয়ার স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী হওয়ায় তিনি অষ্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতা স্থাপনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। ফ্রান্সের সাথেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠল না। ঠিক এই সময় প্রাশিয়া রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে ইউরোপে প্রাশিয়া রাশিয়ার মিত্র রাষ্ট্র রূপে পরিণত হয়।

কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পর জার আলেকজাণ্ডার বল্‌কান অঞ্চল তথা তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি নজর দিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বল্‌কান অঞ্চলে তুরস্কের কুশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ বিদ্রোহ করে। তুরস্কের সুলতান বুলগেরীয়দের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাশিয়া এককভাবে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হল। সানস্টেফানোর সন্ধি-দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনায় রাশিয়ার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল। রাশিয়া বাটুম, কারস, বেসারাবিয়া ও দেব্রুদজা তুরস্কের নিকট হতে আদায় করল এবং দানিয়ুব হতে ইজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য স্থাপিত হল। সানস্টেফানোর সন্ধি জার আলেকজাণ্ডারের জোরদার পররাষ্ট্রনীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

রাশিয়ার এই বিরাট সাফল্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে গ্রেট বৃটেন ও অষ্ট্রিয়া ভীত হল এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার হুমকি দেখাল। বিসমার্কের জার্মানীও রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল না। ফলে জার আলেকজাণ্ডার সমস্ত পরিস্থিতিটি বিবেচনার জন্য ইউরোপীয় শক্তিসমূহের এক বৈঠক আহ্বান করতে সম্মত হলেন। ফলে বার্লিন নগরে একটি বৈঠক বসল (১৮৭৮)। এই বৈঠকে সানস্টেফানোর সন্ধি বাতিল বলে গণ্য হল। এক নতুন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। এটিকে বার্লিনের সন্ধি বলে। বুলগেরিয়া হতে রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হল। অবশ্য রাশিয়া বেসারাবিয়া, কারস্‌, বাটুম ও আর্মেনিয়ার কিছু অংশ পেল।

বার্লিন সন্ধির ফলে রাশিয়ার সাথে জার্মানীর সম্পর্কে ভাঙন দেখা গেল। বিসমার্ক রাশিয়াকে ছেড়ে অষ্ট্রিয়াকে প্রকৃত বন্ধু হিসেবে মনে করলেন এবং অষ্ট্রিয়ার সাথে

দ্বি-শক্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত করলেন। জার আলেকজাণ্ডার নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন না, ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার সম্বন্ধ যাতে স্থাপিত হতে পারে তার সূচনা তিনি করে যান।

বার্লিন সন্ধির ফলে বল্‌কান অঞ্চলে রাশিয়ার সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে গেল। জার আলেকজাণ্ডার এতে নিরুৎসাহ হলেন না। তিনি সুদূর প্রাচ্যে এবং মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হলেন। চীনের সাথে এক সন্ধি স্বাক্ষরিত করে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রান্তবর্তী ভ্লাডিভস্টক বন্দর এবং আমুর নদী বিধৌত কয়েকটি অঞ্চল রাশিয়ার অধিকারে আনেন। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাজনীতিতে রাশিয়া এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এছাড়া মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রাশিয়া নিজের আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ক্রমে এসব অঞ্চল রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং রুশ সাম্রাজ্যের সীমানা পারস্য ও আফগানি-স্তানের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডার (১৮৮১ – ১৮৯৪): দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করে বিপ্লবীরা মনে করেছিল যে রাশিয়ায় তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু ঠিক এর বিপরীত হল। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিতে বিশ্বাসী প্রথম পুত্র তৃতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার সিংহাসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে পরিবর্তন এল। নূতন জার স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের কোন প্রয়োজন নেই বলে মনে করতেন। রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর অনমনীয় ধারণা ছিল এবং তাঁর মধ্যে কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির অভাব দেখা যায়। তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসন, ভোটাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন একেবারেই পছন্দ করতেন না।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের নীতি ও চরিত্র

বিপ্লবী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিদের বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লুপ্ত হল। শ্রমিক-কৃষকদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা হল। জেমস্টভোগুলির ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া হল; গরীবদের নিকট শিক্ষার পথ রুদ্ধ করা হল। ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হল। সংক্ষেপে, তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক অভিশাপ নিয়ে আসে।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে অবশ্য শিল্পায়নের গতি দ্রুততর হয়। এর জন্য অবশ্য জার দায়ী ছিলেন না, দায়ী ছিলেন অর্থমন্ত্রণালয়ের প্রধান কউন্ট উইটে

(Witte)। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাশিয়ায় শিল্পায়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। নূতন নূতন রেলপথ স্থাপিত হয়। শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিল্পের কেন্দ্রীকরণ শুরু হয়। ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তৈল শিল্পে রাশিয়ার উন্নতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিল্প-সংরক্ষণ নীতিও রাশিয়া গ্রহণ করে।

বৈদেশিক নীতি

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বের শেষের দিকে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর সঙ্গে **রিইনস্যুরেন্স চুক্তি** পুনরায় স্বাক্ষরিত না হওয়ায় রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে এক মিত্রতা মূলক চুক্তি সম্পাদন করে (১৮৯৩)। একে **দ্বিশক্তি চুক্তি** বলা হয়। এই দ্বিশক্তি চুক্তি ইউরোপের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা ইউরোপ দুটি শিবিরে বিভক্ত হল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার অবশ্য জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ নীতি গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন অধিকার করেন।

একাদশ অধ্যায়

নিকট-প্রাচ্য সমস্য (১৮৫২-১৯১৯)

সূচনা: সতের হতে বিশ শতকের দু দশক পর্যন্ত তিনশো বছরের কিছু বেশি ধরে ইউরোপের নিকট-প্রাচ্য সমস্যা বারবার দেখা দিয়েছিল। নিকট

নিকট প্রাচ্য কাকে বলে

প্রাচ্য বলতে ইউরোপীয়রা প্রধানতঃ কৃষ্ণসাগর—বল্কান—আড্রিয়াটিক ও পূর্ব ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলটিকে বুঝাতো। নিকট-প্রাচ্য সমস্যা একান্তভাবে ইউরোপের সমস্যা। আমাদের নিকট এটি নিকট-প্রাচ্য সমস্যা নয়, কারণ যে অঞ্চলগুলি নিকট-প্রাচ্যের আওতায় ছিল সেগুলি আমাদের পূর্ব দিকে অবস্থিত নয়; পশ্চিমেই অবস্থিত।

নিকট-প্রাচ্য সমস্যার উৎপত্তি: মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত তুর্কীরা এককালে

ক্ষয়িষ্ণু অটোম্যান সাম্রাজ্য ও তার বিভিন্ন সমস্যা

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। এটিকে অটোম্যান সাম্রাজ্য বলা হত। আফ্রিকার উত্তর উপকূল মিশর, ট্রিপলি প্রভৃতি অঞ্চল, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বিস্তীর্ণ আরব ভূভাগ এবং টিউনিস, আলজেরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলও এই

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিরাট অটোমান সাম্রাজ্যে ঐক্য বলে কিছু ছিল না। বহু জাতিভিত্তিক এই সাম্রাজ্যের পরতে পরতে যখন ঘুণ ধরল তখনই ইউরোপের 'নিকট-প্রাচ্য সমস্যা' দেখা দিল। এই সমস্যাটিকে অল্প কথায় বলা যায় 'তুরস্ক সাম্রাজ্যের কি দশা হবে ?'

উনিশ শতকে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা ঃ উনিশ শতকে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। এই সময়ে এই সমস্যায় তিনটি নতুন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত তুরস্ক সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতা এবং ইউরোপীয় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অহেতুক এই অঞ্চল সম্বন্ধে আগ্রহী হওয়া, দ্বিতীয়ত তুর্কী সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ সংঘাত, তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বল্‌কান অঞ্চলের খৃষ্টান অধিবাসীদের তুর্কী শাসনের নাগপাশ হতে মুক্তি পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। লর্ড মর্লের কথায় বলা যায় যে, উনিশ শতকের 'নিকট-প্রাচ্য সমস্যা' বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী জাতি, ধর্ম ও স্বার্থের সংঘাতে পরিবর্তনশীল এক জটিল সমস্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিকট-প্রাচ্য সমস্যার বিশেষ চরিত্র

গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ উনিশ শতকের নিকট-প্রাচ্য সমস্যার প্রথম অধ্যায় গ্রীসের স্বাধীনতা-আন্দোলন দ্বারা শুরু হয়।

গ্রীকদের বিদ্রোহের কারণ ঃ গ্রীস তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু তুর্কী সুলতানের অধীনে থাকলেও গ্রীকগণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। তারা ধর্মপালনের যেরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত সেরূপ ক্যাথলিকগণ এই সময় ইংলণ্ডে পেত না। এরূপ শাসনের অধীনে ছিল বলেই গ্রীকরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হল। তারা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করল। এ ছাড়া, এই সময় গ্রীকরা তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজাগ হল এবং তাদের লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হল।

ঘটনা ঃ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীক স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। গ্রীসের বিভিন্ন প্রদেশে গ্রীকরা আন্দোলন আরম্ভ করল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীকরা তুরস্কের বিরুদ্ধে এককভাবে যুদ্ধ করে। ইউরোপের কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র তাদের সাহায্য করতে অগ্রসর হয় নি। তুরস্কের সুলতান গ্রীকদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবার জন্য মিশরের শাসনকর্তা মহম্মদ আলির সাহায্য চাইলেন। মহম্মদ আলির সাহায্যে তুরস্ক যখন এথেন্স দখল করল তখন গ্রীকদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে উঠল। এবার ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া



অটোম্যান সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ১৬৮৩-১৯১৪

সম্মিলিতভাবে তুরস্কের সুলতানকে যুদ্ধ বন্ধ করতে অনুরোধ করল, কিন্তু সুলতান অসম্মত হওয়ায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সম্মিলিত নৌ-বাহিনী **ন্যাভারিনোর** (১৮২৭) জলযুদ্ধে তুরস্ক ও মিশরের সম্মিলিত নৌ-বাহিনীকে ধ্বংস করল। এই পরাজয়ের পরও সুলতান গ্রীকদের স্বাধীনতা স্বীকার করতে রাজী হলেন না। তখন রাশিয়া এককভাবে গ্রীকদের সাহায্যে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে তুরস্ক সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল এবং **এড্রিয়ানোপোল**-এর সন্ধির দ্বারা (১৮২৯) গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র গ্রীস দেশের স্বাধীনতা যাতে বজায় থাকে তার জন্য সচেষ্ট হল।

গ্রীক স্বাধীনতা-সংগ্রামের তাৎপর্য

গ্রীক স্বাধীনতা-সংগ্রাম ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর দ্বারা জাতীয়তাবাদের জয় সূচিত হল। তুরস্কের সম্মানহানি হল এবং তার দুর্বলতা ও অন্তঃসার-শূন্যতা পূর্ণভাবে প্রকাশ পেল।

মহম্মদ আলী : গ্রীক সংগ্রামের সূত্র ধরেই সৃষ্টি হয় মহম্মদ আলী সমস্যা। মহম্মদ আলী ছিলেন মিশরের পাশা বা গভর্নর। মহম্মদ আলী সুলতানের অধীনস্থ পাশা হয়েও তুরস্ক সুলতানের অধীন প্যালেস্টাইন আক্রমণ করেন এবং সিরিয়ার রাজধানী পর্যন্ত দখল করে নিলেন। তাঁকে বাধা দেবার ক্ষমতা সুলতানের ছিল না। তিনি বাধ্য হয়ে রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করলেন। এই ঘটনায় রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনায় ইংলণ্ড প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি ভীত হল এবং আপস মীমাংসার জন্য চেষ্টা করতে থাকল। অবশেষে ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের চাপে পড়ে সুলতানকে গ্রীক সংগ্রামে সাহায্যের প্রতিদান হিসেবে মহম্মদ আলীকে সিরিয়া ছেড়ে দিতে হল। এইবার রাশিয়া তার সাহায্যের পুরস্কার দাবি করল। সুলতান রাশিয়ার দাবি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ফলে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সুলতানের সাথে উন্‌কেয়ার স্কেলেসী (Unkair Skelissi) চুক্তির দ্বারা ঠিক হয় যে দার্দেনেলিস প্রণালীতে রুশ জাহাজ অবাধে যাতায়াত করতে পারবে। যুদ্ধকালে রুশ জাহাজ ভিন্ন অন্য কারও জাহাজ এই প্রণালী দিয়ে যেতে পারবে না। সংক্ষেপে এই চুক্তির বলে রাশিয়া কৃষ্ণ সাগরকে প্রায় রুশ হ্রদে পরিণত করবার সুযোগ পেল।

মহম্মদ আলীর তুরস্ক আক্রমণ ও তার আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

রাশিয়ার সাহায্যের মূল্য

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান ও মহম্মদ আলীর মধ্যে পুনরায় কলহ বাধল। ফ্রান্স এইবার মিশরের দাবি সমর্থন করল। কিন্তু ইংলণ্ড সুলতানের পক্ষ নিল এবং অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার সাহায্যে লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিতে মহম্মদ আলীকে কেবল মাত্র মিশরের পাশা বলে স্বীকার করা হল এবং উন্‌কেয়ার স্কেলেসীর চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া যেসব সুবিধা লাভ করেছিল সেগুলি নাকচ করা হল। অবশ্য বৃহৎ শক্তিগুলি তুর্কী সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা স্বীকার করে নিল।

ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপ ও লণ্ডন চুক্তি (১৮৪ ০)

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-'৫৬): প্রায় দুশো বছর ধরে প্রতি ২০ বছর অন্তর রাশিয়া এবং তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ ঘটেছিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধল সেটি হচ্ছে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে নবম যুদ্ধ। কিন্তু এই যুদ্ধটি পূর্বেকার যুদ্ধগুলি হতে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। এই যুদ্ধে তুরস্ক, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষ অবলম্বন করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জার নিকোলাসকে নির্বান্ধব অবস্থায় এই সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। এমন কি যে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে তিনি ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের (১৮৪৮) হাত হতে রক্ষা করেন সেই অকৃতজ্ঞ সম্রাট জার নিকোলাসকে কোনরূপ সাহায্য করলেন না। সংক্ষেপে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ মুসলমান সুলতানের পক্ষ নিয়ে খৃষ্টান জারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হল।

ভূমিকা

ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ: ঐতিহাসিকগণ নানারূপ কারণ উল্লেখ করে থাকেন। প্রথমতঃ তৃতীয় নেপোলিয়ন রাশিয়ার সাথে ধর্মস্থানগুলির সংরক্ষণের প্রশ্ন নিয়ে বিবাদের মাধ্যমে নিজের সম্মান বাড়াতে চাইলেন এবং গ্রেট বৃটেন ও অষ্ট্রিয়াকে তাঁর দলে টেনে নিকোলাস প্রবর্তিত 'পবিত্র সংঘ' ভেঙে দিতে চাইলেন বা ১৮-৫ খৃষ্টাব্দের ভিয়েনা ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের জন্য তিনি রাশিয়ার সাথে বিবাদ বাধাতে চাইলেন। দ্বিতীয়তঃ, কুচক্রী পামারস্টোন ও স্টাটফোর্ড ডি র‍্যাডক্লিফের ইচ্ছার জন্য এটি দেখা দেয়। এই দুজন ইংলণ্ডের এ্যাবাডিন মন্ত্রিসভার শান্তি নীতি সহ্য করতে পারছিলেন না। এই সরকারকে অপদস্থ করবার জন্য তাঁরা অজ্ঞ অথচ যুদ্ধলিপ্সু জনসাধারণকে উত্তেজিত করলেন এবং ফ্রান্সের সাথে একজোটে একটা যুদ্ধ ঘটাতে চাইলেন। তৃতীয়তঃ, গ্রেট বৃটেন তুরস্ক সাম্রাজ্যে তার বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য শিল্পে সংরক্ষণ নীতির প্রধান

বিভিন্ন মত

পৃষ্ঠপোষক রাশিয়াকে উচিত শিক্ষা দিতে চাইল বলে এই যুদ্ধ দেখা দিল। কিন্তু উপরিউক্ত অভিমতগুলিকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ বলা যায় না। যুদ্ধের আসল কারণ হল জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী রুশবিরোধী তুরস্ক রাশিয়ার দাবিগুলি মানতে রাজী হল না, কারণ সেগুলি তার সাম্রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ফ্রান্স এবং গ্রেট বৃটেন তুরস্কের সাথে যোগ দিল, অষ্ট্রিয়াও এদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারা মনে করল, রাশিয়া এই সুযোগ পেলে এশিয়া মাইনর ও বলকান অঞ্চলে রুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবে।

মূল কারণ

পবিত্র স্থানের কর্তৃত্ব নিয়ে বিবাদ ঃ তুরস্কের ওপর রাশিয়ার দাবি শুরু হল ধর্মস্থানগুলির সংরক্ষণের প্রশ্ন নিয়ে। ফ্রান্স জেরুজালেম ও বেথলেহেমে ল্যাটিন খৃষ্টান চার্চগুলির রক্ষক ছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ফলে এই চার্চগুলির পরিচালনায় ফ্রান্সের পক্ষ হতে গাফিলতি দেখা দেয়। ফলে এই চার্চগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাশিয়ার হাতে চলে যায়। লুই ফিলিপের আমল হতেই ফ্রান্স অবশ্য এই চার্চগুলির ওপর তার পূর্ব প্রভাব ফিরে পাবার চেষ্টা করে। লুই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের ক্যাথলিকদের সন্তুষ্ট করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন এবং এমন কি তিনি এর জন্য রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার মনস্থও করলেন। তুরস্কের রাজধানীতেও ফরাসী ও রুশ কূটনীতিবিদদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। ১৮৫১তে মনে হল ফরাসীদের দাবিই মেনে নেওয়া হবে। এটি বুঝতে পেরে জার নিকোলাস তুরস্কের সুলতানকে ব্যক্তিগতভাবে জানালেন যে তিনি যেন পূর্বাবস্থার কোন পরিবর্তন না করেন। সুলতান এটি গ্রাহ্য না করে ১৮৫২তে ফ্রান্সকে চিঠির মাধ্যমে জানালেন যে তার দাবি মেনে নিতে তিনি রাজী আছেন। সুলতান এটি মেনে নিলেও জেরুজালেমে এটি মানা হল না। ফলে নানারূপ রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হল। ফ্রান্স যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিল। রাশিয়া তুরস্ককে জানাল যে সে যদি পূর্বাবস্থা চালু রাখে তা হলে রাশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করবে।

ফ্রান্সের মনোভাব

১৮৫৩-এর এপ্রিল মাসে রাশিয়া ধর্মস্থান সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে একটি নয়া প্রস্তাব তুরস্কের সুলতানের নিকট পেশ করল। এই প্রস্তাবে গোঁড়া খৃষ্টান চার্চের সর্ববিধ স্বাধীনতা তুরস্ক সরকারকে মেনে নিতে বলা হল। এই স্বাধীনতার আওতায় কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারই অন্তর্ভুক্ত করা হল না, ধর্মযাজকদের নাগরিক স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত করা হল। তুরস্ক রাশিয়ার এই প্রস্তাব মানতে রাজী হল না কারণ এটি তুরস্কের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যাবে।

রাশিয়ার প্রস্তাব

তুরস্ক রাশিয়ার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে রাশিয়া তুরস্কের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং ২৪শে জুন প্রুথ নদী অতিক্রম করবার জন্য তার সৈন্যদলকে নির্দেশ দিল। ইংরেজ ও ফরাসী সরকার নিজ নিজ নৌবাহিনী তুরস্ককে রক্ষা করার জন্য প্রেরণ করল। পামারস্টোনের কথায় এর ফলেই যুদ্ধ অনিবার্য হল।

কূটনৈতিক তৎপরতা : কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বাধল না। বৃটিশ ও ফরাসী সরকার ইতস্তত করতে লাগলেন। শান্তি বজায় রাখবার জন্য নানারূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হল কিন্তু কোনটিই কার্যকরী হল না। এগুলির মধ্যে ভিয়েনা বোঝাপড়া বা এগ্রিমেণ্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নোটটি আসলে তৃতীয় নেপোলিয়নের তৈরি। এই প্রস্তাবে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল তা দূর করার চেষ্টা করা হয় এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার কথাও বলা হয়। ভিয়েনা নোটের খসড়াটি নিকোলাসের নিকট যথাসময়ে পাঠান হল এবং তিনি এটি সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। তুরস্ক সরকার নোটটি অগ্রাহ্য না করে এই নোটটিতে তিনটি পরিবর্তন দাবি করল। তুরস্কের মতিগতি দেখে রাশিয়া আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করল। ফলে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের নীতি সমর্থন করল। ১৮৫৩-র ৪ঠা সেপ্টেম্বর তুরস্কের সুলতান রাশিয়ার নিকট এই বলে এক চরমপত্র পাঠালেন যে রাশিয়া যদি পনের দিনের মধ্যে দানিয়ুব অঞ্চল ত্যাগ না করে তাহলে তুরস্ক যুদ্ধের পথই বেছে নেবে। বলা বাহুল্য, রাশিয়া তুরস্কের চরমপত্র গ্রাহ্য করল না। ২১শে অক্টোবর তুরস্ক বাটুম অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু করল। তুরস্কের অনুরোধে বৃটিশ ও ফরাসী নৌবাহিনী দার্দেনেলিস প্রণালীর দিকে এগিয়ে গেল এবং কনস্টাণ্টিনোপলকে ঘিরে থাকল। অন্যদিকে রাশিয়া প্রথমে দানিয়ুব অতিক্রম করল না, তুরস্কই দানিয়ুব অঞ্চলে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করল এবং দুটি ছোটখাটো যুদ্ধে জয়ী হ'ল কিন্তু সিনোপের নিকট রাশিয়ার নৌবাহিনী তুরস্কের নৌবাহিনীকে ধ্বংস করে দিল। এই নৌযুদ্ধের খবর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এক বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি করল। বৃটিশ জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাইল। এবং ১৮৫৪-এর মার্চ মাসে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধ দুবছর চলবার পর উভয় পক্ষই শান্তি চাইল। অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে চরমপত্র দেওয়ার ফলে রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হল। ইংলণ্ড অবশ্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিল। ফ্রান্স সেবাস্তিপোলের পতনের পর আর যুদ্ধ চালাতে চাইল না। ফলে প্যারিসে শান্তি সম্মেলন ডাকা ঠিক হল। অষ্ট্রিয়া এবং পিডমণ্টও এতে যোগ দিল।

ভিয়েনা নোট

যুদ্ধ শেষ

প্যারিসের সন্ধি: এই সন্ধি অনুসারে কৃষ্ণ সাগরকে সামরিক ঘাঁটিমুক্ত নিরপেক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হল এবং স্থির হল যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের বাণিজ্য-জাহাজ এই অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারবে। রাশিয়া এবং তুরস্ক কেউই এই অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি বা দুর্গ তৈরী করতে পারবে না। দানিয়ুবকে আন্তর্জাতিক নদী হিসাবে ধরা হল। দার্দেনেলিস প্রণালী দিয়ে সব রাষ্ট্রের জাহাজই যাতায়াত করতে পারবে বলে ঠিক হল। রাশিয়াকে তুর্কী সাম্রাজ্যের খৃষ্টান জনগণের রক্ষণাবেক্ষণের দাবি ত্যাগ করতে হল। ওয়ালাসিয়া ও মোলডাভিয়ার ওপর রুশ আধিপত্য দূর করা হল এবং দক্ষিণ বেসারাবিয়া তাকে ছেড়ে দিতে হল। তুর্কী সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্ব সম্মিলিত ভাবে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি গ্রহণ করল এবং তুরস্ককে ইউরোপীয় রাষ্ট্রজোটের সদস্য করে নেওয়া হল।

প্যারিসের সন্ধির শর্তগুলি

ফলাফল: যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল এরূপ: (১) এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা অধিক হয়েছিল। রাশিয়ার প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য হতাহত হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ক্ষতিও বেশ হয়েছিল। তুরস্কের ক্ষতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। অধিকাংশের মতে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলে এত প্রাণহানি ঘটত না। এর ফলে গ্রেট বৃটেন তার সামরিক বিভাগে সংস্কার সাধন করল। সামরিক চিকিৎসা বিভাগ এই সময় খোলা হয় এবং নতুন নতুন ঔষধের ব্যবহার শুরু হয়। আধুনিক ধাত্রীবৃত্তিও এই সময় হতে চালু হয়। যুদ্ধের ফলে যে অর্থ ঘাটতি হয়েছিল তা দূর করার জন্য আয়ের ওপর কর ধার্য করা হল এবং কালক্রমে প্রত্যেক সরকারেরই এটি একটি আয়ের ক্ষেত্র বলে মনে করা হ'ল। ফরাসী শাসন ব্যবস্থাতেও অনেক পরিবর্তন দেখা দিল।

প্রত্যক্ষ ফল

প্যারিসে যে শান্তি বৈঠক বসল তাতে বৃটেন ও রাশিয়া ছিল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। কারণ ফ্রান্সের সাথে রাশিয়ার ইতিমধ্যেই কিছুটা বন্ধুত্বের ভাব গড়ে উঠছিল। ভবিষ্যতে রাশিয়া যাতে তুরস্কের ওপর আর হামলা করতে না পারে তার জন্য বৃটেন রাশিয়ার ওপর কঠোর শর্ত আরোপ করতে চাইল। রাশিয়ার নিকট হতে দক্ষিণ বেসারাবিয়া তুরস্ক ফিরে পেল। প্যারিসের সন্ধির ফলে রাশিয়াকে দানিয়ুব নদীর উৎস হতে বেশ কিছুটা সরে আসতে হল। পামারস্টোন এটিকে অস্ট্রিয়ার পক্ষে মঙ্গলজনক বলে মনে করলেন। এই ব্যবস্থা অবশ্য বেশি দিন টেকেনি। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া এটি ভেঙে দেয়। দ্বিতীয়ত রাশিয়া তুরস্ক সুলতানের খৃষ্টান প্রজা ও ধর্মস্থানে তার পূর্ব

রাশিয়ার দিক হতে

অধিকার সমস্ত ত্যাগ করল। সমগ্র ইউরোপকে, কেবলমাত্র রাশিয়া নয়, গোঁড়া খৃষ্টানদের এবং রুমানিয়া প্রদেশের রক্ষক বলে স্বীকার করা হল। যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষারও দায়িত্ব নিল। বৃটেন, ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে পৃথক একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হল যেটির দ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করলেন। তৃতীয়তঃ তুরস্কের ওপর রাশিয়ার নৌবলের প্রাধান্য দূর করা হল এই হিসেবে যে কৃষ্ণ সাগরের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করা হল। এই অঞ্চলে রাশিয়া তার নৌবাহিনী রাখতে বা সামরিক তৎপরতা চালাতে পারবে না। কৃষ্ণ সাগর আর রাশিয়ার হ্রদ রইল না। এর দ্বারা রাশিয়ার সম্মানে খুবই আঘাত করা হল। পিটার দি গ্রেট ও ক্যাথারিনের জীবন-সাধনা নষ্ট হবার উপক্রম হল। পনের বছরের বেশি এই নিরপেক্ষতা রইল না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া সুযোগ বুঝে এটি ভেঙে দেয়।

রুমানিয়া সম্বন্ধেও পৃথক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তুরস্কের সুলতান তাঁর সাম্রাজ্যে বিভিন্ন সংস্কার সাধন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর মুসলমান ও খৃষ্টান প্রজাদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আইনকানুন রদ করা হল।

তুরস্কের দিক হতে

অস্ট্রিয়ার দিক হতে দেখলে এই সন্ধিটি তার উৎফুল্লের কারণ হল না। দানিয়ুব অঞ্চলে তার স্বার্থ এই সন্ধির দ্বারা পুরোপুরিভাবে রক্ষিত হল না। রশিয়াকে বেসারেবিয়া ছেড়ে দিতে হওয়ায় অস্ট্রিয়া খুশী হলেও এই অঞ্চলটি রুমানিয়া পায় এবং রুমানিয়ায় জাতীয়তাবাদ ও স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন জোরদার হল এবং পরিশেষে তা অস্ট্রিয়ার শঙ্কার কারণ হল।

অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া

প্রাশিয়ার দিক হতে দেখলে এ সন্ধিতে তার বিশেষ কিছু রদবদল হল না।

ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি হল সত্য কিন্তু স্থায়ী সুবিধা কিছু হল না। বৈঠকের সময় নেপোলিয়ন রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করবার জন্য চেষ্টা করেন এবং একই সাথে গ্রেট বৃটেনের সাথেও পূর্বেকার সম্বন্ধ বজায় রাখতে চাইলেন। সবশেষে ইটালির রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের প্রশ্ন ওঠে।

ক্রিমিয়া যুদ্ধের পরবর্তীকালে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা (১৮৫৬-৮৭৮): ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্যের সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। এই যুদ্ধে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থের জন্য যোগদান করে। তুরস্কের অধীনে যে সকল খৃষ্টান জাতি ছিল তাদের মঙ্গলার্থে কিছুই করা হয় নি। এই জাতিগুলির মধ্যে **স্লাভগণই** শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। স্লাভগণ

বৈশিষ্ট্য

এই সময়ে স্বাধীনতার জন্য জলের ন্যায় রক্তক্ষয় করতেও দ্বিধা করল না। এর ফলে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা আরও জটিল হল।

বল্‌কান রাজ্যগুলির সমস্যা

বল্‌কান অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন : রুমানিয়া : ক্রিমিয়ার যুদ্ধের শেষে তুর্কী সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে গ্রীস, সার্বিয়া এবং মণ্টে-নিগ্রোকে মোটামুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখা যায়। মণ্টেনিগ্রো পুরোপুরি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এরপর মোলডাভিয়া ও ওয়ালাসিয়াকে যুক্ত করে একটি নতুন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এটির নাম হল রুমানিয়া।

খৃষ্টানদের ওপর অত্যাচার

বোস্‌নিয়া হারজেগোভিনা ও বুলগেরিয়াতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম : মোলডাভিয়া ও ওয়ালেসিয়ার এই সাফল্যে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাতে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এই দুটি অঞ্চলে তুরস্ক তার শয়তানী শাসন নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছিল। প্যারিসের সন্ধিতে (১৮৫৬) খৃষ্টান প্রজাদের স্বার্থরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি তুরস্কের সুলতান দিয়েছিল তা পালন করল না। খৃষ্টানদের সম্মান, সম্পত্তি ও নিরাপত্তা তুর্কী শাসকদের ওপর নির্ভর করত। এই অসহনীয় অবস্থা হতে মুক্তি পাবার জন্য এই অঞ্চলের জনসাধারণ সংগ্রামের পথ বেছে নিল। রাশিয়াও তাদের সাহায্য করল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাতে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হল। এই বিদ্রোহ দাবাগ্নির ন্যায় বল্‌কান অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। সার্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রো তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এদিকে বুলগেরিয়ার বিদ্রোহীরা কিছু সংখ্যক তুর্কী কর্মচারীকে হত্যা করলে সুলতান ক্রুদ্ধ হয়ে বুলগেরীয়দের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করল। বুলগেরিয়ার গ্রামে গ্রামে তুর্কী সৈন্যের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসের পাতাকে মসীলিপ্ত করল। বুলগেরিয়ার জনসাধারণের ওপর এই অকথ্য অত্যাচারের খবর যখন ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে পৌঁছাল তখন সেগুলিতে প্রতিবাদের ঝড় দেখা গেল এবং রাশিয়া এককভাবেই তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (১৮৭৭)।

রুশ-তুর্কী যুদ্ধ (১৮৭৭)

এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হল না। ১৮৭৮-এর শুরুতেই রুশ বাহিনী এ্যাড্রিয়ানোপল-এ প্রবেশ করল এবং সুলতান বাধ্য হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করলেন। সান-স্টেফানোর সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

সান-স্টেফানোর সন্ধি (১৮৭৮)

এই সন্ধির দ্বারা সুলতান মন্টিনেগ্রো ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন। বোসনিয়া ও হারজেগোভিনায় অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হল। আর্মেনিয়াতে সংস্কার প্রবর্তন করা হবে ঠিক

হল। রাশিয়া বাটুম, কারস্‌, বেসারাবিয়া ও দোব্রুদজা তুরস্কের নিকট হতে আদায় করল। দানিয়ুব হতে ইজিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য স্থাপিত হল।

বার্লিন সম্মেলন ও বার্লিন চুক্তি: সান-স্টেফানোর সন্ধি রাশিয়ার পক্ষে এক বিরাট জয়লাভ। তুর্কী সাম্রাজ্য ইউরোপ হতে নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হ'ল। রাশিয়ার এই সাফল্যে ইউরোপের অন্যান্য বৃহৎ শক্তি, বিশেষ করে ইংলণ্ড বেশী করে শঙ্কাগ্রস্ত হল এবং রাশিয়ার শক্তি খর্ব করবার জন্য ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী প্রধান মন্ত্রী ডিস্‌রেলী ডার্ডানেলিস প্রণালীতে বৃটিশ নৌ-বাহিনী ও সুয়েজ খালের পথে ভারতবর্ষ হতে সৈন্য প্রেরণ করবার ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে দেখে রাশিয়া সমস্ত পরিস্থিতিটি বিবেচনার জন্য ইউরোপীয় শক্তিসমূহের এক বৈঠক আহ্বান করতে সম্মত হয়। **ফলে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার মীমাংসা করবার জন্য বার্লিন নগরে একটি বৈঠক** বসল (১৮৭৮)। জার্মানীর চ্যান্সেলার **বিসমার্ক** এর সভাপতি হলেন। **সান-স্টেফানোর সন্ধি** বাতিল বলে গণ্য হল। এক নতুন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। এটিকেই Treaty of Berlin বা **বার্লিনের সন্ধি** বলে। ডিসরেলী স্বয়ং এই বৈঠকে যোগদান করেন।

বার্লিন চুক্তি দ্বারা:

(ক) মন্টিনেগ্রো, সার্বিয়া ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করা হল।

বার্লিন সন্ধির শর্তাবলী

(খ) রাশিয়া বেসারাবিয়া, কারস্‌, বাটুম ও আর্মেনিয়ার কিছু অংশ পেল।

(গ) রুমানিয়া দোব্রুদজা লাভ করল।

(ঘ) 'শান্তি ও সুশাসনের স্বার্থে' অস্ট্রিয়াকে বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা শাসন করবার জন্য বলা হল।

(ঙ) সান-স্টেফানোর সন্ধির দ্বারা বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হল। মেসিডোনিয়াকে সুলতানের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হল। পূর্ব রুমেলিয়াকে সুলতানের অভিভাবকত্বে এক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হল। অবশিষ্ট অংশ বুলগেরিয়া নামে অভিহিত হল এবং এখানে সুলতানের প্রভাব নামেমাত্র রাখা হল। ইংলণ্ড সুলতানের সাথে আর একটি চুক্তির বলে সাইপ্রাস দ্বীপটি কুক্ষিগত করল।

গুরুত্ব ও ফলাফল: বার্লিন চুক্তি নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান করতে পারল না। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে এই চুক্তি বল্‌কান জাতিগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী ছিল, যেমন,—

বল্‌কান সমস্যা জটিলতর করল

বেসারাবিয়া অঞ্চল রুমানিয়ার নিকট হতে কেড়ে নিয়ে রাশিয়াকে দেওয়ায় রুমানিয়ার জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ণ হল।

বোসনিয়া ও হারজেগোভিনাকে অষ্ট্রিয়ার শাসনে রাখার ফলে সার্ব জাতীয়তাকে অগ্রাহ্য করা হল।

মেসিডোনিয়াকে তুরস্কের শয়তানী শাসনের কবলে পুনরায় নিক্ষেপ করায় ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ বপন করা হল।

বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিনভাগে ভাগ করায় একদিকে যেমন রাশিয়া ক্রুদ্ধ হল, অপরদিকে বুলগেরীয় জাতীয়তাবাদ সংগ্রামশীল হয়ে উঠল।

সম্মানজনক শান্তি প্রতিষ্ঠা করে নি

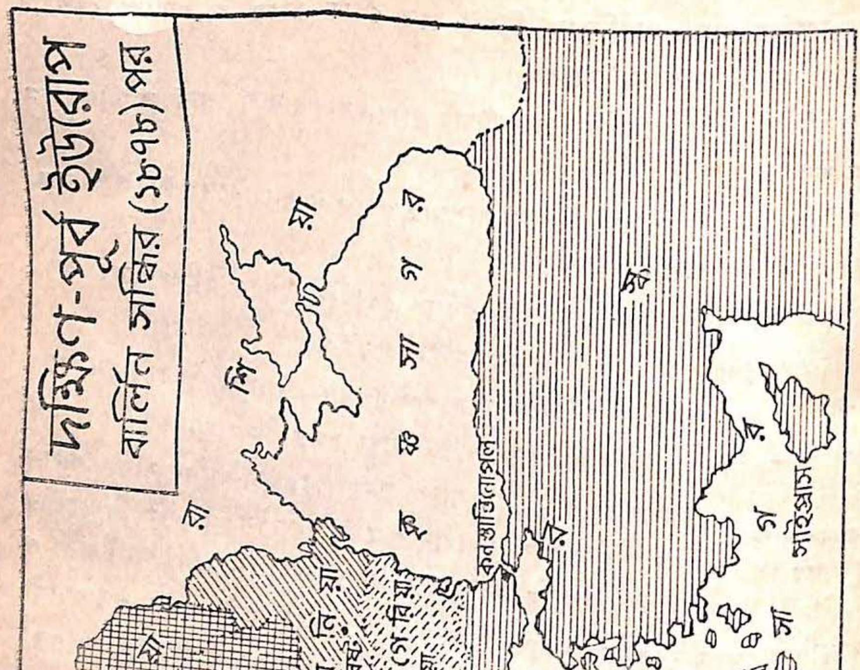
এই সন্ধি অনুসারে ডিসরেলী বিনা যুদ্ধে এবং সসম্মানে শান্তিরক্ষা করেছেন বলে ঘোষণা করেন কিন্তু বার্লিন সন্ধির দ্বারা নিকট প্রাচ্য সমস্যার সমাধান হয় নি। এই অংশের পরবর্তী ইতিহাসই প্রমাণ করে যে, বার্লিন সন্ধি বল্‌কান অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করতে পারে নি সুতরাং ডিসরেলীর পক্ষে সসম্মানে শান্তিরক্ষা করার কথা নিতান্ত দাম্ভিকতা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দূরদৃষ্টির অভাব বোঝায়। এ ছাড়া, এই সন্ধির শর্তানুযায়ী অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ড অহেতুক কিছুটা রাজ্যখণ্ড লাভ করল। তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার নামে এটি রাজনৈতিক দস্যুতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বার্লিন সন্ধি বল্‌কান অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করতে ব্যর্থ ত হলই, বরঞ্চ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীজ এখানেই রোপিত হল। তুরস্ক সাম্রাজ্য অনিবার্য ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পেল না। নতুন নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হল।

কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া

বার্লিন সন্ধির কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়াও ব্যাপকভাবে দেখা দিল। ইংলণ্ড সাইপ্রাস দখল করার ফলে তুরস্ক ক্ষুব্ধ হল। অষ্ট্রিয়াকে সমর্থন করার জন্য জার্মানি রাশিয়ার বন্ধুত্ব হারাল। বিসমার্কের 'ত্রি-সম্রাট চুক্তি' বাতিল হয়ে গেল। জার্মানির সাথে অষ্ট্রিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হল। ফলে এই দেশের মধ্যে দ্বৈত সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। রুশ জার্মান সম্পর্কের অবনতি ঘটার ফলে রুশ-ফ্রান্স সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেল।

যুগটির বৈশিষ্ট্য

বার্লিন চুক্তি হতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালীন নিকট-প্রাচ্য সমস্যার ইতিহাস বার্লিন চুক্তিকে নাকচ করার ইতিহাস। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-রুমেলিয়া বার্লিন চুক্তি অগ্রাহ্য করে বুলগেরিয়ার সাথে যুক্ত হল। বার্লিন চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ এর বিরুদ্ধে কিছুই করল না। এই যুগটিতে আবার বল্‌কান অঞ্চলের স্বাধীনতা-প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির


দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ
বার্লিন সন্ধির (১৮৭৮) পর
কনস্টান্টিনোপল
ভিয়েনা
আড্রিয়াটিক সাগর
ইজিয়ান সাগর
সাইপ্রাস

মধ্যে স্বার্থ সংঘাত দেখা দিল। এবং এই স্বার্থ সংঘাতের ফলে নিজেদের মধ্যে তারা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হল।

বুলগেরিয়াঃ বার্লিন চুক্তিতে বুলগেরিয়াকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। এই কৃত্রিম বিভাগ কিন্তু বেশিদিন টিকল না। স্টামবুলফের নেতৃত্বে বুলগেরিয়া ও পূর্ব রুমেলিয়ার পুনর্মিলনের আন্দোলন দিন দিন জোরদার হল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব রুমেলিয়ার তুর্কী শাসককে বিতাড়িত করা হল এবং পূর্ব রুমেলিয়া বুলগেরিয়ার সাথে সংযুক্ত হল। সার্বিয়া এতে অসন্তুষ্ট হল এই বলে যে এই দুটি রাষ্ট্রের সংযুক্তি বল্‌কান অঞ্চলের ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। এর পর সার্বিয়া বুলগেরিয়া আক্রমণ করে কিন্তু পরাজিত হয় এবং অষ্ট্রিয়ার মধ্যস্থতায় কোনরকমে রক্ষা পায়।

বুলগেরিয়ায় জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম

ইতিমধ্যে বুলগেরিয়াতে রুশ-বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদী দল বুলগেরিয়াকে রুশ-প্রভাবমুক্ত করবার চেষ্টা করে। তাদের দাবি ছিল "বুলগেরিয়া বুলগেরিয়ানদের জন্য।" রাশিয়া এর বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। ফলে বুলগেরিয়াতে রুশপন্থী ও রুশ-বিরোধী দুটি রাজনৈতিক দল দেখা দিল। কিন্তু শেষে জাতীয়তাবাদীরাই জয়ী হল। বুলগেরিয়া হতে রুশ প্রভাব নিশ্চিহ্ন করা হল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়া সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করল এবং তুর্কী সাম্রাজ্যাধীন মেসিডোনিয়ার দিকে নজর দিল।

আর্মেনীয় প্রশ্নঃ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আর্মেনিয়ান খৃষ্টানরা তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। বার্লিন চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, আর্মেনিয়ানদের প্রতি তুর্কী সরকার যাতে ভাল ব্যবহার করে তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হবে। তুরস্ক সরকার তার নিপীড়নমূলক নীতির পরিবর্তন করল না। ফলে আর্মেনিয়ানরা তুর্কী কুশাসন হতে রক্ষা পাবার জন্য বিদ্রোহ ও বৈদেশিক সাহায্যকেই একমাত্র পথ বলে মনে করল। সুলতান অসহায় আর্মেনিয়ানদের হত্যা করবার জন্য তুর্কী সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন। কয়েক মাসে হাজার হাজার আর্মেনিয়ান খৃষ্টানকে হত্যা করা হল। আর্মেনিয়ানদের উত্থান ব্যর্থ হল।

আর্মেনীয় সমস্যা

তুরস্ক সাম্রাজ্যকে এই সঙ্কটময় অবস্থা হতে রক্ষা করার জন্য অবশেষে গণ-আন্দোলন দেখা দিল। তুরস্কের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ একটি বিপ্লবী সংঘ স্থাপন করে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই সংঘের নাম হল 'দি কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যাণ্ড প্রোগ্রেস।' পরবর্তীকালে

নব্য-তুর্কী বিপ্লবের ফলাফল

এটি 'নব্য-তুর্কী' নামে অভিহিত হয়। এনভার পাশা, তালাত এবং জামাল 'নব্য-তুর্কী' আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন।

নব্য-তুর্কী বিপ্লবীরা জাতীয়তাবাদী ছিল এবং তুর্কী জাতি, ইসলাম ধর্ম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা এদের আদর্শ ছিল।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নব্য-তুর্কী বিপ্লবীরা সৈন্যদলের সাহায্যে তুরস্কের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করল এবং এক গণতান্ত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করল।

নব্য-তুর্কী বিপ্লবের সাফল্যকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ও বল্‌কান জাতিগুলি তুরস্কের দুর্বলতা বলে মনে করল। ফলে তারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের স্বার্থ-বিরোধী নীতি নিল। প্রথমে অস্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হারজেগোভিনা নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিল। বুলগেরিয়াও এই সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। তুরস্কের দুর্বলতা ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইটালী লিবিয়া দখল করে নিল। কনস্টান্টিনোপলের সন্নিকটে রোড্‌স ও ডোডেকেনিজ দ্বীপপুঞ্জ ইটালী আক্রমণ করল। নব্য-তুর্কী সরকার এতে অবশ্য বিচলিত হল না। ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকল। এর ভেতর আলবেনিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহ দমন করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করে 'নব্য-তুর্কী' সরকার ইটালীর সাথে সন্ধি করল। এই সন্ধির ফলে ইটালী ত্রিপলি নামক জায়গাটি পেল।

বল্‌কান যুদ্ধ : তুর্কী-ইটালীর যুদ্ধে তুরস্কের সামরিক দুর্বলতা আরও প্রকাশ পেল। এর ফলে প্রথম বল্‌কান যুদ্ধ ত্বরান্বিত হল। প্রথম বল্‌কান যুদ্ধকে 'নব্য-তুর্কী বিপ্লবের' প্রতিক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়। নব্য-তুর্কী সরকারের 'তুর্কীকরণ' নীতির বিরুদ্ধে গ্রীস, সার্বিয়া, মন্টেনেগ্রো, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র 'বল্‌কান সংঘ' গড়ে তুলল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই সংঘ মেসিডোনিয়ার খৃষ্টানদের জন্য তুরস্কের নিকট স্বশাসনের দাবী জানাল; কিন্তু তুরস্ক এটি অগ্রাহ্য করে। ফলে, বল্‌কান সংঘ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এটিকে প্রথম বলকান যুদ্ধ বলা হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাসের মধ্যে 'বলকান সংঘ' তুরস্কের সৈন্য দলকে প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই পরাজিত করল। কেবল মাত্র এড্রিয়ানোপল, স্কুটারি এবং জানিনা তুরস্কের হাতে রইল। তুরস্কের এই পরাজয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি চিন্তিত হল। বিশেষ করে বল্‌কান জাতীয়তাবাদের এই জয় অষ্ট্রিয়াকে খুবই চিন্তায় ফেলল; কারণ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যেও বিভিন্ন জাতি বাস করত। রাশিয়াও বল্‌কান সংঘের এই জয়কে ভাল চোখে দেখল না। সার্বিয়া যাতে এড্রিয়াটিক সাগরের নিকবর্তী অঞ্চল না পায় তার জন্য অষ্ট্রিয়া চেষ্টা করল, এবং এই

প্রথম বল্‌কান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল

অঞ্চলে আলবেনিয়া নামে এক নতুন জাতীয়-রাষ্ট্র যাতে স্থাপিত হয় তার জন্য চেষ্টা করল। আর বুলগেরিয়া যাতে কনস্ট্যান্টিনোপল দখলে না রাখতে পারে তার জন্য রাশিয়া চেষ্টার ত্রুটি করল না। এসব চেষ্টার ফলে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন চুক্তি দ্বারা প্রথম বল্‌কান যুদ্ধের অবসান ঘটল। কনস্ট্যান্টিনোপল তুরস্কের অধীনে রইল। আলবেনিয়া নামে এক নতুন রাষ্ট্র স্থাপিত হল এবং গ্রীস ক্রীট দ্বীপ পেল।

দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ: লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ঠিক সাথে সাথেই 'বলকান সংঘ' ভেঙে গেল এবং বলকান রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধে লিপ্ত হল। এর ফলে দেখা গেল **দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ**। এই যুদ্ধের কারণ হল সার্বিয়া কর্তৃক ম্যাসিডোনিয়া দখলে রাখা, বুলগেরিয়ার এড্রিয়ানোপল না-পাওয়া এবং গ্রীসের স্যালোনিকা অধিকার। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বুলগেরিয়া তার পূর্বতন মিত্র সার্বিয়া ও গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। গ্রীস ও সার্বিয়ার পক্ষ নিয়ে তুরস্ক বুলগেরিয়া আক্রমণ করল। রুমানিয়াও বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে গেল। দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধের ফলে লণ্ডন চুক্তি বাতিল হয়ে গেল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাল না। কারণ তারা একে অন্যকে সন্দেহ ও ভয় করছিল। তারা জানত যে বল্‌কান যুদ্ধে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র লিপ্ত হলে 'বলকান যুদ্ধ' ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হবে। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া একদিকে হবে এবং ফ্রান্স ও রাশিয়া অপরদিকে থাকবে।

কারণ ও ফলাফল

এদিকে দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধে বুলগেরিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট বুখারেস্ট সন্ধিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল। এই চুক্তির ফলে বুলগেরিয়াকে প্রথম বল্‌কান যুদ্ধে-পাওয়া স্থানগুলির অর্ধেকেরও বেশি ছেড়ে দিতে হল।

দুটি বলকান যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আরও জটিল ও ঘোরাল করল। কোন পক্ষই বিশ্বাস করল না যে চুক্তির শর্তগুলি টিকে থাকবে। সার্বিয়া মনে করতে থাকল যে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারাই বোসনিয়ার সার্বদের মুক্ত করা যাবে। বুলগেরিয়া তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মনে প্রাণে ধ্বংস কামনা করতে থাকল। তুরস্ক অষ্ট্রিয়াকে তার সম্ভাব্য মিত্র বলে মনে করল। রাশিয়া তুরস্কের দুর্বলতা দেখে নিজেকে বল্‌কান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টায় থাকল এবং বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিয়া ও রুমানিয়াকে সাহায্য করবার মনস্থ করল। অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বল্‌কান যুদ্ধ দুটি নিকট-প্রাচ্য সমস্যার কোন সমাধান করতে

যুদ্ধ দু'টির প্রতিক্রিয়া

পারল না, বরঞ্চ এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশ এরূপ অবস্থায় নিয়ে গেল যার ফলে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ দেখা দিল।

ইউরোপের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯-এর মানচিত্রে বলকান অঞ্চলে প্রকৃত জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে উঠল। সার্বিয়া রাষ্ট্রটি বর্ধিত হয়ে যুগোশ্লাভিয়া নামে আত্মপ্রকাশ করল। রুমানিয়ার আয়তন বৃদ্ধি পেল। বুলগেরিয়ার আয়তন কমে গেল। পরিশেষে বলা যায়, যেসব কারণে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেগুলি দূরীভূত হওয়ায় সমস্যা আর রইল না।

দ্বাদশ অধ্যায়

আফ্রিকা ও এশিয়ায় ইউরোপের সম্প্রসারণ (১৮৫০-১৯১৪)

ইউরোপের বাইরে ইউরোপের বিস্তৃতি উনবিংশ শতাব্দীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহের পরেই ইউরোপের প্রসারের প্রথম পর্ব শুরু হয়। ফলে, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া—এই তিনটি মহাদেশে ইউরোপীয়গণ দলে দলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। তার ফলে এই মহাদেশগুলি ইউরোপীয়দের বাসস্থানে পরিণত হয়। এশিয়া মহাদেশে কিন্তু ইউরোপীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করে নি। এর প্রধান কারণ এশিয়ার সকল অঞ্চলই ঘন বসতিপূর্ণ, সে কারণে এশিয়ায় ইউরোপীয়গণ সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিই গ্রহণ করেছিল। আফ্রিকায় অবশ্য এ নীতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

সূচনা

ইউরোপীয় বিস্তার নীতির কারণঃ উনিশ শতকে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বাইরে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যেন সাড়া পড়ে গেল। এর একাধিক কারণ অবশ্য ছিল।

অর্থনৈতিক কারণঃ ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের ফলে কলকারখানাগুলির জন্য প্রচুর কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল। সাম্রাজ্য থাকলে কাঁচামাল অল্প মূল্যে পাওয়া সম্ভব। অবশ্য কলকারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যগুলিও বিক্রয় করা প্রয়োজন। সাম্রাজ্য থাকলে এগুলি বিক্রয়ের খুব সুবিধা এবং প্রচুর লাভে বিক্রয় করা

যায়। সেজন্য এই সময় উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্য বিস্তার পূর্বাপেক্ষা অধিক বেশি লাভজনক হয়ে উঠল। এ কারণে এশিয়া ও আফ্রিকার উর্বর ও দুর্বল দেশগুলির প্রতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি পড়ল এবং এই দেশগুলিকে নিজ নিজ আয়ত্তাধীনে আনবার জন্য ব্যগ্র হল।

রাজনৈতিক কারণ ঃ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এই সময় সাম্রাজ্য স্থাপনে পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। সাম্রাজ্য ও বিদেশে সামরিক ঘাঁটি রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করে বলে তারা মনে করল। এই মনোবৃত্তির ফলে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হল।

সামাজিক কারণ ঃ শিল্প-বিপ্লবের ফলে এই সময় ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই বেকার-সমস্যা দেখা দেয়। সাম্রাজ্য স্থাপন তখনকার দিনে বেকার সমস্যার অন্যতম সমাধান বলে বিবেচিত হ'ত।

এই সময় পবিত্র খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি চেষ্টা করে। ইউরোপীয়গণ মনে করত যে কালো চামড়ার লোকেরা অত্যন্ত অসভ্য ও অনুন্নত। তাদের ধর্মমত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। অতএব শ্বেতাঙ্গ লোকদের অধীনে এলে এবং তাদের ধর্মমত গ্রহণ করলে কালো চামড়ার লোকেরা সভ্য হয়ে প্রগতির পথে অগ্রসর হবে। এইভাবে প্রগতির নামে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করা হয়। সে কারণে খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজে একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করে।

কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলেও সাম্রাজ্য বিস্তারের সুবিধা হয়। বিজ্ঞানের কল্যাণে রেল, স্টীমার, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী যেন ছোট হয়ে গেল। দেশে-বিদেশে যাতায়াত অবাধ এবং সংবাদ আদানপ্রদান সহজ হ'ল। কোন দেশই আর বিচ্ছিন্ন থাকতে পারল না। ইউরোপীয়গণের পক্ষে পৃথিবীতে অগম্য স্থান বলে কিছু রইল না।

ফলাফল ঃ (ক) ইউরোপীয়গণের জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ নিয়ে কাড়াকাড়ি ও সংঘর্ষ দেখা দিল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র জার্মানী ও ইটালীর ঈর্ষার পাত্র হ'ল। (খ) যে সকল ইউরোপীয় রাষ্ট্র সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তারা তাদের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশগুলির প্রজাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। এর ফলে শোষিত ও লাঞ্ছিত জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকা যে ঐক্য ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছে তা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির আধিপত্য স্থাপন

ভারতবর্ষ : উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতে ইংরাজ শক্তি সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। লর্ড ড্যালহাউসির (১৮৪৮-১৮৫৬) উদ্দেশ্যই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা। যুদ্ধের দ্বারা তিনি সমগ্র পঞ্জাব ইংরাজ অধিকারে নিয়ে আসেন এবং ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ জয়ী হলে ড্যালহাউসি এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা ব্রহ্মদেশের পেগু প্রদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। তিনি জোরজবরদস্তি করে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য অধিকার করে ভারতে বৃটিশ রাজ্যসীমা বাড়ান। সিকিম রাজ্যের কতকাংশ দখল করে নেন। অযোধ্যা প্রদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। কর্ণাট ও তাঞ্জোর রাজ্যও ইংরাজ অধিকারে চলে আসে। তাছাড়া, সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্যেও বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর লর্ড লিটনের আমলে আফগানিস্তানে রুশ প্রভাবের প্রতিষেধক হিসেবে কোয়েটাকে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বৃটিশ বেলুচিস্তান নামে একটি পৃথক অঞ্চল সৃষ্টি করা হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিনের আমলে ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা হারায়। এটিকে ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত করা হল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতের অংশ হিসেবে শাসিত হয়।

পারস্য : উনিশ শতকের গোড়াতেই পারস্যের প্রতি রাশিয়া ও বৃটেন মনোযোগী হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হতে বৃটেন পারস্যের অর্থনীতিক শোষণ সুরু করে। রাশিয়া বৃটেনের দেখাদেখি পারস্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নেয়। বিদেশীদের এই প্রভাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হয়। রাশিয়া ও বৃটেন একজোটে এই আন্দোলন দমন করে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী স্থাপিত হবার ফলে প্রকারান্তরে পারস্য দুটি অঞ্চলে বিভক্ত হল—উত্তরাঞ্চল রইল রাশিয়ার প্রভাবে এবং দক্ষিণাঞ্চল রইল বৃটেনের প্রভাবে।

মালয় উপদ্বীপ : উনিশ শতকের প্রথম হতেই এই অঞ্চলে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮১৯-এ সিঙ্গাপুরের পত্তন ঘটে। এরপর হতেই একেএকে মালয় উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশ ইংরাজেরা দখলে আনতে থাকে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ওই বছরে মালয়কে একটি পৃথক রাজকীয় উপনিবেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে মালয় উপদ্বীপে বহু স্বাধীন রাজ্য থেকে যায়। ইংরাজ ছলে-বলে-কৌশলে এইসব দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিজের অধীনে আনতে সমর্থ

হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মালয় উপদ্বীপ সম্পূর্ণভাবে ইংরাজদের অধিকারে চলে আসে। বেশ কয়েকটি রাজ্য নিয়ে বৃটিশ মালয় গড়ে ওঠে। এগুলি হল— সিঙ্গাপুর, পেনাং, মালাক্কা, পেরাং, সেলাঙ্গার, পাহাড়, জহোর, খেদা, কেলনিটান ইত্যাদি।

সুমাত্রা, জাভা, বালিদ্বীপ ইত্যাদি : এই অঞ্চল বহুদিন ধরে ডাচ অধিকারে ছিল। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এই অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত হয় যার নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি ডাচরা এই অঞ্চলে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপিত করে এবং কালক্রমে এই অঞ্চলে ডাচ শাসন (হল্যাণ্ডের) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বলিদ্বীপে ডাচ শাসন পুরোপুরিভাবে প্রবর্তিত করা হয়। এই অঞ্চলের নাম দেওয়া হয় ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ-এর নিকটবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে অবশ্য বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে সারাওয়াক ও উত্তর বর্ণিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইন্দোচীন : উনিশ শতকের প্রথমদিকে সমগ্র ইন্দোচীন শাসন করতেন আন্নামের সুলতান। এই অঞ্চলটিতে চীনা সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায় এবং আন্নামের সুলতান চীন সম্রাটের প্রতি আনুগত্য দেখাতেন। ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ন এই অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কালক্রমে সমগ্র ইন্দোচীন (আন্নাম, কাম্বোডিয়া, কোচিন চীন এবং টংকিং) ফরাসী অধিকারে চলে যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লাওসে ফরাসী প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চীন : উনিশ শতকের বহু পূর্বেই পর্তুগীজ নাবিকরা চীনের উপকূলবর্তী মাকাও এবং ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকরা ক্যাণ্টন নামক স্থানে বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থাপন করে। চীনের সম্রাট কিন্তু এই বিদেশীদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা বিশেষ ছিল না-বলে বিদেশী বণিকরা নিজেদের খেয়াল-খুসী অনুযায়ী ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে। উনিশ শতকের সুরুতেই চীন সম্রাট নিজ দেশে আফিম বিক্রি বন্ধ করে দেন। কিন্তু অধিকাংশ চীনাই আফিংখোর ছিল বলে এটি বন্ধ করাতো সম্ভব ছিলই না, বরঞ্চ দিন দিন বাড়তে থাকল। আফিং ব্যবসায়ে ইংরাজরাই অগ্রগামী ছিল। তারা ভারত হতে প্রচুর আফিং নিয়ে চীনে বিক্রি করত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে চীন সরকার যখন বেআইনী আফিং ব্যবসা বন্ধ করতে সচেষ্ট হলেন তখন এই সৎ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইংরাজশক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করল। এটিকে প্রথম চীনযুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে চীন সরকার পরাজিত হল

এবং ইংরাজদের সাথে এক অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হল। এই সন্ধির শর্তানুসারে হংকং দ্বীপে ইংরেজ শাসন স্থাপিত হল এবং দক্ষিণ চীনের পাঁচটি স্থান বিদেশী বণিকদের জন্য খুলে দেওয়া হল। আফিম যুদ্ধে পরাজিত চীন সরকারের দুর্বলতা দেখে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্র সেখানে বাণিজ্য বিস্তারে মনোযোগী হল। ইংল্যাণ্ড ছাড়া নরওয়ে, ফ্রান্স সুইডেন প্রভৃতি দেশের বণিকরা চীনে বাণিজ্য চালাবার সুযোগ পেল। কিন্তু এতে তারা সন্তুষ্ট হল না। তারা বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য চেষ্টা করতে থাকল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সামান্য কারণে ইংরাজ ও ফরাসীরা চীন সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এটিকে দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হল। প্রথম যুদ্ধের ফলে মাত্র পাঁচটি বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল; এবার এগারটি বন্দর তাদের হাতে এল। চীনের আভ্যন্তরীণ নাব্যপথ বিদেশীদের নিকট খুলে দেওয়া হল। শুল্ক ব্যবস্থার ওপর চীন সরকারের অধিকার রইল না এবং বিদেশী শক্তির নাগরিকরা চীনের আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলে চীনকে স্বীকার করতে হল।

পর পর দুটি যুদ্ধে পরাজয় চীন সরকারকে খুবই দুর্বল করে দিল। বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিগুলি চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য স্থাপনে মনোযোগী হল।

এই শক্তিগুলির মধ্যে রাশিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের মধ্যভাগ হতে রাশিয়া অনবরত চেষ্টা করে আমুর নদীর তীরবর্তী অঞ্চল হতে একে একে জাপান সাগরের উপকূল পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং ব্লাডিভস্টক বন্দর স্থাপন করে। চীন সরকারের জাপবিরোধী মনোভাব রাশিয়া নিজের স্বার্থে কাজে লাগায়। ১৮৯৫ হতে কয়েক বছর চীনের ওপর রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব দেখা গেল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে চীনে কনসেশনের লড়াই সুরু হল। রাশিয়া তাড়াতাড়ি পোর্ট আর্থার দখল করে, এই বন্দর ও ডাইরেন সহ সমগ্র অঞ্চলটি লিজ হিসেবে চায়। মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব চীন মেনে নিল। ফ্রান্স য়ুনান ও কোয়ানটুং প্রদেশে বিশেষ সুবিধা আদায় করল। জার্মানী ১৮৯৮-এ কিয়াউ-চাউ ও সানটুং-এ নিজের আধিপত্য স্থাপন করল। ইংল্যাণ্ড কোলুং এবং ওয়েই-হাই-ওয়েকে লিজ হিসাবে গ্রহণ করল এবং ইয়াং সিকিয়াং অঞ্চলে নিজের আধিপত্য স্থাপন করবার অধিকার আদায় করল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সার বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকার মতন চীনকে খণ্ড বিখণ্ড করতে মনস্থ করল। কিন্তু আমেরিকা

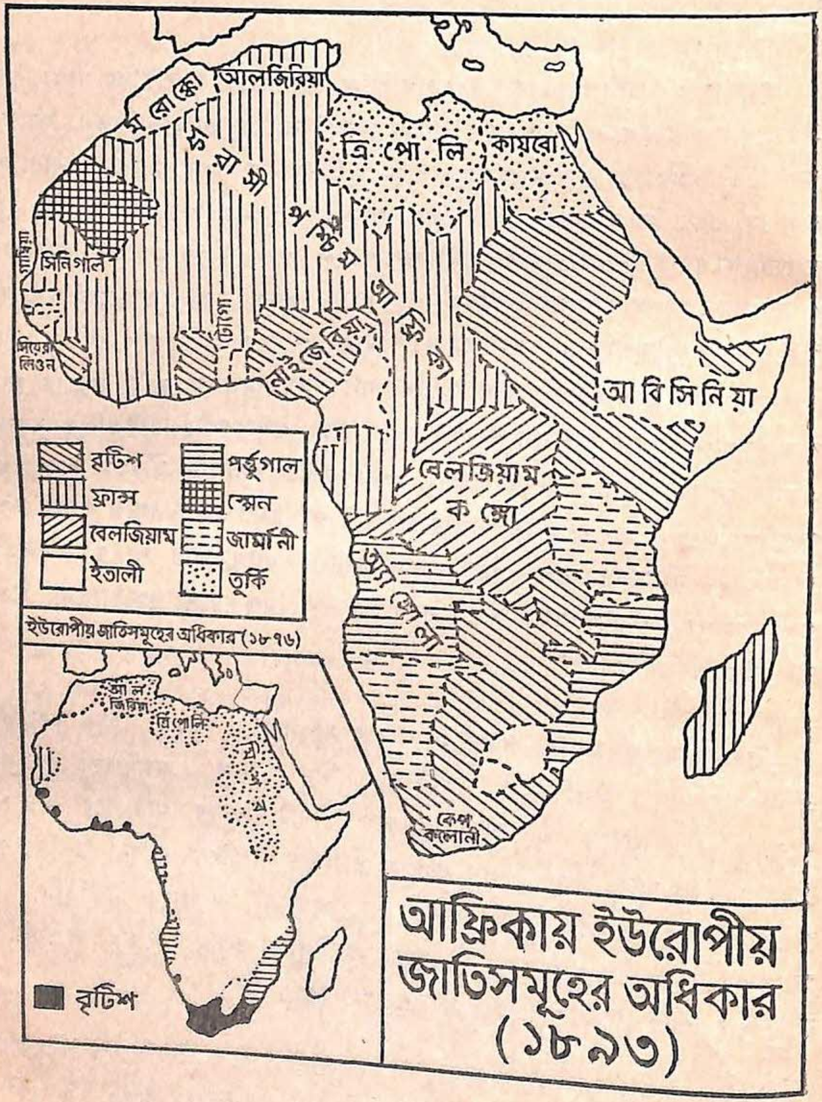
যুক্তরাষ্ট্র নিজ স্বার্থে এর বিরোধিতা করে। ফলে চীনের অখণ্ডতা রক্ষা পেল সন্দেহ নেই।

জাপান: উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপানীরা বিদেশীদের সাথে কোন যোগাযোগ রাখত না। বিদেশীরা জাপানে গেলেই তাদের তাড়িয়ে দিত। অবশেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোমোডোর পেরীর পরিচালনায় যখন মার্কিন নৌবাহিনী জাপানে এল, তখন হতেই বিদেশের সাথে জাপানের সংযোগ স্থাপিত হল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ জাপানী বন্দরে এলে বাধা পাবে না এই প্রতিশ্রুতি পাবার পর পেরী জাপান ত্যাগ করেন (১৮৫৪)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দেখাদেখি বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিগুলি জাপানে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা চায়। জাপানকে বাধ্য হয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলির সাথে অপমানজনক সন্ধি করতে হয়। পরবর্তীকালে জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমকক্ষ এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে। এর ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি জাপানের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হয়। জাপান এই যুদ্ধজয়ের ফলে পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সাথে তার পূর্বের অসম ও অপমানজনক চুক্তিগুলি নাকচ করতে সমর্থ হল এবং নিজ দেশে শুল্ক স্থাপনের উপর তার নিজ কর্তৃত্ব ফিরে পেল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল: প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে। এগুলির ওপর ইউরোপীয় শক্তিগুলি নিজ নিজ আধিপত্য স্থাপন করে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ফিজি দ্বীপটি নিজের অধিকারে আনে। বৃটেনের দেখাদেখি ফ্রান্স ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাহিতি দ্বীপটিকে ফরাসী উপনিবেশে পরিণত করে। এরপর বৃটেন ফ্রান্স ও জার্মানী যথাক্রমে নিউগিনি, ও স্যামোয়া এবং মার্শাল ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জে আধিপত্য স্থাপন করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হাওয়াই, ওয়াপস ও ফিলিপাইনস্ দখল করে।

আফ্রিকা: উনিশ শতকেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টা তীব্রভাবে দেখা দেয়। ইউরোপীয়রা প্রথমে এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় কম-বেশি উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। আফ্রিকা মহাদেশের প্রতি তারা সব শেষে মনোযোগী হয়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আফ্রিকাকে একাধিক কারণে 'কৃষ্ণ মহাদেশ'



আফ্রিকায় ইউরোপীয় জাতিসমূহের অধিকার (১৮৯৩)

বলা হত। এর অভ্যন্তরভাগ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের তখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানা ছিল না। মরু, মালভূমি এবং বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ এ পর্যন্ত নিগ্রোজাতীয় আদিম অধিবাসীদের অধিকারে কেউই হাত দিতে এগিয়ে যায় নি। উনিশ শতকের শেষার্ধে কয়েক জন দুঃসাহসী ধর্মপ্রচারক ও পর্যটকের চেষ্টায় আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ আবিষ্কৃত হল এবং সভ্যজগতের নিকট পরিচিত হল। এর পরেই ইউরোপের সাম্রাজ্য-লোলুপ রাষ্ট্রগুলির শ্যেনদৃষ্টি আফ্রিকার ওপর পড়ল।

আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ আবিষ্কারের ফলে ইউরোপীয় রাজ্যগুলির বিস্তার নীতি

আফ্রিকায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অধিকার স্থাপনঃ লিভিংস্টোন, স্ট্যানলী, ক্রস, বার্টন ও স্পেক প্রভৃতির নাম আফ্রিকা আবিষ্কারের ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁদের সমবেত চেষ্টা সফল হয়েছিল। এরপর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আফ্রিকায় বাণিজ্যকেন্দ্র ও উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এবং সকলেই আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যত্নবান হয়ে ওঠে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে আফ্রিকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ায় বিশেষ অসুবিধা হয়নি। এই মহাদেশকে যখন তারা ভাগ করে নিল তখন ইউরোপ ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মহাদেশ এবং অন্যান্য মহাদেশের ওপর তার আধিপত্য আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপীয়দের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামরিক শক্তি তাদের আফ্রিকা বিভাগে উৎসাহিত করল। উন্নত পর্যায়ের সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা ইউরোপীয়দের সামরিক শক্তির সাহায্যে উপনিবেশ স্থাপনকে জোরদার করে। এর ফলে বিশ বছরের মধ্যেই প্রায় সমগ্র আফ্রিকাকে তারা ভাগাভাগি করে নিতে পারল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আফ্রিকার মানচিত্রের দিকে তাকালে কেবল মাত্র দুটি স্বাধীন দেশ চোখে পড়ে—মরক্কো ও ইথিওপিয়া। পরে এদুটিও আর স্বাধীন রইল না।

আফ্রিকা বিভাগঃ আফ্রিকাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এই অঞ্চলগুলি কিভাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ অধিকারে আনল তার ইতিহাসই আফ্রিকার খণ্ডীকরণের ইতিহাস।

মিশর এবং সুদানঃ মিশর ও সুদান খুবই ঐতিহ্যময় দেশ। প্রাচীনকালে মিশরের নীল নদের তীরে এক অবিস্মরণীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যিশু খৃষ্টের জন্মের বহু বছর পূর্বে। পরবর্তীকালে মিশরের অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং কালক্রমে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এক প্রদেশে পরিণত হয়। উনিশ

শতকের প্রথম হতেই মিশরের শাসনকর্তা তুর্কী সুলতানকে অগ্রাহ্য করতে থাকেন। মিশরের শাসনকর্তা মেহমত আলি খেদিভ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর বংশধররাই মিশরে বংশপরম্পরায় শাসন করবার অধিকারও পান। ইসমাইল যখন খেদিভ ছিলেন সেই সময় সুয়েজ খাল খনন সম্পূর্ণ হয় (১৮৬৯)। একটি কোম্পানীর আর্থিক সাহায্যে এই খনন কার্য চালান হয় এবং এই কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক ছিলেন খেদিভ নিজেই। কিন্তু তিনি এতই বিলাসী ছিলেন যে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং শেষে উপায়ান্তর না দেখে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর সুয়েজ কোম্পানীর শেয়ারগুলি বিক্রয় করতে মনস্থ করেন। এই খবর পেয়ে বৃটেনের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী খেদিভের শেয়ারগুলি গ্রেট বৃটেনের পক্ষে ক্রয় করেন। ফলে একদিকে মিশরে বৃটিশ প্রভাব বিস্তারের সুবিধা হয় এবং অপরদিকে সুয়েজখালের ওপর বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। এদিকে ইসমাইল সুয়েজ কোম্পানীর শেয়ার বেচেও তাঁর ঋণের বোঝা হতে মুক্তি পেলেন না। আর এ ঋণ তিনি করেছিলেন বৃটিশ ও ফরাসী ব্যাঙ্ক হতে। ফলে বৃটেন ও ফ্রান্স ঋণ আদায়ের নামে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মিশরের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করল। এই বছরেই অবশ্য ইসমাইল মারা গেলেন। তারপর ইসমাইলের পুত্র তৌফিক খেদিভ হলেন। তাঁর পক্ষে বিদেশী প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভব হল না। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা আরবী পাশা নামক একজন নেতার নেতৃত্বে বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করবার জন্য বৃটেন এক শক্তিশালী নৌবহর মিশরে পাঠাল। ফ্রান্স অবশ্য এতে যোগ দিল না। বৃটিশ নৌবহর সহজেই আলেকজান্দ্রিয়া দখল করল এবং রাজধানী কাইরোর দিকে এগিয়ে গেল। তেল-এল কবিরের যুদ্ধে আরবী পাশা পরাজিত হলেন। এরপর মিশরে বৃটিশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল।

সুদানে মিশরের ক্ষীণ অধিকার ছিল। মিশরে যখন রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিল ওই সুযোগে মাহদীর নেতৃত্বে সুদান বিদ্রোহ করে। বৃটেন খেদিভের নামে ওই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য সেনাপতি গর্ডনের নেতৃত্বে এক সৈন্যদল পাঠাল। সুদানী বিদ্রোহীরা গর্ডন সমেত এই সৈন্যদলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এরপর ১৮৮৪-তে বৃটেন আর একটি শক্তিশালী সৈন্যদল প্রেরণ করে। এই সৈন্যদল সুদানে সম্পূর্ণ শান্তি আনতে সক্ষম হয় না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কিচেনারের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী অবশ্য সুদান দখল করতে সমর্থ হয়। সুদানে ইঙ্গ-

মিশর যুগ্ম শাসন প্রবর্তিত হলেও প্রকারান্তরে সুদান এক বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হল।

উত্তর আফ্রিকা: মরক্কো, আলজেরিয়া, টিউনেসিয়া ও লিবিয়া নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। উনিশ শতকের সুরু হতেই এক মরক্কো ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যগুলির ওপর তুর্কী সুলতানের আধিপত্য শিথিল হয়ে আসে। আঞ্চলিক শাসনকর্তারাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে এবং জলদস্যু বৃত্তি এবং দাস ব্যবসায় তারা একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে। দারিদ্র্য, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং সার্বিক অনুন্নত অবস্থা এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য ছিল। কালক্রমে ফ্রান্স এই অঞ্চলে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে নিজের আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। ফ্রান্স প্রথমে আলজেরিয়ার শাসন-কর্তার বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে (১৮৩০)। এই সৈন্যবাহিনী আলজেরিয়ার শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করে উপকূলবর্তী কয়েকটি শহর ফরাসী অধিকারে নিয়ে আসে। কিন্তু ১৮৩৭-এ ফরাসী বাহিনী পরাজিত হলে ১৮৪০-এ ফ্রান্স এক বিরাট বাহিনী পাঠিয়ে আলজেরিয়া দখল করে নেয়। ১৮৫০-এর পর হতে বহু ফরাসী আলজেরিয়ায় গিয়ে বসবাস সুরু করে এবং কালক্রমে আলজেরিয়া ফ্রান্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে পরিগণিত হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে টিউনিসে ফরাসী প্রভাব সুরু হয়, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন বৈঠকে গ্রেট বৃটেন টিউনিসে ফরাসী প্রভাব স্বীকার করে নেয় এই সর্তে যে ফ্রান্সও সাইপ্রাসে বৃটেনের প্রভাব স্বীকার করে নেবে। টিউনিস নিয়ে অবশ্য ইটালীর সাথে ফ্রান্সের মতবিরোধ সুরু হয়। পরে অবশ্য এটির মীমাংসা হয়ে যায়।

টিউনিস দখল করবার পর ফ্রান্স মরক্কোর উপর নজর দেয় এবং এই অঞ্চলটি দখল করবার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা সুরু করে। জার্মানী কিন্তু প্রথম থেকেই এই নীতির বিরোধিতা করে এবং ফ্রান্সকে জানিয়ে দেয় যে মরক্কো কোন ক্রমেই গ্রাস করা চলবে না। ইতিমধ্যে তুরস্কের সঙ্গে জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম মধুর সম্পর্ক গড়ে তুললেন এবং নিজেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের রক্ষক বলে ঘোষণা করলেন। বলাই বাহুল্য, মরক্কো তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি অর্ধ-স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই নীতি ঘোষণার পর কাইজার মরক্কোর আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাইজার নিজে মরক্কো ভ্রমণে যান এবং তাঞ্জিয়ারে জার্মান জনসাধারণের নিকট এক বক্তৃতায় জার্মান নীতি ঘোষণা করেন। তিনি মরক্কোর সুলতানের স্বাধীনতা, বাণিজ্যিক অধিকার, মুক্তদ্বার, সমানাধিকার

(ইউরোপীয়দের) এবং সংস্কারের দাবী জানান। এর পরই মরক্কোর প্রথম সংকট দেখা দেয়।

এই ঘটনার পর মরক্কো সমস্যার সমাধান করবার জন্য আল্জেয়ার্সে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে। এই বৈঠকে মরক্কোর সুলতান ফ্রান্সের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নীতির সমালোচনা করলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও এই বৈঠকে যোগদান করল। বহু বাকবিতণ্ডার পর এই বৈঠকের মাধ্যমে মরক্কো সম্বন্ধে একটি সাময়িক আপস হ'ল।

কিন্তু শীঘ্রই মরক্কো নিয়ে পুনরায় সংকট দেখা দিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে মরক্কোয় আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল দেখা দেয়। জার্মানী মরক্কোতে হস্তক্ষেপ করে। ফলে ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে একটি বুঝাপড়া হয়। এতে ঠিক হ'ল যে মরক্কোতে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অধিকার থাকবে, জার্মানী অর্থ নৈতিক সুবিধা পাবে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে মরক্কো নিয়ে পুনরায় সমস্যার সৃষ্টি হ'ল। মরক্কোর ফেজ শহরে গোলযোগ দেখা দিলে ফ্রান্স অন্য শক্তিকে না জানিয়ে একক-ভাবে সৈন্য প্রেরণ করে। ফ্রান্সের এই একতরফা কার্যে জার্মানী ক্রুদ্ধ হ'ল। এবং মরক্কোয় জার্মান স্বার্থ রক্ষা করার জন্য প্যানথার নামক এক যুদ্ধ জাহাজ মরক্কোর বন্দর আগাদিরে প্রেরণ করল। প্যানথার-এর উপর নজর রাখবার জন্য ইংল্যাণ্ড তার নৌবাহিনী ফ্রান্সের পক্ষে প্রেরণ করল। বলাই বাহুল্য যে এই সময় ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল এবং এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একে অপরের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে নজর দিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দেখা দিল আগাদির ঘটনা (Agadir Incident)। কিন্তু এই ঘটনা বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে সক্ষম হ'ল না। জার্মানী,—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার যুগ্ম শক্তিকে ভয় পেল এবং কঙ্গো চুক্তি দ্বারা এই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটাল। মরক্কো ফ্রান্সের অধীনে চলে গেল।

পশ্চিম আফ্রিকাঃ ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা গাম্বিয়া, সিয়ের লেয়ন, গোল্ডকোস্ট, টোগোল্যাণ্ড, নাইজেরিয়া, ক্যামেরানস, রিও-ডি-ওরো ও পর্তুগীজ গিনি নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

উনিশ শতকের পূর্বেই ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্র পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে বাণিজ্যিক কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ করে এবং প্রধানত দাস ব্যবসায় লিপ্ত থাকে। তাছাড়া সোনা, হাতির দাঁত ও তৈলের ব্যবসাও তারা করত। দাস ব্যবসা যখন

তুলে দেওয়া হল তখন অধিকাংশ রাষ্ট্রই তাদের বাণিজ্যিক কুঠি ও দুর্গগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে মুসলমান শাসক ছিল যদিও জনসাধারণ ছিল পৌত্তলিক। উনিশ শতকের সুরুতেই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র হতে এই অঞ্চলে ধর্ম যাজকরা আসতে সুরু করে এবং স্থানীয় লোকেদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন গোল্ড কোস্ট রাজ্যটিকে নিজের উপনিবেশ বলে ঘোষণা করে। এই রাজ্যটির বর্তমান নাম হল ঘানা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বৃটেন লাগোস উপকূল দখল করে। এর পর সিয়ের লেয়ন, নাইজেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল বৃটেনের অধিকারে যায়। তবে পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে বেশি অংশ দখল করে ফ্রান্স। মরেটেনিয়া, সেনেগাল, গিনির কিছু অংশ, আইভরি কোস্ট, ডাহমি, নাইজার প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠল বিরাট ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা। ডাহার হল এই অঞ্চলের রাজধানী। পশ্চিম আফ্রিকায় ক্যামেরানস ও টোগোল্যাণ্ড নিয়ে জার্মান পশ্চিম আফ্রিকা রাজ্যও গড়ে ওঠে। তবে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হলে বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী এই অঞ্চলের জার্মান উপনিবেশ দখল করে নেয়। বৃটেন, ফ্রান্স, ও জার্মানী ছাড়াও স্পেন ও পর্তুগাল এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে।

কঙ্গো অঞ্চল: ফরাসী অঞ্চল, বেলজিয়ান কঙ্গো, এ্যাঙ্গোলা এবং স্প্যানিশ গিনি নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। কঙ্গো অঞ্চল বহুদিন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে এই অঞ্চল কয়েকজন দুঃসাহসিক আবিষ্কারকের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। পর্যটক স্টান্‌লি কঙ্গো নদের গতি প্রকৃতি দেখে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন। তাঁর লেখাকে কার্যকরী করেন বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড। কয়েক বছরের মধ্যে বেলজিয়াম কঙ্গো নদীর অববাহিকায় একটি বিরাট অঞ্চল অধিকার করে এবং এটির নাম দেয় স্বাধীন কঙ্গোরাজ্য। কিন্তু এটি আদৌ স্বাধীন ছিল না। প্রথমে এটি বেলজিয়ামের রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। পরে এটিকে একটি উপনিবেশে পরিবর্তিত করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় বেলজিয়ান কঙ্গো।

আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে বেলজিয়ান কঙ্গো ছাড়া অন্যান্য উপনিবেশ ফ্রান্স প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি গড়ে তোলে। এগুলির মধ্যে ফরাসী নিরক্ষরীয় আফ্রিকা, স্পেনীয় গিনি এবং পর্তুগালের এ্যাঙ্গোলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব আফ্রিকা: কেনিয়া, উগাণ্ডা, ট্যাঙ্গানাইকা, ন্যায়সাল্যাণ্ড ও মোজাম্বিক নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। এটি একটি নিগ্রো অধ্যুষিত অঞ্চল এবং বান্টু জাতিই এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। উনিশ শতকের সুরুতে এ অঞ্চলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে

কেবল মাত্র পর্তুগালেরই কুঠি ছিল। আরবরাই এই অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য চালাত। উনিশ শতকের শেষার্ধে বৃটিশ ও জার্মানরা এই অঞ্চলের দিকে মনোযোগী হয়। জার্মান আবিষ্কারক ডার ডেকেন এই অঞ্চলের প্রতি ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৃটিশ আবিষ্কারক লিভিংস্টোনও এই অঞ্চলে তাঁর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেন। কালক্রমে উগাণ্ডা, কেনিয়া এবং ন্যায়সাল্যাণ্ডে বৃটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানী পূর্ব আফ্রিকায় বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এবং ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের সাথে এক সন্ধি করে এই অঞ্চলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যাতে সীমানা বিরোধ না দেখা দেয় তার ব্যবস্থা করে। পর্তুগাল এই অঞ্চলে মোজাম্বিক রাজ্যটি নিজের দখলে রাখে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ কেপ অব গুড হোপ, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট, নাটাল, দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র, রোডেসিয়া এবং জার্মান দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ (হল্যাণ্ডবাসী) উপনিবেশের অধিবাসীদের বূয়র বলা হ'ত। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ চলবার সময় ইংল্যাণ্ড বূয়র অধ্যুষিত কেপ কলোনী নামক অঞ্চলটির উপর প্রভাব বিস্তার করে। এতে বূয়রদের সঙ্গে ইংরেজদের মনোমালিন্য দেখা দেয়। ইংরেজ আধিপত্য সহ্য করতে না পারায় বূয়রগণ আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নতুন নতুন অঞ্চল আবিষ্কার করে বসবাস করতে স্বরু করে। ইংরেজগণ কিন্তু ছাড়বার পাত্র ছিল না। এই নব-আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলিও তারা নিজেদের অধীনে আনবার জন্য সচেষ্ট হ'ল। এভাবে নাটাল ইংরেজরা দখল করে নিল। বূয়রগণ অরেঞ্জ নদীর তীরবর্তী স্থানে উপনিবেশ গড়ে তুলল। তাও ইংরেজরা গ্রাস করল। অবশেষে বূয়রগণ ট্রান্সভালে বসবাস স্বরু করে। ব্লুমফন্টের কনভেনশন দ্বারা ইংরেজরা বূয়র অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় (১৮৫২)।

এর পর প্রায় ২০ বছর বূয়ররা শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম হয়। এই সময়ের মধ্যে বূয়রগণ তাদের রাজ্যগুলির উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়। এতে ইংরাজদের নজর এ অঞ্চলগুলির উপর পড়ল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা এই অঞ্চলগুলি গ্রাস করবার চেষ্টা করে কিন্তু গ্লাডস্টোন মন্ত্রিসভা বূয়রদের স্বাধীনতা হরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলে বূয়রদের স্বাধীনতা বজায় রইল।

ইতিমধ্যে বূয়র অঞ্চলে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হ'ল। বহু ইংরাজ বূয়র অঞ্চলে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করবার চেষ্টা করলে বূয়রগণ ভীত হ'ল। তারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অব্যাহত রাখবার জন্য ইংরাজ আগন্তুকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখল।

এতে ইংরাজগণ রুষ্ট হয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইংরাজদের সাহায্য চাইল। রোডেসিয়া থেকে ডাঃ জেমিসনের নেতৃত্বে কয়েকশত ইংরাজ ট্রান্সভালে বে-আইনীভাবে প্রবেশ করলে বুয়র সরকার তাদের বন্দী করে ইংরাজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ কিন্তু এদের কোনরূপ শাস্তিই দিল না। বরঞ্চ ট্রান্সভালের ইংরাজগণ যাতে রাজনৈতিক অধিকার পায় তার জন্য বুয়র সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। এবং এর ফলে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বুয়র যুদ্ধ দেখা দিল। বুয়ররা পরাজিত হল।

কিন্তু পরাজিত হলেও ইংরেজরা তাদের বীরত্বে ভীত হল এবং বুয়রদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে তাদের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত করল (১৯০৯-১০)। এইভাবে কেপ কলোনী, নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও ট্রান্সভাল—এই চারটি রাষ্ট্র নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই যুক্তরাষ্ট্রই কালক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার নানা অঞ্চলে বৃটিশ আধিপত্য স্থাপন করে। সিসিল্ রোডস্ ছিলেন কেপ কলোনীর প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সাহায্যে বেচুয়ানাল্যাণ্ড বৃটেনের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হল এবং তাঁর নামানুসারে পরিচিত রোডেসিয়া বৃটেনের অধীনে এল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে টোগোল্যাণ্ড নামক রাজ্যটি বৃটেন অধিকার করল। এইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় সমগ্র অঞ্চলে কেবলমাত্র বৃটেনের আধিপত্যই স্থাপিত হল না, এই অঞ্চল খুব উর্বর ও স্বাস্থ্যকর বলে ইউরোপীয়রা স্থায়িভাবে বসবাস সুরু করল। ফলে আফ্রিকাবাসীরা নিজ দেশে পরদেশী হয়ে গেল।

মাদাগাস্কার: এটি হল সবচেয়ে বড় দ্বীপ। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স এই বিরাট দ্বীপটি নিজের দখলে আনল। এই দ্বীপটির ওপর বৃটেনেরও লোভ ছিল। কিন্তু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাতে বৃটেন মাদাগাস্কারের ওপর তার অধিকারের প্রশ্ন ত্যাগ করে।

ইটালী: ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় ইটালীও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনে তৎপর হয় এবং আফ্রিকায় অবস্থিত এরিট্রিয়া ও সোমিলিল্যাণ্ডে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দের তুরস্কের সাথে যুদ্ধের ফলে ইটালী ত্রিপোলি ও সাইরেনাইকার অধিকার লাভ করে। পরে এ দুটি অঞ্চল একত্রিত করে নাম দেওয়া হয় লিবিয়া।

আফ্রিকা খণ্ডীকরণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বোঝাপড়া:

বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড কঙ্গো অববাহিকার উন্নয়ন এবং আফ্রিকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তাঁর রাজধানী ব্রাসেল্‌স্-এ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এক সম্মেলন ডাকলেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী

ইটালী, এবং রাশিয়া প্রমুখ রাষ্ট্রগুলি এতে যোগ দেয়। এই সম্মেলনের ফলে 'International African Association' নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হ'ল। ঠিক হ'ল এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় ব্রাসেল্‌স্‌ে থাকবে এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রে এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপিত হবে। এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হবে আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু কার্যকালে এই সংগঠন বিশেষ কিছুই করতে পারল না। বরঞ্চ বেলজিয়ামের সাফল্যে উৎসাহিত ও ঈর্ষান্বিত হয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ কঙ্গো অববাহিকার বিভিন্ন অংশের ওপর দাবি জানাতে থাকে। ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং অন্যান্য দেশ হতে অভিযাত্রীদল এসে আফ্রিকায় নিজ নিজ উপনিবেশ স্থাপনে সচেষ্ট হয়। এই অনিয়ন্ত্রিত উপনিবেশ স্থাপনের ধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। বিসমার্ক এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে ঠিক হয় যে, কোন রাষ্ট্র যদি আফ্রিকায় কোন অংশ দখল করতে চায়, সে ক্ষেত্রে দখলকারী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রকে আগে তা জানিয়ে দেবে। কার্যকালে এই সিদ্ধান্ত কিন্তু কোন রাষ্ট্রই মেনে চলেনি এবং রাষ্ট্রগুলি সুবিধামত নিজ নিজ উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং পার্শ্ববর্তী উপনিবেশ-এর অধিকারী ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে সীমান্ত নির্ধারিত করে নেয়। উদাহরণ হিসাবে ইংল্যাণ্ডের সাথে পর্তুগালের, বেলজিয়ামের এবং জার্মানির ; ফ্রান্সের সাথে বেলজিয়ামের, স্পেনের এবং জার্মানির মধ্যে আফ্রিকার উপনিবেশ নিয়ে যে সব চুক্তি হয় সেগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।

বার্লিন সম্মেলন, ১৮৮৪

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার আগে সমগ্র আফ্রিকাকে খণ্ড খণ্ড করে ইউরোপের বিভিন্ন শক্তি নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নেয়। বাকী থাকে শুধু আবিসিনিয়া এবং লাইবেরিয়া।

আফ্রিকা বিভাগের স্বরূপ : এটা ঠিক যে আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধ হয়নি। তবে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য ও স্বার্থ সংঘাত বিশেষভাবে দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ডের সাথে ফ্রান্সের ; ফ্রান্সের সাথে ইটালীর ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাথে জার্মানীর মনোমালিন্য ঘটেছিল। তাছাড়া, স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চলেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে অস্ত্রের সাহায্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আফ্রিকাবাসীদের এই সংগ্রামের কথা কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা ভুলে যান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সশস্ত্র শান্তির যুগ : (১৮৭১—১৯১৪)

সূচনা : ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ইউরোপের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হল। এই সময় জার্মান ও ইটালীবাসীরা নিজ দেশে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করল। জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভাব ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রে পরিবর্তন আনল। ভিয়েনা কংগ্রেসে যে রাজনৈতিক কাঠামো তৈরী করা হয়েছিল তার পরিবর্তন ঘটল। এবং ফলে উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদের জয় সূচিত হল। সমাজতন্ত্রবাদ অবশ্য এখনো শক্তিশালী হয়নি। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে কমিউনের মধ্যে এর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটল।

যুগটির বৈশিষ্ট্য : ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে উদারনৈতিক ভাবধারার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটেছে। ইউরোপের প্রায় সবগুলি দেশেই লিখিত সংবিধান ও পার্লামেণ্ট চালু হয়। ভোটাধিকার বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিকদের অধিকারগুলি জোরদার হয়। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের ফলে এক রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের প্রায় সব রাজ্যগুলি হতেই আইনের ক্ষেত্রে অসাম্য দূর করা হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া হতেও এটি বিদায় নেয়। কিন্তু উদারনৈতিক মতবাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সফল হতে পারেনি—দেশের পার্লামেণ্ট কর্তৃক executive-কে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যেক দেশেই উদারনৈতিক দল এক প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সম্মুখীন হল। উদারনৈতিক দলগুলি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দল। এই নতুন দলটি হল শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের দল বা মুখপাত্র। এই দলটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে দেখা দিলেও এই দল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। ফলে উদারনৈতিক দল লক্ষ্যে ও নীতিতে পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করে কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

জার্মানী ও ইটালীতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় জাতীয়তাবাদের চরম জয় সূচিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই রাষ্ট্র দুটিই জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হয়। ইটালীতে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এই প্রচেষ্টা ইরিডেনটিসম-এর ফলে কিছুটা বাধা পায়। কিন্তু বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মান রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যায়, যার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এবং অস্ট্রিয়ার জাতীয়তাবাদ কিছুটা বাধা পায়। বল্‌কান অঞ্চলে অবশ্য জাতীয়তাবাদ জোরদার হয়।

এই যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রক্ষণশীল দলগুলি যুগোপযোগী হবার চেষ্টা করে। গ্রেট বৃটেনে ডিসরেলীর নেতৃত্বে টোরীদল গণতন্ত্রের পোশাক পরে নেয়। জার্মানীতে এই দল কৃষকদের স্বার্থের দিকে নজর দেয়। ফ্রান্সে প্রজাতান্ত্রিক সরকার টিকে থাকলেও রক্ষণশীল দল ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে এবং বেশ কিছুকাল ধরে প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করে চলে। অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ায় গণতন্ত্রের বিশেষ প্রসার ঘটতে পারেনি রক্ষণশীল দল ও মতবাদ বিশেষ শক্তিশালী ছিল বলে। এই শতকের শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কার্যকরী রূপে বর্তমান ছিল। তবে রাজতন্ত্র তার পূর্বেকার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং প্রত্যেক রাজ্যের সংবিধানের দ্বারা রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয় ও শ্রমিকসংস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিকশ্রেণীই মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায়। রাজতন্ত্রের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর আঁতাত সম্ভব বলে বিভিন্ন লেখক যে মত-প্রকাশ করেছিলেন তা কখনও সম্ভব হয়নি।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর রাজতন্ত্রের সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতদিন স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিল সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার পর রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করবার জন্য চেষ্টা করে। অবশ্য রাশিয়ায় এটির ব্যতিক্রম দেখা যায়। সংক্ষেপে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী তার বিপ্লবী রূপ হারিয়ে ফেলে এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এটি সঞ্চারিত হয়, যদিও শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় নি। একারণেই ১৮৭১-এর প্যারিস কমিউনের অভ্যুত্থানের পর ১৯০৫-এর রাশিয়ার গণ-অভ্যুত্থান পর্যন্ত ইউরোপের কোন রাষ্ট্রেই গণ-অভ্যুত্থান প্রবল আকার ধারণ করেনি।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা ও শিল্পায়নের জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পেল। এসবের জন্য প্রত্যেক দেশে যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দেখা দেয় তার বহিপ্রকাশ ঘটল সাম্রাজ্য সম্বন্ধে। শিল্প বিপ্লব ইউরোপ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

উনিশ শতকে ইউরোপে যে সব রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার ভিত্তি হল অসম্ভব জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে জনসংখ্যা ছিল ১৮৭ মিলিয়ান, ১৮৫০-এ দাঁড়ায় ২৬৬ মিলিয়ন, আর ১৯০০তে ৪০১ মিলিয়ন। সংক্ষেপে ১০০ বছরের মধ্যে জন সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির কারণ

হল মৃত্যুহার হ্রাস, শিল্পায়ন ইত্যাদি। এই সময় আবার শহরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। গ্রাম ছেড়ে লোকে শহরের দিকে পাড়ি দেয়। শহরভিত্তিক সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। ইউরোপ হতে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়রা বসতি স্থাপনের জন্য যাত্রা শুরু করে।

এই যুগে আন্তর্জাতিকতাও বৃদ্ধি পায়। দেশভিত্তিক অর্থনীতির বদলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কথা শোনা যায়—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং বিশ্ব শান্তির কথা এই সময় বিভিন্ন দেশের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল সেগুলিতেও উল্লেখ থাকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই নীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। শিল্পে উন্নতিশীল দেশগুলি (রাশিয়া, জার্মানী ইত্যাদি) শিল্পে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে, ফলে বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নয়নে রাষ্ট্রের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায় এবং শীঘ্রই এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয় এবং একটি রাষ্ট্র অপরটিকে তার শত্রু বলে মনে করতে থাকল।

প্রখ্যাত দার্শনিক ক্রোচে ১৮৭১ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটিকে উদারনৈতিক যুগ (liberal era) বলে আখ্যায়িত করেন। এর অর্থ হল এই যুগে রাজনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক ও উদারনৈতিক প্রথা, প্রতিষ্ঠানগুলি উদারনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যদিও এই যুগে সমাজতন্ত্রবাদ উদারনৈতিক ভাবধারার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দেয় এবং যুগটির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মার্কস্, এঙ্গেলসের বিজ্ঞান-সম্মত সমাজতন্ত্রবাদ ১৮৭১-এর পূর্বেই আত্মপ্রকাশ করে, ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাধারা এটির পরিপুষ্টি ঘটায়। উনিশ শতকের শেষের দিকে মার্কসীয় মতবাদ দুটি খাতে বইতে সুরু করে। একটিকে বলা হয় 'শোধনবাদ' (Revisionism)। এর স্রষ্টা ছিলেন এডোয়ার্ড বার্নস্টেন। মতবাদের দিক হতে শোধনবাদ ইংল্যাণ্ডের ফেবিয়ান সোসাইটির নিকট কিছুটা ঋণী বলে মনে হয়। মার্কসীয় মতবাদের অপর দিকটির রূপ হল বিপ্লবী রূপ। লেনিন এই দিকটির সার্থক রূপায়ণে ব্রতী রইলেন। মার্কসীয় চিন্তাধারায় এ দুটি মতবাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হল, যার রেশ আজও শেষ হল না।

এই যুগটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, আন্তর্জাতিক শান্তি—কিন্তু সশস্ত্র শান্তি; শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয় নি। ১৮৭১ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন যুদ্ধই সংঘটিত হয় নি। ১৮৫৪ হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগটি আমরা পার হয়ে এসেছি, তাতে দেখা যায়

যে এই যুগটিতে বড় বড় পাঁচটি যুদ্ধ ঘটেছিল, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই একাধিক বৃহৎ রাষ্ট্র জড়িত ছিল। কিন্তু এই যুগটিতে ছোটোখাটো যুদ্ধ ঘটে থাকলেও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি তাতে লিপ্ত হয় নি। কারণ হল, এই যুগটিতে ইউরোপে **শক্তির ভারসাম্য** বজায় ছিল। ইউরোপের কোন শক্তি নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করত না, এবং একে অপরের ভয়ে ভীত থাকত। বিসমার্ক যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেটি যুদ্ধনীতি নয়; ফরাসী আক্রমণ হতে নব রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার ব্যবস্থামাত্র। তেমনি ফ্রান্স নিজেকে জার্মান আক্রমণ হতে রক্ষা করবার জন্য বন্ধুর খোঁজে ব্যাপৃত থাকে এবং ঠিক সময়েই রাশিয়ার সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। সংক্ষেপে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মানচিত্র যে রূপ পরিগ্রহ করে ১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত তাতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না, অবশ্য বল্‌কান অঞ্চল ছাড়া। ইউরোপের বাইরে অবশ্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে উপনিবেশ ও বাজার নিয়ে স্বার্থ-সংঘাত গুরুতর রূপ নেয়। আফ্রিকা ও এশিয়ায় এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয়। এই যুগটিতে আবার এশিয়ায় এক নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটে। জাপান পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করে এবং নিজেকে সর্বদিক হতে শক্তিশালী করে তোলে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনকে পরাজিত করে এবং ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া জাপানের নিকট পরাজিত হলে জাপান শক্তিশালী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পরিগণিত হয়। 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ভীতি' বলে জাপানকে মনে করা হতে থাকে।

এই যুগটিতে বার্লিন ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও কূটনীতির কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়—ভিয়েনা ও প্যারিস বার্লিন-এর জৌলুসের নিকট ম্লান হয়ে যায়। শক্তিশালী জার্মানীর—ফ্রান্স বা অষ্ট্রিয়ার শক্তিতে আর ভীত থাকবার প্রয়োজন হল না। তবুও ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়াকে এই যুগের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে মেনে নিতে হয়ই এবং জার্মানীও এটি উপলব্ধি করে। এ কারণে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মও এবিষয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।

জার্মানী

বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতি (১৮৭১—১৮৯০): ১৮৭১ হতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটিকে 'বিসমার্কের যুগ' বলা হয়। এই যুগটিতে জার্মানী ইউরোপের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয় এবং সংক্ষেপে বলতে গেলে এই যুগে বিসমার্ক ইউরোপীয় রাজনীতির পরিচালক ছিলেন। তিনি জার্মানীকে ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেন।

পররাষ্ট্র নীতির উদ্দেশ্য

এই সময় তার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নবগঠিত জার্মান রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করা এবং ফ্রান্সকে প্রতিশোধ গ্রহণে বাধা দেওয়া। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। ফলে বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ফ্রান্স ইউরোপে কোন মিত্র পেল না।

বিসমার্কের চেষ্টায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও জার্মানীর রাজাদের নিয়ে 'ত্রি-সম্রাট সংঘ' গঠিত হল। এই সংঘের উদ্দেশ্য অনেকটা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের 'পবিত্র সংঘের' মত। কিন্তু এই ত্রি-সম্রাট সংঘ কার্যকরী হল না। নিকট-প্রাচ্যে (বলকান অঞ্চলে) রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে স্বার্থ সংঘাত দেখা দেওয়ায় এই সংঘ অকার্যকরী হয়ে পড়ে। বার্লিন কংগ্রেসে (১৮৭৮) বিসমার্ক প্রকাশ্যে অষ্ট্রিয়ার দাবি সমর্থন করলে ত্রিসম্রাট সংঘ ভেঙে যায়। এরপর বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সাথে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত করলেন। এটিকে দ্বৈত সন্ধি বলা হয়। এই চুক্তিটিতে কয়েকটি গোপন শর্ত ছিল। মোটামুটি-ভাবে বলা যায় যে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর মধ্যে গোপন দ্বৈত সন্ধিটি রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধেই সৃষ্ট হয়েছিল। এই দ্বৈত সন্ধিটিতে ঠিক হয় যে রাশিয়া জার্মানি বা অষ্ট্রিয়া যাকেই আক্রমণ করুক না কেন উভয় রাষ্ট্র এক জোটে রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। অন্য কোন শক্তি যদি এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনটিকে আক্রমণ করে তা হলে অপরটি নিরপেক্ষ থাকবে। বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সাথে যে দ্বৈত সন্ধি স্থাপন করলেন তা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অটুট থাকে।

দ্বৈত সন্ধি—১৮৭৯

বিসমার্কের চিরাচরিত নীতি ছিল রাশিয়ার সাথে সদ্ভাব রক্ষাকরা, তা ছাড়া জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে কোন স্বার্থ সংঘাত ছিল না। এই কারণে তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ত্রিসম্রাট সংঘকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। এই সঞ্জীবিত ত্রিসম্রাট সংঘের নাম দেওয়া হল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের 'ত্রিসম্রাট মিতালী।' এই সন্ধিটিও আত্মরক্ষামূলক ছিল। এই সন্ধিতে ঠিক হল যে এক তুরস্ক ছাড়া অন্য কোনও শক্তির সাথে যদি এই তিনটি রাষ্ট্রের যে কোনটির যুদ্ধ সুরু হয় তা হলে অন্য দুটি নিরপেক্ষ থাকবে। তুরস্কের সাথে যুদ্ধ সুরু হলে অবশ্য এই তিন শক্তি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে এবং বলকান অঞ্চলে এই তিন শক্তির মধ্যে কোনটিই নিজের খেয়ালখুশী অনুযায়ী পরিবর্তন আনবে না। তবে এটা মনে রাখতে

পুনরুজ্জীবিত ত্রিসম্রাট মিতালী ১৮৮১

হবে যে ত্রিসম্রাট মিতালী চুক্তিটির দ্বারা জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের দ্বৈত সন্ধি নাকচ হয়ে গেল না।

এরপর বিসমার্ক ইটালীকে দলে টানতে চাইলেন। কিন্তু ইটালীর সাথে অষ্ট্রিয়ার স্বার্থসংঘাত থাকায় এটি সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স যখন ইটালীকে অগ্রাহ্য করে টিউনিস দখল করল, তখন ক্ষুব্ধ ইটালী জার্মানীর সাথে সন্ধি করতে চাইল। কিন্তু বিসমার্ক ইটালীকে অষ্ট্রিয়ার সাথেও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে বললেন। ইটালী নিরুপায় হয়ে অষ্ট্রিয়ার সম্বন্ধে তার পূর্বেকার নীতি ত্যাগ করল এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করল। ফলে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের দ্বৈত সন্ধি **ত্রিশক্তি মৈত্রীতে** পরিণত হল। এই চুক্তি অনুসারে ঠিক হল যে ফ্রান্স যদি ইটালীকে আক্রমণ করে তা হলে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া উভয়েই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইটালীকে সাহায্য করবে। ফ্রান্স যদি জার্মানীকে আক্রমণ করে তাহলে ইটালী জার্মানীকে সাহায্য করবে। একাধিক শক্তি যদি এই তিনটি শক্তির যে কোনটিকে আক্রমণ করে তাহলে তারা একজোটে আক্রমণকারীদের বাধা দেবে এবং অষ্ট্রিয়ার সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধলে ইটালী নিরপেক্ষ থাকবে। এই চুক্তির ফলে ইটালী ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে রেষারেষির ভাব কিছুটা কমে গেল।

ত্রিশক্তি মৈত্রী—১৮৮২

বিসমার্ক জানতেন যে কেবলমাত্র অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর বন্ধুত্ব লাভ করলেই তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না। পূর্ব ইউরোপে জার্মানীর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য রাশিয়ার সাথে তিনি পুনর্মিলনের চেষ্টা করতে লাগলেন, কেননা বলকান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের প্রশ্ন নিয়ে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে মনোমালিন্য দেখা যায় তার ফলে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের 'ত্রিসম্রাট মিতালী' অকার্যকরী হয়ে পড়ে এবং বিসমার্ক বুঝতে পারেন যে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীমূলক চুক্তি সম্ভব নয়। একারণে তিনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সাথে একটি নিরাপত্তাসূচক চুক্তি (Reinsurance Treaty) স্বাক্ষরিত করলেন। এই চুক্তি দ্বারা ঠিক হল যে, জার্মানী কর্তৃক ফ্রান্স আক্রমণ এবং রাশিয়া কর্তৃক অষ্ট্রিয়া আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন শক্তি জার্মানী বা রাশিয়া আক্রমণ করলে তারা পরস্পরের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে।

রুশনীতি

ইংল্যাণ্ডের সাথেও বিসমার্ক বন্ধুত্বভাব বজায় রাখলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের মিশর অধিকার সমর্থন করেন এবং জার্মানী উপনিবেশ চায় না বলে ঘোষণা করেন। ফলে জার্মানীর সাথে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কের অবনতি ঘটল না, বরঞ্চ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হল।

ইংল্যাণ্ডের সাথে সদ্ভাব

বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত এই আলোচনা হতে এটাই বোঝা যায় যে, ১৮৭১ হতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিসমার্কের নেতৃত্বাধীনে জার্মানী ছিল ইউরোপীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র। তবে বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতি ত্রুটিশূন্য ছিল না। তাঁর কূটনৈতিক ব্যবস্থা এত সূক্ষ্ম ও জটিল ছিল যে বিসমার্ক অপেক্ষা কম প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে এটি বজায় রাখা দুঃসাধ্য ছিল।

আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানী একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং বিসমার্ক ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীর শাসনভার কার্যতঃ তাঁর হাতেই থাকে।

বিসমার্ক জার্মানদের মন হতে প্রাদেশিকতা দূর করবার জন্য চেষ্টা করেন এবং তাঁদের মধ্যে যাতে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ দেখা দেয় তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব শক্তিশালী করেন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্রই একই প্রকারের আইন চালু করেন এবং মুদ্রা সংস্কার ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করলেন। সমগ্র দেশে রেলপথের কাজ দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকল। জার্মানীতে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হল। বিসমার্ক কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। অবশ্য জনসাধারণের যাতে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। জার্মানীর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শিল্প-বাণিজ্যে তিনি সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন এবং দেশের শিল্প প্রসারে উৎসাহ দেন।

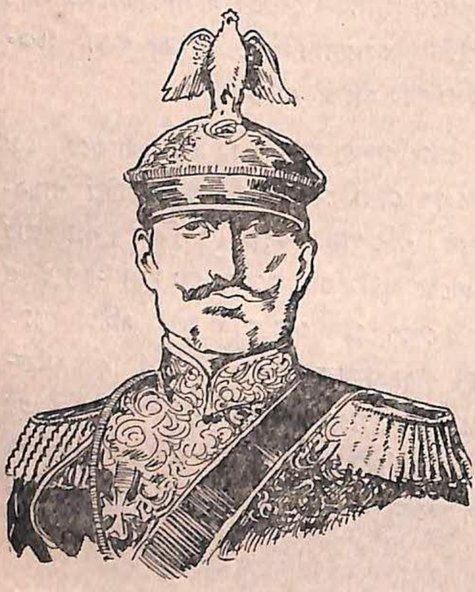
জার্মানির সংহতি রক্ষা

ঔপনিবেশিক-নীতি ঃ তিনি জার্মানিকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' বলে প্রথমে প্রচার করেন এবং এই নীতির ফলে উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু পরবর্তী-কালে শিল্পপ্রসারের ফলে উপনিবেশের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহ দেন; এর ফলে আফ্রিকায় জার্মানীর কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

শেষ জীবন ও মৃত্যু ঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় উইলিয়ম জার্মানীর সম্রাট হন। নূতন সম্রাট খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। বিসমার্কের সহিত তাঁর তীব্র মতভেদ হলে বিসমার্ক পদত্যাগ করেন এবং নিজ গ্রামে চলে যান। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই কর্মবীর দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ববর্তী আট বৎসর তাঁর বাসস্থান রাজনীতি-বিদদের তীর্থস্থান ছিল।

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম ঃ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় উইলিয়ম জার্মানির সম্রাট হন। তিনি খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি বহু বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতেন এবং রাষ্ট্রের খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে খবর রাখতেন। অস্থিরতা তাঁর চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল এবং স্বৈরতন্ত্রে তিনি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি স্বাধীনভাবে বহু কিছু করতে চাইলেন কিন্তু বয়োবৃদ্ধ বিসমার্কের উপস্থিতি তাঁর নিকট বাধাস্বরূপ বলে মনে হল; বিসমার্কের পক্ষে মন যুগিয়ে কাজ করে যাওয়া সম্ভব হল না। তাই তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করলেন।

বিসমার্কের পদত্যাগ



কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম

আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ জার্মান শিল্প-বাণিজ্যকে আরও প্রসারিত করবার জন্য দ্বিতীয় উইলিয়ম এক বিরাট পরিকল্পনা নেন এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের দিকে মন দেন। এর ফলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে জার্মানী বিশেষভাবে এগিয়ে গেল। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দমননীতিরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

বৈদেশিক নীতি ঃ বিসমার্কের পতনের পর কেবলমাত্র জার্মানীর পররাষ্ট্র-নীতিতেই পরিবর্তন এল না; ইউরোপের কূটনৈতিক কাঠামো বদলাল। নতুনভাবে শক্তি-সমবায় গড়ে উঠল এবং অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপ দুটি পরস্পর বিরোধী-সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হল।

বিসমার্কের পতনের পর হতেই কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতিতে বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। এর পেছনে অবশ্য নানারূপ কারণ ছিল। এই সময় জার্মানী শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি করে এবং উন্নতির গতি অব্যাহত রাখবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু এটি বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন ছিল উপনিবেশ বা

বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তনের কারণ

সাম্রাজ্যের। বিসমার্ক শিল্পে উন্নতিশীল জার্মানীর এই চাহিদা যেন বুঝেও বুঝতে চাননি। তিনি বলতেন 'জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ।' কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে জার্মানী পরিতৃপ্ত দেশ ছিল না। শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য তার বাজারের প্রয়োজন যেমন ছিল তেমনি শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী করবার জন্য কাঁচামাল-এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। একারণে দ্বিতীয় উইলিয়ম পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য স্থাপনে বহু অসুবিধা ছিল। পৃথিবীর জনবহুল ও সমৃদ্ধশালী অঞ্চলগুলি ইতিমধ্যেই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার অধীনে চলে গিয়েছিল। সাম্রাজ্য স্থাপনের ব্যাপারে জার্মানী যখন তৎপর হল তখন সে দেখতে পেল যে লাভজনক সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য জায়গা আর পড়ে নেই। স্বভাবতই জার্মানী ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ল। বুঝতে পারল যে উপনিবেশ লাভ করতে হলে সামরিক শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য, আর এই সামরিক শক্তির প্রধান স্তম্ভ হতে হবে নৌবাহিনীকে। একারণে কাইজার জার্মানীর নৌশক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দেন এবং ঘোষণা করেন জার্মানীর ভবিষ্যৎ নৌশক্তির ওপর নির্ভরশীল। এতে ইংল্যাণ্ড ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়ে ফ্রান্স-এর সাথে 'আন্তরিক মিত্রতা' স্থাপন করে। ১৯০৭ খৃঃ রাশিয়ার সাথেও ইংল্যাণ্ড এক বোঝাপড়া করে নেয়।

পররাষ্ট্রনীতিতে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম জটিল বিসমার্কীয় নীতি পরিত্যাগ করে এক সহজ সরল নীতি গ্রহণ করলেন। প্রথমেই তিনি অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে কোনটিকে প্রকৃত মিত্র হিসেবে বেছে নিতে চাইলেন। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য জার্মানীর পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। তাছাড়া অষ্ট্রিয়ানদের সাথে জার্মানদের জাতিগত ও ভাবগত মিল। এ সব কারণে কাইজার রাশিয়া অপেক্ষা অষ্ট্রিয়াকেই পছন্দ করলেন এবং রাশিয়ার সাথে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানী যে চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিল তা আর নতুনভাবে স্বাক্ষরিত করলেন না। ফলে জার্মানী ও রাশিয়ার সাথে বহুদিনের যোগসূত্র ছিন্ন হল।

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সাথে সম্বন্ধ

রাশিয়ার সাথে চুক্তির মাধ্যমে সরাসরি সম্পর্ক ছিন্ন করবার পর উইলিয়াম ইংল্যাণ্ডের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেবার ফলে কাইজার যা করতে চেয়েছিলেন তা সম্ভব হল না, বরঞ্চ তিনি তাঁর প্রজাদের মনোভাব অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

ইংল্যাণ্ডের সাথে সম্বন্ধ

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হতে কাইজার জোরদার পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। তিনি জার্মানীকে কেবলমাত্র ইউরোপেরই সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত করতে চাইলেন না ; বিশ্বরাজনীতিতে জার্মানী যাতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারে সেদিকে নজর দিলেন, জার্মানীকে শ্রেষ্ঠ নৌশক্তিতে পরিণত করতে চাইলেন এবং আটল্যান্টিক মহাসাগরে জার্মান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ তৎপর হলেন।

তুরস্ক নীতি

জার্মানীর প্রভাব যাতে অষ্ট্রিয়া ও তুরস্কের বাইরেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার জন্য তিনি চেষ্টা করলেন এবং 'পূর্ব দিকে অগ্রসর হও' নীতি গ্রহণ করলেন। তুরস্ক সাম্রাজ্যকে সবদিক হতে সাহায্য এবং বার্লিন হতে বাগদাদ পর্যন্ত সরাসরি রেলপথ স্থাপনের কথা ঘোষণা করলেন। ইংল্যাণ্ড এতে ভীত হল এবং ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক তিক্ত হল। কাইজারের আফ্রিকা-

আফ্রিকা নীতি

নীতি দ্বারা এই সম্পর্ক আরও তিক্ত হ'ল। সুদূর প্রাচ্যেও ইঙ্গ-জার্মান স্বার্থ-সংঘাত দেখা দিল। কাইজারের জোরদার বৈদেশিক নীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইঙ্গ-ফরাসী আন্তরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মরক্কো সংকটকালে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। আগাদির ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তাতেও উইলিয়ম বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নি।

উইলিয়ামের পররাষ্ট্রনীতি সহজ ও সরল ছিল। তিনি যাকে মিত্র বলে মনে করতেন তার সাথেই মৈত্রী চুক্তি বজায় রাখেন ; সব রাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি চেষ্টা করেন নি এবং জার্মানীর স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি তাঁর পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত করেছিলেন।

ফ্রান্স

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র (১৮৭১-১৯১৪): ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সেডানের রণক্ষেত্রে

আভ্যন্তরীণ ইতিহাস

প্রাশিয়ার নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন আত্মসমর্পণ করলেন। ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধি অনুযায়ী আলসেস ও লোরেন ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে হয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণও দিতে হয়। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের সাথে সাথে ফ্রান্সে চিরদিনের জন্য রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হল। শাসনতন্ত্র যতদিন না তৈরী হয় ততদিন দেশ শাসনের ভার একটি অস্থায়ী সরকারের ওপর দেওয়া হল।

প্যারিস কমিউন: নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথেই এক রক্তক্ষয়কারী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই গৃহযুদ্ধ Commune নামে পরিচিত। কেবলমাত্র প্যারিসেই এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। অস্থায়ী সরকার এই বিদ্রোহ কঠোর ভাবে দমন করে। পর পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ফ্রান্সে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। এই সাধারণ তন্ত্র তৃতীয় প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত।

১৮৭৫ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় প্রজাতন্ত্র বহু সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং ধীরে ধীরে সমস্যাগুলির সমাধান করে।

ঔপনিবেশিক নীতি: তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের আমলে ফ্রান্স তার সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটায়। ইউরোপে তার প্রভাব কমে গেলেও সাম্রাজ্য বিস্তারে এটি বাধা স্বরূপ ছিল না। বরঞ্চ ইউরোপের রাজনীতি হতে নিজেকে মুক্ত রেখে ফ্রান্স তার সমস্ত শক্তি সাম্রাজ্য বিস্তারে নিয়োগ করে। ফলে এক বিশাল ফরাসী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরই ফরাসী সাম্রাজ্যের স্থান হয়। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসের প্রথমদিকে ফ্রান্সের সাথে ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ নিয়ে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয়। কিন্তু জার্মান ভীতির জন্য উভয়েই নিজ নিজ ঔপনিবেশিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়।

পররাষ্ট্র নীতি: ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের গ্লানি ভুলবার জন্য তৃতীয় প্রজাতন্ত্র জোরদার বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিসমার্ক যতদিন জার্মানীতে ক্ষমতাসীন ছিলেন ততদিন ফ্রান্সকে মিত্রহীন অবস্থায় থাকতে হয়। বিসমার্কের পতনের পর অবশ্য ফ্রান্স তার বহু আকাঙ্ক্ষিত বন্ধু পেল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সাথে ফ্রান্স মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এর পর ইংল্যাণ্ডের সাথে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাথে আন্তরিক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি বলতে প্রধানত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকেই বুঝাত।

ইটালী

ইটালী (১৮৭০-১৯১৪): ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইটালীর রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এই ঐক্য ইটালীতে শান্তি আনতে পারেনি। ইটালী নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাগুলির সমাধান করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সত্য

ইটালী রাষ্ট্রের সমস্যা

কিন্তু এগুলির সমাধান করা সম্ভব হয় নি। এ কারণেই বিংশ শতাব্দীতে মুসোলিনীর আবির্ভাব ঘটে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও ইটালীতে জাতীয় সংহতির খুবই অভাব ছিল। প্রাদেশিকতা, আঞ্চলিকতা এবং রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতা এই যুগটিকে কলঙ্কিত করেছে। ইটালীর জনসাধারণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ছিল না। অশিক্ষিত ও দুঃস্থ জনসাধারণ পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্রের গুণাগুণ বুঝতে পারল না।

এই যুগটিতে অবশ্য ইটালীতে শিল্প-বিপ্লব দেখা দেয়। ফলে শিল্প-বিপ্লব প্রসূত সমস্যা সমাধানের জন্যে সরকারের চেষ্টা করতে হয়।

পোপের সাথে ইটালী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণের প্রশ্নটি ছিল আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। তদানীন্তন পোপ ইটালীর রাজাকে বিধিসঙ্গত রাজা বলে স্বীকার করে নিলেন না এবং ক্যাথলিকদের সরকারের সাথে অসহযোগিতা করার নির্দেশ দিলেন। চার্চের সাথে এই বিবাদ বহু বছর পর্যন্ত টিকে ছিল এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মুসোলিনী এই সমস্যার সমাধান করেন।

পররাষ্ট্র নীতি: আভ্যন্তরীণ নীতির প্রতি জনসাধারণ যাতে মনোযোগী না হয় সে কারণে ইটালী সরকার চমকপ্রদ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন।

ত্রিশক্তি চুক্তি ১৮৮২

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইটালী ফ্রান্সের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। এর ফলে ইউরোপীয় রাজনীতিতে ত্রি-শক্তি চুক্তি দেখা দেয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত করবার পর ইটালী তার ভুল বুঝতে পারল। অস্ট্রিয়ার অধীনে ট্রেন্ট, ট্রিয়েস্ট প্রভৃতি অঞ্চলগুলির প্রতি ইটালীর দাবি বহু দিনের। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইটালী ত্রিশক্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় তার পক্ষে অস্ট্রিয়ার নিকট হতে এই অঞ্চলগুলি আর দাবি করবার উপায় রইল না। এ কারণেই ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ না দিয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দিকে যোগ দেয় এই আশায় যে যুদ্ধে জিতলে অস্ট্রিয়ার নিকট হতে তার দাবি পূরণ করে নেবে।

ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক

ফ্রান্সের সাথেও ইটালীর উপনিবেশ নিয়ে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয়। ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকায় ইটালীর প্রভাব প্রতিষ্ঠার প্রধান বাধা স্বরূপ ছিল। এবং এই কারণেই ফ্রান্সের সাথে শত্রুতা দেখা দেয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সাথে ইটালীর এক বুঝাপড়া হয় এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইংল্যাণ্ডের সাথে ইটালীর বন্ধুত্বভাব বজায় থাকে।

রাজনৈতিক ঐক্য সম্পূর্ণ হবার সাথে সাথে ইটালী পূর্ণোদ্যমে উপনিবেশের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। আফ্রিকায় অবস্থিত এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আবিসিনিয়া গ্রাস করবার চেষ্টা করে। ১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে এডুয়ার যুদ্ধে আবিসিনিয়ার নিকট পরাজিত হয় এবং আডিস আবাবার সন্ধি অনুসারে ইটালী আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। এডুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হলেও ইটালী কিন্তু উপনিবেশ বাড়াবার চেষ্টা হতে বিরত হল না। তরুণ তুর্কী বিপ্লবের ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ইটালী তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ত্রিপলি আক্রমণ করল। কিন্তু ত্রিপলি অধিকার করা ইটালীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। এরূপ অবস্থা হতে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ইটালী তুরস্কের রাজধানী কনস্তান্তিনোপল এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করল। এতে তুর্কী সরকার ইটালীর সাথে সন্ধি করল। এই সন্ধিতে ত্রিপলির ওপর ইটালীর অধিকার মেনে নেওয়া হল।

ঔপনিবেশিক নীতি

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইটালী নিরপেক্ষ থাকবে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সে ত্রিশক্তি চুক্তি বাতিল করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেয়।

ত্রিশক্তি আঁতাত (Triple entente): জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক বিসমার্ক স্পষ্টভাবেই বলতেন যে জটিল সমস্যার সমাধান গণতন্ত্র দ্বারা হয় না, লৌহ-কঠিন নীতি ও সামরিক শক্তিই একমাত্র পন্থা। তিনি তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হলে এবং খুঁটিনাটি ভাবে সমরসজ্জায় সজ্জিত হতে পারলে আধুনিক কালে অনেক কিছু ঘটান সম্ভব। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করল অনেক রাষ্ট্রই। কেউ জার্মানীর সমর-সজ্জার ভয়ে ভীত হল, কেউ পররাজ্য গ্রাসের জন্য বিসমার্কের জঙ্গীবাদ গ্রহণ করল। এই সকল রাষ্ট্র একে অন্যকে সন্দেহ করল এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোট দেখা দিল।

ভূমিকা

এই রাষ্ট্রজোট গঠনের পশ্চাতে পরস্পরে সন্দেহ ও স্বার্থ-সংঘাত কাজ করছিল। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে দুটি পরস্পর-বিরোধী সমশক্তিমান রাষ্ট্রজোট গঠিত হ'ল।

পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রজোট গঠন

বিসমার্ক ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সাথে **দ্বৈত-সন্ধি** স্থাপন করেন। ১৮৮২

খৃষ্টাব্দে ইটালী, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার দলে যোগ দেওয়ার ফলে দ্বৈত-সন্ধি **ত্রিশক্তি মৈত্রীতে** পরিণত হয়। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় ফ্রান্স ভীত হ'ল। কিন্তু বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ফ্রান্স ইউরোপে কোন মিত্র পেল না। বিসমার্কের পতনের পর ইউরোপীয় রাজনীতিতে জটিলতা দেখা দেয়। জার্মানীর সম্রাট বিশ্বরাজনীতিতে জার্মানীকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইলেন। জার্মানীর সাম্রাজ্যও বৃদ্ধি করতে চাইলেন। এর ফলে বিসমার্কীয় নীতি বিদায় গ্রহণ করল, ত্রি-শক্তি মৈত্রীর বিরুদ্ধে এক নতুন রাষ্ট্রজোট দেখা দিল। এটিকে **ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত** বা ত্রিশক্তি মিতালি বলা হয়। এই 'ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত-এর কার্য হ'ল জার্মানীর সম্প্রসারণ নীতিকে বাধা দেওয়া এবং ত্রিশক্তি মৈত্রীর অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা।

বিসমার্কের পররাষ্ট্র নীতির কাঠামো

বিসমার্কের পতনের পর ইউরোপীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে **ফ্রান্স রুশ মৈত্রী চুক্তি** (Franco-Russian Alliance, 1893)। এই মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করবার জন্য ফ্রান্স সবিশেষ চেষ্টা করে আসছিল কিন্তু বিসমার্ক যতদিন জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন তা সম্ভব হয় নি। তিনি একদিকে যেমন অষ্ট্রিয়ার সহিত মৈত্রী চুক্তি স্থাপন করেন, তেমনি রাশিয়ার সঙ্গেও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পৃথকভাবে রি-ইনস্যুরেন্স সন্ধি করেন। কিন্তু বিসমার্কের পতনের সাথে সাথে জার্মানীর সম্রাট রাশিয়ার সঙ্গে রি-ইনস্যুরেন্স সন্ধিটি আর নূতন ভাবে স্বাক্ষরিত করলেন না। তিনি অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে অষ্ট্রিয়াকেই জার্মানীর আসল বন্ধুরূপে মনে করলেন। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর কেবলমাত্র যোগসূত্রই ছিন্ন হ'ল না, রাশিয়ার দিক থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে মিতালী স্থাপনে আর বাধা রইল না। ফ্রান্সও যেন এর জন্য অপেক্ষা করছিল। ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রিশক্তি মৈত্রী স্বাক্ষরিত হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এর কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই রুশ সরকার ও ফরাসী সরকারের মধ্যে বন্ধুত্বভাব গড়ে উঠতে থাকে। ফরাসী পুঁজিপতিরা বিসমার্কীয় যুগেই রাশিয়ার বিভিন্ন শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ এবং রাশিয়াকে সমরোপকরণ সরবরাহ করতে থাকে। কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষরে প্রধানতম বাধা ছিলেন বিসমার্ক এবং রাশিয়ার জার-এর ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিসমার্কের পতন

ট্রিপ্‌ল্ আঁতাত কি ভাবে দেখা দিল

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্র নীতির ফল

এবং রাশিয়ার জার-এর বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়ার ফলে এই চুক্তিস্বাক্ষরে আর অন্তরায় রইল না। এক দিকে ফ্রান্স যেমন জার্মানীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা পাবার জন্য মিত্র খুঁজছিল, তেমনি রাশিয়াও তার রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য বিদেশী পুঁজির জন্য ব্যগ্র হ'ল—এই পটভূমিকায় **ফরাসী-রুশ মৈত্রী** চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। এই মৈত্রী চুক্তিটির শর্তগুলি প্রথমে গোপন রাখা হয় এবং কেবলমাত্র ১৯:৮ খৃষ্টাব্দে এর শর্তাবলী প্রকাশিত হয়। চুক্তিটির শর্তগুলির মধ্যে প্রধানতম শর্ত ছিল —যদি জার্মানী বা জার্মানী ও ইটালী একত্রিত হয়ে ফ্রান্স আক্রমণ করে তা হ'লে রাশিয়া তার সর্বশক্তি দ্বারা ফ্রান্সকে সাহায্য করবে, তেমনি জার্মানী বা জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া একত্রিত হয়ে যদি রাশিয়া আক্রমণ করে তা হলে ফ্রান্স তার সমস্ত শক্তি দ্বারা রাশিয়াকে সাহায্য করবে।

ফরাসী-রুশ মৈত্রী চুক্তি

চুক্তির শর্তাবলী

ফরাসী-রুশ চুক্তিটি ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর দ্বারা সর্বপ্রথম 'বিসমার্কীয় ব্যবস্থায়' ফাটল সৃষ্টি করা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে বিসমার্ক যে নীতি অনুসরণ করে আসছিলেন (ফ্রান্সকে মিত্রহীন রাখা) তার অবসান ঘটল। চুক্তির দ্বারা এটাই প্রমাণিত হ'ল যে ভবিষ্যতে জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্সকে আর একাকী ল'ড়তে হবে না। তা ছাড়া, এই চুক্তিটি ইউরোপে দুটি বিবদমান রাষ্ট্রজোটের আবির্ভাব ঘটাল।

ইংল্যাণ্ডের যোগদান: ভিয়েনা কংগ্রেসের পর থেকেই ইংল্যাণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়ল। সে নিজস্ব স্বার্থপর নীতিতেই সন্তুষ্ট থাকল। ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর (১৮৫৬) থেকে ইংল্যাণ্ডের এই বিচ্ছিন্নতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। ১৮৫৬ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড তার সাম্রাজ্য গঠনে নিজেকে নিবিষ্ট রাখে। স্বভাবতই এই যুগটিতে সে রাশিয়া ও ফ্রান্সকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, কারণ রাশিয়া ও ফ্রান্স উভয়েই ছিল ঔপনিবেশিক শক্তি—ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী। 'রুশ-ভীতি' ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র নীতিকে বহুদিন থেকে প্রভাবিত করেছিল। মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান ও সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার সম্প্রসারণকে ইংল্যাণ্ড কোন দিনই ভাল চোখে দেখে নি, বরঞ্চ রাশিয়া যাতে এই অঞ্চলে আর আধিপত্য বিস্তার ক'রতে না পারে তার জন্য ইংল্যাণ্ড আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সুদূর প্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার প্রভাব উক্ত অঞ্চল থেকে নষ্ট করবার জন্য

ইংল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও তার স্বরূপ

চেষ্টা করে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের **ইঙ্গ-জাপ মৈত্রী চুক্তি** এই নীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যাণ্ড হঠাৎ ফরাসী-বিরোধী নীতি গ্রহণ করে। এই সময় ফ্রান্স আফ্রিকায় নিজের সাম্রাজ্যবৃদ্ধির দিকে নজর দেয় এবং ইংল্যাণ্ডের অধীনস্থ সুদানের উপর নিজের দাবী উত্থাপিত করে। মিশরকে কেন্দ্র করে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ব্রহ্ম সীমান্ত, শ্যামদেশ, মাদাগাস্কার প্রভৃতি স্থানে আধিপত্য নিয়েও দুই দেশের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয়। তা ছাড়া, সুদূর-প্রাচ্যে ফ্রান্স রাশিয়ার দোসর ছিল। সুতরাং ইংল্যাণ্ড সুদূর প্রাচ্যে ফরাসী-রুশ আঁতাতকে ভাল চোখে দেখল না। নীলনদের অববাহিকা নিয়ে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের বিরোধ দেখা দেয় এবং **ফ্যাশোডা ঘটনায়** (১৮৯৮) এই বিরোধের চরম রূপ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ফ্যাসোডা ঘটনা ঘটনাই থেকে যায়, এর ফলে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ দেখা দেয় নি কারণ ফ্রান্স তার দাবী ত্যাগ করে ফ্যাসোডা অঞ্চল ছেড়ে চলে আসে এবং এই ভাবে যুদ্ধের কিনারা থেকে উভয় দেশই ফিরে আসতে সমর্থ হয়।

ফ্রান্সের সহিত মতবিরোধ

অপর দিকে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর সাথেও ইংল্যাণ্ড কোনরূপ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত করবার প্রয়োজন মনে করল না। জার্মানী বহুবার মৈত্রী চুক্তির জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠায় কিন্তু ইংরেজ সরকার সকল প্রস্তাবই নাকচ করে দেয়। কিন্তু বিসমার্কের পতনের পর 'রুশ ও ফরাসী ভীতির' হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইংল্যাণ্ড যখন জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্থাপনে ব্যগ্র হ'ল তখন জার্মানী নিজেকে আর পরিতৃপ্ত দেশ বলে মনে করত না, বরঞ্চ জার্মানীর সম্রাট বিশ্বরাজনীতিতে জার্মানীকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে তৎপর ছিলেন এবং জার্মানীর নৌ শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী হলেন। অষ্ট্রিয়া এবং ইটালীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ড মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত করতে পারল না। সুতরাং ইংল্যাণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকল। তার এই বিচ্ছিন্নতাকে 'dangerous isolation' ভয়ঙ্কর একাকীত্ব বলে মনে করা হয়।

ত্রিশক্তির সাথে মতপার্থক্য

ইংল্যাণ্ডের এই ভয়ঙ্কর একাকীত্ব তার সাম্রাজ্য-বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। সুদূর-প্রাচ্যে, ব্রহ্মদেশে, আফ্রিকাতে সে তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির সার্থক রূপায়ণে ব্রতী থাকতে পেরেছিল এবং কালক্রমে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের (বুয়র) সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড তার স্বার্থপর নীতির ত্রুটি বা বিপদ বেশ ভাল

ইংল্যাণ্ডের বিচ্ছিন্নতা নীতির,সুফল ও কুফল

ভাবেই বুঝতে পারে। এই সময় কোন রাষ্ট্রই তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি বরঞ্চ বুয়রদেরই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে উৎসাহ দিয়েছিল।

বিংশ-শতাব্দীর শুরু হতেই অবশ্য ইংল্যাণ্ড তার এই বিচ্ছিন্নতা ভেঙে ফেলতে তৎপর হল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে **ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি** ইংল্যাণ্ডের এই বিচ্ছিন্নতার মূলে কুঠারাঘাত করল। ইতিমধ্যে ফ্রান্সের সহিতও ইংল্যাণ্ডের হৃদ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে। দুই সাম্রাজ্য-বাদী শক্তি তাদের নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পারস্পরিক সাহায্য যে অপরিহার্য তা বুঝতে পারল এবং একে অন্যের সাম্রাজ্যবাদী শোষণমূলক নীতিকে সমর্থন করল। মরক্কোর ক্ষেত্রে জার্মান দাবীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে সাহায্য করে। ফলে মরক্কো ফ্রান্সের অধীনে চলে যায়। এ ছাড়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের মৎস্য-শিকার সম্পর্কে ফ্রান্সের অভিযোগ মেনে নিয়ে এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী দ্বীপ অঞ্চলকে ফ্রান্সের প্রভাবাধীন বলে স্বীকার করবার ফলে ইঙ্গ-ফরাসী মিতালীর পথ প্রশস্ত হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর ফলে ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তি সম্ভবপর হয়।

ইংল্যাণ্ড এই নীতি কিভাবে কাটিয়ে উঠল

সপ্তম এডোয়ার্ডের ফরাসী প্রীতি কারও অজানা ছিল না। তিনি জার্মান-বিরোধী ছিলেন, বিশেষ করে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মকে একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। সুতরাং তিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গেল। ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি যাতে সত্বর স্বাক্ষরিত হয় তার জন্য তিনি ব্যগ্র হলেন। এদিকে জার্মানীর নৌশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নতিও ইংল্যাণ্ডকে ভাবিত করল। জার্মানীই ইংল্যাণ্ডের আসল শত্রু বলে মনে করা হ'ল। ফলে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তি বা 'আন্তরিক মৈত্রী' (Entente Cordiale) স্বাক্ষরিত হ'ল। এই চুক্তিপত্রটিতে একটি 'পাবলিক কনভেনশন', দুটি ঘোষণা এবং কয়েকটি গোপনীয় শর্ত সন্নিবিষ্ট ছিল। 'কনভেনশন'টিতে ইঙ্গ ফরাসী সম্পর্কের ছোটখাটো স্বার্থগুলির মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। উত্তর আফ্রিকার কর্তৃত্ব সম্বন্ধেই চুক্তিটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স আফ্রিকায় বৃটিশ-বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করে এবং মিশরের উপর দাবী ত্যাগ করে। এর পরিবর্তে ইংল্যাণ্ড মরক্কোর উপর ফ্রান্সের দাবী মেনে নিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তির স্বরূপ

ইঙ্গ-ফরাসী 'আন্তরিক মৈত্রী চুক্তি' একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

তবুও একথা অনস্বীকার্য যে 'আন্তরিক মৈত্রী' বাক্যাংশটি অর্থহীন। কারণ এটি মৈত্রী চুক্তিই ছিল না; বিপদের সময় একে অন্যকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতিও এতে উল্লিখিত হয় নি। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে সকল সমস্যা নিয়ে মনকষাকষি চলছিল এতে সেগুলির মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। তবে এটা মানতেই হবে যে, দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্যাগুলি যে মীমাংসা করতে পেরেছিল তা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই চুক্তিটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন উদাহরণ স্থাপন করল যার ফলে ভবিষ্যতে অনুরূপ উপায়ে বহু আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

তাৎপর্য

ইঙ্গ রুশ বুঝাপড়া ও ত্রিশক্তি আঁতাত—ইঙ্গ-ফরাসী 'আন্তরিক মৈত্রী চুক্তি'ই ইঙ্গ-রুশ বুঝাপড়ার পথ সুগম করে দেয়। ইতিমধ্যে জার্মানী তার নৌশক্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি করতে থাকে এবং জার্মানীর ভবিষ্যৎ তার নৌশক্তির উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করে। ইংল্যাণ্ড এতে ভীত হয়ে পড়ে এবং নিজের বিচ্ছিন্নতা দূর করবার জন্য তৎপর হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। বলাই বাহুল্য যে ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি এর বেশ কিছু বৎসর পূর্বেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দেই সম্ভব হল না কয়েকটি কারণের জন্য। প্রথমত, রাশিয়ার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বিবাদ ছিল বহুদিনের। তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার কয়েকটি স্থানের উপর আধিপত্য বা প্রভাব বিস্তারের প্রশ্ন নিয়ে এই বিবাদ চলে আসছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই এই সকল বিবাদ যে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব তা দু পক্ষই বুঝতে পারে। তা ছাড়া, ইংল্যাণ্ড এই সময় তার তুরস্ক নীতির পরিবর্তন ঘটায়। কারণ তুরস্কের সুলতান জার্মানীকেই তার মিত্র বলে মনে করতে থাকেন এবং জার্মানীকে বহু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে সুরু করেন। আবার ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া জাপানের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় এবং তার দুর্বলতা ধরা পড়ে যায়; ফলে ইংল্যাণ্ড বুঝতে পারল যে রাশিয়াকে ভয় করবার মতন কিছু নাই। বরঞ্চ তার সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে জার্মানীকে জব্দ করা যাবে। ফলে যেসব অঞ্চলে ইঙ্গ-রুশ বিরোধ চলছিল সেগুলির অবসান ঘটাবার চেষ্টা চলল। এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ বুঝাপড়া (Agreement)

রাশিয়ার সাথে কিভাবে ইংল্যাণ্ডের বুঝাপড়া সম্ভব হল

স্বাক্ষরিত হল। তিব্বত, আফগানিস্থান, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে এই বোঝাপড়ার আওতায়ও আনা হল। ঠিক হল যে কোন পক্ষই এই অঞ্চলগুলিতে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হবেনা। ইংল্যাণ্ডের সাথে রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ফলে ট্রিপল আঁতাত সুপ্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য ট্রিপল আঁতাত ট্রিপ্‌ল্ এল্যায়েন্সের মতন স্পষ্টভাবে লিখিত চুক্তি ছিল না। একে পারস্পরিক সাহায্যকারী সামরিক চুক্তি বলে মনে করলে ভুল হবে। কিন্তু যেহেতু ফ্রান্স রাশিয়ার মিত্র ছিল এবং বৃটেন ও ফ্রান্স ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছিল বিপদকালে কে কোথায় নৌবাহিনী রাখবে তার ফলে ইউরোপীয় রাজনীতিবিদরা মনে করলেন যে বৃটেন আঁতাত শক্তির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে এবং ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের হাত থেকে ফ্রান্সকে সাহায্য করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

চুক্তিটির তাৎপর্য

সুতরাং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার ৭ বৎসর পূর্বেই ইউরোপে দুটি বিবদমান রাষ্ট্রজোটের আবির্ভাব হল—**ট্রিপল এল্যায়েন্স** ও **ট্রিপল আঁতাত।** ইউরোপ দুটি পরস্পর-বিরোধী সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হল।

তবে এটা সত্য যে এ দুটি চুক্তির মধ্যে কোনটিই পররাজ্য আক্রমণের জন্য স্বাক্ষরিত হয় নি; বরঞ্চ শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই সম্পাদিত করা হয়েছিল এবং যুদ্ধ যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য দুটি রাষ্ট্রজোটই চেষ্টা করেছিল।

বল্‌কান অঞ্চলে বিস্ফোরণোম্মুখ রাজনৈতিক অবস্থাঃ বল্‌কান যুদ্ধ 'তরুণ তুর্কী' বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ছিল। তরুণ তুর্কী দল তুরস্কে ক্ষমতা হস্তগত করবার পর তুরস্কের সাম্রাজ্য যাতে অটুট থাকে তার জন্য সর্বশেষ চেষ্টা এবং তুরস্কের জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তুর্কী সাম্রাজ্যের অ-তুর্কী প্রজাদের তুর্কী জাতিতে পরিণত করবার জন্য এই সরকার 'তুর্কীকরণ' নীতি গ্রহণ করল। এই নীতির বিরুদ্ধে গ্রীস্, সার্বিয়া, মণ্টেনিগ্রো, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র '**বল্‌কান সংঘ**' গঠন করল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই সংঘ মেসিডোনিয়ার খৃষ্টানদের জন্য তুরস্কের নিকট সুশাসনের দাবি পেশ করে; কিন্তু তুরস্ক এটা অগ্রাহ্য করে। ফলে বল্‌কান সংঘ **প্রথম বলকান যুদ্ধের** অবতারণা করল। যুদ্ধ সুরু হওয়ার একমাসের মধ্যে 'বলকান সংঘ' তুরস্কের সৈন্যদলকে প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই পরাজিত করল। কেবলমাত্র এড্রিনোপল, স্কুটারি এবং জানিনা তুরস্কের হাতে থাকল। তুরস্কের শোচনীয় পরাজয়

প্রথম বলকান যুদ্ধ (১৯১২) কারণ ও ফলাফল

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে চিন্তিত করল, বিশেষ করে বল্‌কান জাতীয়তাবাদের এই জয় অস্ট্রিয়াকে খুবই চিন্তায় ফেলল। কারণ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যেও বিভিন্ন জাতি বসবাস করত। তাদের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদ প্রবল হলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য টিকতে পারে না। সুতরাং অস্ট্রিয়া নিজেকে টিকিয়ে রাখবার সবিশেষে চেষ্টা করল। রাশিয়াও বল্‌কান সংঘের এই বিজয়কে ভাল চোখে দেখল না। সার্বিয়া যাতে আড্রিয়াটিক সাগরের নিকটবর্তী স্থান না পায় তার জন্য অস্ট্রিয়া চেষ্টা করল এবং ঐ অঞ্চলে আলবেনিয়া নামক নতুন জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়া উচিত বলে ঘোষণা করল। বুলগেরিয়া যাতে কনস্টান্টিনোপল হস্তগত করতে না পারে তার জন্য রাশিয়া চেষ্টার ত্রুটি করল না। এই সকল চেষ্টার ফলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এক সম্মেলন বসল এবং এই সম্মেলন যুদ্ধ বিরতির চেষ্টা করে। কিন্তু বল্‌কান সংঘের অত্যধিক চাহিদার ফলে যুদ্ধ বন্ধ হল না। তুরস্ককে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হল কিন্তু এর ফলে তার অবস্থা আরও শোচনীয় হল। কেবলমাত্র কনস্টান্টিনোপল ছাড়া ইউরোপে তুরস্কের আর কোন স্থানই রইল না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন চুক্তি দ্বারা প্রথম বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই চুক্তি দ্বারা ঠিক হয় যে কনস্টান্টিনোপল ও তার চতুস্পার্শ্বস্থ অঞ্চল তুরস্কের অধীনে থাকবে। আলবেনিয়া নামে এক নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে এবং গ্রীস ক্রীট দ্বীপ পাবে।

লণ্ডন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে 'বল্‌কান সংঘ' ভেঙে যায় এবং বল্‌কান রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধে লিপ্ত হল। এর ফলে দেখা দিল **দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ** (১৯১৩)। দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধের কারণ হল সার্বিয়া কর্তৃক ম্যাসিডোনিয়া দখলে রাখা, বুলগেরিয়ার এড্রিয়ানোপল না-পাওয়া এবং গ্রীসের স্যালোনিকা অধিকার। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বুলগেরিয়া তার পূর্বতন মিত্র সার্বিয়া ও গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, এবং এর সাথেসাথে দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ সুরু হল। দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধে বল্‌কান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থসংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ছাঁদ (pattern) পরিস্ফুট হয় এবং এর ফলে এনভারের নেতৃত্বে তুরস্ক কিছুটা সুবিধা করে নিতে পারল। তুরস্ক পুনরায় এড্রিয়ানোপল দখল করে এবং রুমানিয়াকে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাতে সমর্থ হয়। দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধের ফলে লণ্ডন চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ জানাল না। কারণ বৃহৎ শক্তিবর্গ তখন পরস্পর একে অপরকে সন্দেহ ও ভয় করছিল। তারা জানত যে বল্‌কান যুদ্ধে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে 'বল্‌কান যুদ্ধ' যেটিকে আঞ্চলিক

দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধ
১৯১৩

যুদ্ধ বলা যেতে পারে তা ইউরোপীয় যুদ্ধে পরিণত হবে। জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া একদিকে হবে এবং ফ্রান্স ও রাশিয়া অপরদিকে থাকবে।

এদিকে দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধে বুলগেরিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট-**বুখারেস্ট সন্ধিতে** স্বাক্ষর করতে বাধ্য হল। এই চুক্তি অনুসারে রুমানিয়া দোবরুজা পেল। সার্বিয়া ও গ্রীস তাদের আশাতীত পরিমাণ অঞ্চল পেল। তুরস্ক এড্রিয়ানোপল ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল পুনরধিকার করতে সমর্থ হল। বুলগেরিয়া প্রথম বল্কান যুদ্ধে প্রাপ্ত স্থানগুলির অর্ধেকেরও বেশি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

দুটি বলকান যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে আরও জটিল ও ঘোরাল করল। কোন পক্ষই বিশ্বাস করল না যে চুক্তির শর্তগুলি টিকে থাকবে। সার্বিয়া ও মণ্টেনিগ্রো এখন থেকে মনে করতে থাকল যে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারাই বোসনিয়ার সার্বদের মুক্ত করা যাবে। বুলগেরিয়া মনে প্রাণে তার প্রতিবেশী সংঘের এই বিজয়কে ভাল চোখে দেখল না এবং এই রাষ্ট্রগুলির ধ্বংস কামনা করতে থাকল এবং তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়াকে তার সম্ভাব্য মিত্র বলে মনে করল। রাশিয়া তুরস্কের দুর্বলতা দেখে নিজেকে বল্কান অঞ্চলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টায় থাকল এবং বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে সার্বিয়া ও রুমানিয়াকে সাহায্য করতে মনস্থ করল। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বল্কান যুদ্ধ দুটি এই অঞ্চলে কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারল না, বরঞ্চ এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশ এরূপ অবস্থায় নিয়ে গেল যায় ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল।

যুদ্ধ দুইটির তাৎপর্য

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধঃ শান্তিচুক্তিসমূহ—জাতিসংঘ

বিশ শতকের সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ ঘটনা মাত্র ২৫ বৎসরের মধ্যে দুটি সর্বগ্রাসী বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯১৪ খৃ:-এ এবং শেষ হয় ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। প্রত্যেক যুদ্ধের পিছনে দুটি কারণ থাকেই—পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ। কোন একটিমাত্র কারণে যুদ্ধ ঘটে না। বিভিন্ন কারণের এবং বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতের ফলেই যুদ্ধ দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধও বিভিন্ন কারণের জন্য সংঘটিত হয়েছিল।

বিভিন্ন কারণ

পরোক্ষ কারণ

(ক) **জঙ্গীবাদ :** জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক বিসমার্ক স্পষ্টভাবেই বলতেন যে, জটিল সমস্যার সমাধান গণতন্ত্র দ্বারা হয় না, লৌহকঠিন-নীতি ও সামরিক শক্তিই একমাত্র পন্থা। তিনি তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হলে এবং খুঁটিনাটিভাবে সমর সজ্জায় সজ্জিত হতে পারলে আধুনিককালে অনেক কিছু ঘটান সম্ভব। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করল অনেক রাষ্ট্রই। কেউ জার্মানীর সমরসজ্জার ভয়ে ভীত হল, কেউ পররাজ্য গ্রাসের জন্য বিসমার্কের জঙ্গীবাদ গ্রহণ করল। এই সকল রাষ্ট্র একে অন্যকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করল এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোট দেখা দিল।

(খ) **আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রজোট :** এই রাষ্ট্রজোট গঠনের পিছনে পরস্পর সন্দেহ ও সংঘাত কাজ করছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে দুটি পরস্পর-বিরোধী সমশক্তিমান রাষ্ট্রজোট গঠিত হল। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালী সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হল। এটিকে ত্রিশক্তি চুক্তি (Triple Alliance) বলা হয়। এই চুক্তিতে ফরাসীরা ভীত হল, কারণ জার্মানী ও ইটালী হতে সরাসরি ফ্রান্স আক্রমণ করা সম্ভব। সুতরাং সে রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের সহিত মিতালি করল। এরা প্রত্যেকেই জার্মান-বিরোধী ছিল, সুতরাং মিত্রতা স্থাপনে কোনরূপ বাধা হল না। এই তিন শক্তি—ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া—জার্মান-আক্রমণ রোধ করবার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি-নামায় স্বাক্ষর করল। এটিকে ত্রিশক্তি মিতালি (Triple Entente) বলে।

(গ) **জাতীয়তাবাদ :** জাতীয়তাবাদ বা উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। জার্মানি ও ইটালীর ঐক্যসাধনের ইতিহাসে এর অবদান সর্বাগ্রে রয়েছে। কিন্তু নিকট-প্রাচ্যে অর্থাৎ বলকান অঞ্চলে যখন এই জাতীয়তাবাদ তীব্ররূপে দেখা দিল তখনই নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি হল। যেমন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে নানাজাতির সমাবেশ হয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে যখন জাতীয়তাবাদ দেখা দিল তখন বিভিন্ন জাতি নিয়ে অষ্ট্রিয়া সামাজ্য কি করে টিকে থাকবে?

অষ্ট্রিয়াকে নিশ্চয়ই যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে, নইলে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ভেঙে দিয়ে পৃথক পৃথক জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে হবে। কোন সাম্রাজ্যই ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে না। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যও নিজ রাজ্যের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করতে

চাইল এবং যে সকল রাষ্ট্র এইরূপ ধ্বংসকারী (অষ্ট্রিয়ার পক্ষে) মতবাদ প্রচারে সাহায্য করেছিল তাদের বিরুদ্ধেও অষ্ট্রিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল, ফলে বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিল।

(ঘ) **জার্মান-ইংরেজ বিরোধ** : জার্মানী ব্যবসায়ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের প্রধান প্রতিযোগী হয়ে পড়ে। আফ্রিকার বিস্তৃত রাজ্যলাভের পর জার্মানীর সাম্রাজ্যলিপ্সা আরও প্রবল হয়ে উঠল। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম বিরাট-নৌবাহিনী সজ্জিত করে ইংল্যাণ্ডের উদ্বেগের সৃষ্টি করলেন। তুরস্কের সহিত মৈত্রী স্থাপন করে জার্মানী বার্লিন হতে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করলে ইংল্যাণ্ড আরও শঙ্কিত হল, ফলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল।

(ঙ) **ফরাসী-জার্মান বিরোধ** : ফরাসীরা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পারেনি। এছাড়া ফ্রান্সের আলসাস ও লোরেন নামক সমৃদ্ধশালী দুটি প্রদেশ জার্মানী কেড়ে নিয়েছিল ; ফলে ফরাসীদের মধ্যে জার্মানবিরোধী মনোভাব দেখা দিল। ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-কামনা আগে হতেই করছিল।

(চ) **সাম্রাজ্যবাদ** : সাম্রাজ্যবাদ (রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সাথে উদীয়মান সাম্রাজ্যবাদী জার্মানী ও ইটালীর বিরোধ দেখা দিল। ইটালী অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে (নিজের সুবিধার জন্য) ত্রিশক্তি চুক্তি না মেনে পুরানো সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে যোগ দেয়। তবুও এটি সর্বজনগ্রাহ্য যে জার্মানীর ও ইটালীর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

প্রত্যক্ষ কারণ : সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড : ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ যখন এইরূপ পারস্পরিক বিদ্বেষ, সন্দেহ ও মদোন্মত্ততায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠিক সেই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটল যা বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করল—সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড-ই এই ঘটনা। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড বলকানের বসনিয়া (Bosnia) প্রদেশে সস্ত্রীক সফরে বের হয়েছিলেন। ২৮শে জুন সেরাজেভো (Serajevo) শহরে সার্বিয়ার এক তরুণ আততায়ীর হাতে যুবরাজদম্পতি নিহত হন। সার্বিয়া বলকান অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। তারা জাতিতে স্লাভ ছিল এবং তারা অষ্ট্রিয়া-শাসিত স্লাভ প্রদেশ অধিকার করে জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। সুতরাং অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকে শত্রু-রূপে মনে করত। সার্বিয়ার এক আততায়ীর হাতে অষ্ট্রিয়া যুবরাজের মৃত্যু

হলে অষ্ট্রিয়া সার্ভিয়ার উপর আরও ক্ষিপ্ত হল এবং সার্বিয়া সরকারের নিকট এক অপমানজনক চরমপত্র প্রেরণ করল। এধারে রাশিয়ার সম্রাট নিজেকে বলকান উপদ্বীপের স্লাভরাজ্যগুলির অভিভাবক মনে করতেন। সার্বিয়ার জনসাধারণও স্লাভ ছিল। স্থতরাং রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নিল এবং সার্বিয়াকে অষ্ট্রিয়ার চরমপত্রে ভীত হতে নিষেধ করল। অষ্ট্রিয়া তার প্রেরিত চরমপত্রের সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (২৮শে জুলাই, ১৯১৪)। রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ অবলম্বন করলে জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (ত্রিশক্তি মিতালি অনুযায়ী) ফ্রান্স রাশিয়ার সহিত মিলিত হল। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে জার্মান বাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করলে ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। পরে বিভিন্ন সময়ে তুরস্ক, বুলগেরিয়া জার্মানীর সঙ্গে এবং ইটালী, পর্তুগাল, রুমানিয়া, গ্রীস, জাপান, চীন এবং সর্বশেষে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির (ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া) সহিত যোগদান করে।

যুদ্ধের জন্য কে দায়ী ?—যুদ্ধারম্ভের সময় অষ্ট্রিয়া-জার্মানীর পক্ষে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মতে রাশিয়া এই যুদ্ধের জন্য:প্রধানতঃ দায়ী এবং ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডও কতকাংশে দায়ী, কারণ ইঙ্গ-রুশ-ফরাসী প্ররোচনা ছাড়া সার্বিয়ার পক্ষে অষ্ট্রিয়ার ভ্রুকুটি অবহেলা করা সম্ভব ছিল না।

অন্যদিকে মিত্রশক্তি পক্ষাবলম্বীগণের মতে জার্মানীই এই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, কেননা জার্মানী সমগ্র পৃথিবীতে নিজ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার সঙ্কল্পে মেতে উঠলে যুদ্ধ দেখা দেয়।

আধুনিককালের চিন্তাশীল লোকদের অভিমত হল যে একটি বিশেষ রাষ্ট্র (যেমন জার্মানী বা রাশিয়া) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী ছিল না। বহৎ পঞ্চশক্তি—জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া সমভাবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি : ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ স্থরু হল তা দীর্ঘ চার বছর তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল। বহুদিক হতে সে যুদ্ধ ইউরোপের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এর আগেও ইউরোপে বহু যুদ্ধ ঘটেছে, যেমন নেপোলিয়ানের সাথে যুদ্ধ এবং বিপ্লবী ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধ, ফ্রাঙ্কো প্রাশিয়ান যুদ্ধ ইত্যাদি। এসব যুদ্ধে যেসব দেশ জড়িয়ে পড়েছিল তাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না এবং এসব যুদ্ধ চলেছিলও বহুদিন ধরে। উনিশ

প্রথম সার্বিক যুদ্ধ

শতকের ইউরোপে যুদ্ধ ঘটেছিল এবং সার্বিক শান্তি বজায় ছিল না সত্য, কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের মত সর্বাত্মক যুদ্ধ এর আগে আর ঘটেনি। মারণাস্ত্র তৈরীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে এভাবে আগে কাজে লাগানো হয়নি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি এর আগের কোন যুদ্ধই করতে পারিনি। যুযুধান প্রত্যেক রাষ্ট্রই সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল, কারণ সকলেই বিশ্বাস করত যে এই যুদ্ধের ওপর তাদের স্থিতি নির্ভর করছে। স্থলে, জলে ও অন্তরীক্ষে এই যুদ্ধ চলেছিল। এবং তাদের এই যুদ্ধটিকে জনযুদ্ধ বলা হয়ে থাকে।

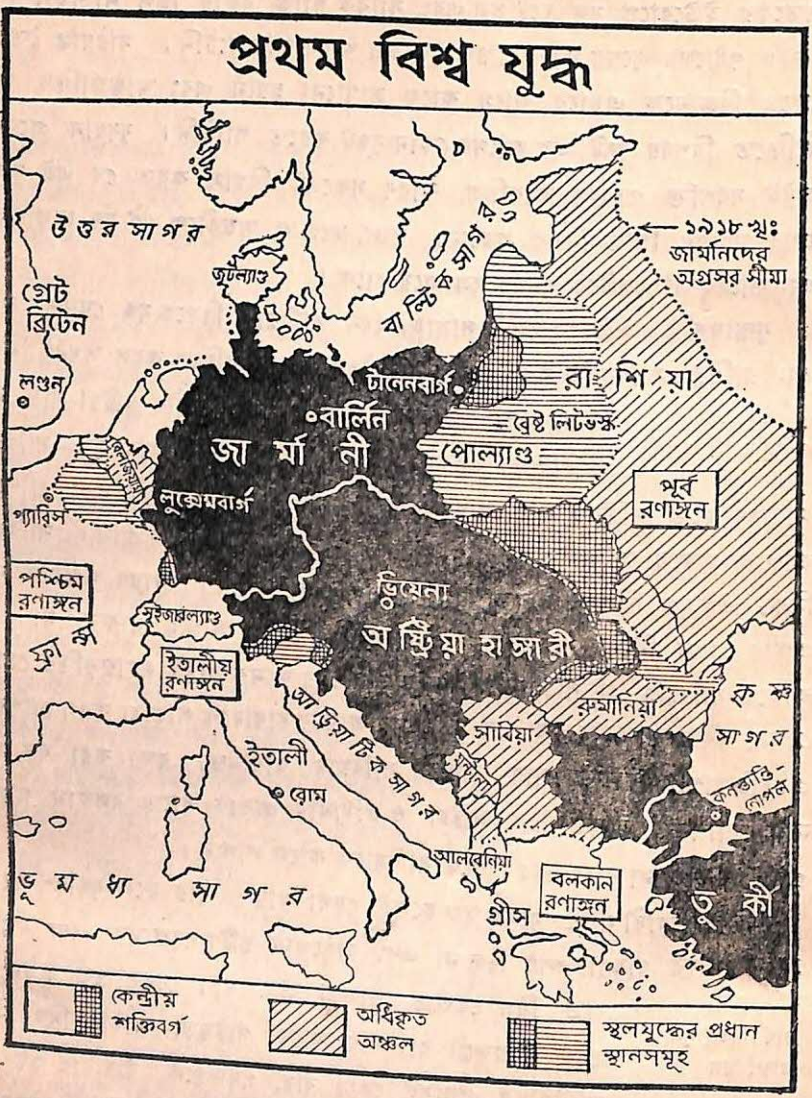
যুদ্ধাদর্শ ঃ অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য যখন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং রাশিয়া সার্বিয়াকে রক্ষা করার জন্য সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত করল তখনই নিকট প্রাচ্য সমস্যা জটিলতর রূপ নিল। তৎকালীন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের নিকট এই যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষার যুদ্ধ—সার্বিয়ার আক্রমণ হতে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ এবং রাশিয়ার বলকান অঞ্চলে অখিল শ্লাভ রাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সার্বিয়ার নিকট এই যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম। কারণ অষ্ট্রিয়ার চরম প্রস্তাব মেনে নিলে সার্বিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব থাকত না। এ কারণে সার্বিয়ার এই সংগ্রামকে মধ্য ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রই সহানুভূতির চোখে দেখল, কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করল রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্র যার কাছে সার্বিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করা বড় ছিল না। রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর প্রভাব যাতে বলকান অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার বিরুদ্ধে সার্বিয়াকে কাজে লাগান।

আত্মবিরোধী আদর্শ

এই স্ববিরোধী নীতি যুদ্ধের সুরু হতেই দেখা যায়। যার ফলে যুদ্ধাদর্শ সম্বন্ধে কোন পক্ষের ধারণা স্পষ্ট ছিল না এবং রাষ্ট্রজোট দুটির সদস্যদের মধ্যে নীতিগত মিল দেখতে পাওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক বৃটেন ও ফ্রান্স স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়ার সাথে গাঁটছড়া বাধায় নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসই দেখা যায়, গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ কেবলমাত্র একটা বুলি ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কোন পক্ষেরই যুদ্ধনীতি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য পরিচালিত হয়নি। দুই পক্ষেরই যুদ্ধনীতি যুদ্ধে জয় ও আত্মরক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

স্বার্থ সিদ্ধিই মূল আদর্শ ছিল

যুদ্ধের গতি ঃ যুদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথে জার্মানী বিদ্যুদ্গতিতে শত্রুপক্ষকে আঘাত হানল। বেলজিয়ামের ওপর দিয়ে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে জার্মান বাহিনী


প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ
উত্তর সাগর
গ্রেট ব্রিটেন
লণ্ডন
জুটল্যাণ্ড
বাল্টিক সাগর
১৯১৮ খৃঃ জার্মানদের অগ্রসর সীমা
টানেনবার্গ
বার্লিন
রাশিয়া
ব্রেষ্ট লিটভস্ক
জার্মানী
পোল্যাণ্ড
লুক্সেমবার্গ
প্যারিস
পূর্ব রণাঙ্গন
পশ্চিম রণাঙ্গন
ভিয়েনা
সুইজারল্যাণ্ড
অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারী
ফ্রান্স
ইতালীয় রণাঙ্গন
রুমানিয়া
কৃষ্ণ সাগর
সার্বিয়া
আড্রিয়াটিক সাগর
ইতালী
রোম
কনস্তান্তিনোপল
আলবেনিয়া
বলকান রণাঙ্গন
ভূমধ্য সাগর
গ্রীস
তুর্কী
কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গ
অধিকৃত অঞ্চল
স্থলযুদ্ধের প্রধান স্থানসমূহ

সহজেই প্রবেশ করল এবং রাজধানী প্যারীর পনের মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌছাল। কিন্তু এখান হতে আর একপাও এগুতে পারল না। এই অবস্থা বহুদিন টিকে থাকে এবং এখানে পরিখা যুদ্ধ (trench warfare) স্থরু হয়। অবশ্য জার্মান বাহিনীকেও এই অঞ্চল হতে হটান সহজে সম্ভব হল না। পশ্চিম রণাঙ্গনে এরূপ অবস্থা যখন দেখা দিল পূর্বরণাঙ্গনে তখন কিন্তু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে থাকল। এই রণাঙ্গনে রুশ বাহিনী প্রথমে কিছুটা কৃতিত্ব দেখালেও কিছুদিনের মধ্যেই জার্মান বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। জলপথেও দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রবল নৌযুদ্ধ যুদ্ধের প্রথম বছরেই স্থরু হল। তবে প্রথম হতেই নৌশক্তিতে ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্য বজায় থাকে।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে কয়েকটি অঞ্চলে যুদ্ধ তীব্রভাবে বেধে ওঠে। দূরপ্রাচ্যে জার্মানী তার দখলে যে সব অঞ্চল ছিল সেগুলি হারাল। মধ্যপ্রাচ্যে জার্মানী বিশেষ সফলতা লাভ করে। পুর্ব রণাঙ্গনে রুশ বাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হল। পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবস্থা অপরিবর্তিত রইল। নৌযুদ্ধে এই বছরেই জার্মানী ডুবো জাহাজের ব্যবহার স্থরু করে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের গতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ইউরোপে জার্মানীই সফলতা অর্জন করে। সার্বিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের স্থরুতেই পশ্চিম রণাঙ্গনে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। দুই প্রতিপক্ষই আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চালায় কিন্তু জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হল না। পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর জয় অব্যাহত থাকে।

যুদ্ধের চতুর্থ বছর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইঙ্গ-ফরাসী জোটে যোগ দেওয়ার ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। অপরদিকে রাশিয়াতে বিপ্লব দেখা দিল ; ফলে জারতন্ত্রের অবসান ঘটল এবং রাশিয়া যুদ্ধ হতে সরে দাঁড়াল। সে জার্মানীর সাথে এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করল।

যুদ্ধের শেষ বছরে জার্মানী যুদ্ধ শেষ করবার জন্য তৎপর হল। পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবার ফলে সে পশ্চিম রণাঙ্গনে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সর্বাত্মক অভিযান স্থরু করে। কিন্তু সেনাপতি মার্শাল ফসের নেতৃত্বে মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী মার্কিন বাহিনী জার্মানীর প্রতিরোধ বূ্যহ তছনছ করে দেয়। ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানদের পরাজয় ঘটতে থাকে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর জার্মানী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এর আগেই জার্মানীর মিত্ররাষ্ট্রগুলি বিনা শর্তে

আত্মসমর্পণ করেছিল। যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি অনুসারে জার্মানী তার অধিকৃত অঞ্চল হতে সরে গেল এবং এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

প্যারিসে শান্তি সম্মেলন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য প্যারিসে শান্তি সম্মেলন ডাকা হয়। এতে ৩২টি দেশ যোগদান করে। পরাজিত শত্রুদের সম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার দেওয়া হল না। চুক্তিপত্রগুলির খসড়া তৈরী হয়ে যাবার পর ঐগুলিতে স্বাক্ষর দেবার জন্য তাদের ডাকা হয়।

প্রধান চারজন

সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইলসন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন-শো এবং ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লেণ্ডোর নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে এরাই ছিলেন শান্তি সম্মেলনের কর্ণধার।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। পরাজিত শত্রুর প্রতি করুণা এবং রাষ্ট্রসংঘ-এর পরিকল্পনা নিয়ে এলেন উইলসন। চীনে বিশেষ সুবিধা যাতে পায় তার জন্য এল জাপান। লাভের বাঁটোয়ারা এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করবার জন্য এল বৃটেন, ফ্রান্স এবং ইটালী।

উইলসনের ১৪ দফাকে মিত্রপক্ষ যুদ্ধ লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছিল সত্য কিন্তু প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সেগুলি গ্রাহ্য করা হল না। এক উইলসন ছাড়া সকলেই স্বার্থপর ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতির দ্বারা পরিচালিত হলেন।

উইলসনের আদর্শবাদ

উইলসন ছিলেন অত্যন্ত আদর্শবাদী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও তিনি আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। যুদ্ধশেষে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্থির করলেন শান্তি চুক্তিতে তাঁর ১৪ দফা পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যার ফলে রাষ্ট্রগুলি আর গোপন চুক্তি করবে না, নিরস্ত্রীকরণে বাধ্য হবে, জলপথে অবাধ বিচরণ করা সম্ভব হবে সকলের পক্ষে এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হবে। উইলসনের ইউরোপের তৎকালীন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ধারণা ছিল না বলেই তিনি যুদ্ধশেষে এরূপ আদর্শ প্রচার করেছিলেন। প্যারিসে গিয়ে তিনি যখন অন্যান্যদের

উইলসনের আদর্শবাদের ব্যর্থতা

সাথে সাক্ষাৎ করলেন তখন বুঝতে পারলেন তাঁর সাথে লয়েড জর্জ, ক্লিমেনশো প্রভৃতির মনোভাবের কত পার্থক্য। ফলে উইলসন তাঁর মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। এ হতেই বোঝা যায় উইলসন কূটনীতিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিদ্‌দের সমকক্ষ ছিলেন না।

ব্রুটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি তাঁর প্রখর ছিল। শান্তি সম্মেলনে তিনি প্রধান স্থান অধিকার করেছিলেন। শান্তি চুক্তি রচনার ব্যাপারে তাঁর অবদান বেশী ছিল।

লয়েড জর্জ

ফ্রান্সের প্রতিনিধি ক্লিমেনশোকে 'বাঘ' বলা হত। রাজনীতিতে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। প্যারিস সম্মেলনে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের গৌরব বৃদ্ধি করা। তিনি চাইলেন জার্মানীকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এবং ফ্রান্সের হাতে তুলে দিতে হবে কয়লা, লৌহ ইত্যাদি খনিগুলি।

ক্লিমেনশো

ইটালীর প্রতিনিধি অর্লাণ্ডো সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও অভিজ্ঞ রাষ্ট্রবিদ ছিলেন। শান্তিচুক্তির ফলে ইটালী কি করে লাভবান হবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি প্যারিস সম্মেলনে যোগ দেন।

অর্লাণ্ডো

প্যারিস সম্মেলনে দুটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শের বা নীতির সংঘাত দেখা দিল। এক দিকে ন্যায় ও শান্তির ভিত্তিতে ইউরোপের পুনর্গঠন এবং অপর দিকে শক্তিসাম্য, পরাজিত শত্রুকে শক্তিহীন করায় ইচ্ছা এবং বিজয়ী শক্তিবর্গের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য। পরিশেষে স্বার্থপর ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিটিরই জয় হল।

বিপরীত আদর্শের সংঘাত

ভার্সাই চুক্তিপত্র : ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন মিত্রশক্তিবর্গ জার্মানীর সাথে ৪৪০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রথম মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয়ের ফলে জার্মানীকে এই চুক্তি অনুসারে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

জার্মানীকে আলসাস্ লোরেন ফ্রান্সকে দিয়ে দিতে হয়। পোসেন এবং পশ্চিম প্রাশিয়া এই দুটি অঞ্চল পোল্যাণ্ড জার্মানীর নিকট হতে পেল। জাপানকে জার্মানী কিয়াও-চৌ দিতে বাধ্য হল। উত্তর শ্লেজউইগ, ইউপেন, ম্যালমেডি এবং মরেসনেটে গণভোট গ্রহণ করা হল। ফলে উত্তর শ্লেজউইগ ডেনমার্ক লাভ করল। এবং অবশিষ্ট অঞ্চলগুলির জনগণ বেলজিয়ামের সাথে সংযুক্তির প্রস্তাবের পক্ষে রায় দিল। উত্তর সাইলেশিয়ার কিছু অংশের জনগণ গণভোটের দ্বারা পোল্যাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে সংযুক্ত হতে চাইল। ডানজিগ জার্মানী হারাল এবং এটি লীগের সংরক্ষণাধীনে একটি স্বাধীন শহর হিসেবে বিবেচিত হতে লাগল।

চুক্তিপত্রের শর্তাবলী

জার্মানীর ভৌমিক ক্ষতি

মিত্রশক্তিবর্গ মেমেল জার্মানীর নিকট হতে কেড়ে নিল। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, তুরস্ক, ইজিপ্ট, মরক্কো, সাইবেরিয়া, চীন এবং শ্যাম দেশে জার্মানী যে সকল বিশেষ অর্থ নৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করত তা বন্ধ করে দেওয়া হল। জার্মানীর যে সকল উপনিবেশ ছিল সেইগুলির শাসন পরিচালনার ভার গ্রেট বৃটেন. ফ্রান্স, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বেলজিয়াম এবং নিউজিল্যাণ্ডকে দেওয়া হল। অবশ্য স্থির হয় যে ঐ সকল অঞ্চল ম্যানডেট হিসেবে লীগের অধীনে থাকবে।

ঔপনিবেশিক ক্ষতি

ভার্সাই চুক্তির দ্বারা জার্মানীকে সামরিক শক্তিতে বিশেষ দুর্বল করে দেওয়া হয়। জার্মানীর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ১ লক্ষে নির্দিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারেও জার্মানীর উপর কঠোর বাধা আরোপ করা হল এবং ঐ সকল জিনিস জার্মানী আমদানী ও রপ্তানী করতে পারবে না স্থির হল। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা জার্মানী করতে পারবে না। সামরিক অফিসারদের ২৫ বছরের জন্য এবং সাধারণ সৈন্যকে ১২ বছরের জন্য নিয়োগ করা যাবে। জার্মানীর নৌবাহিনী ও এই চুক্তির দ্বারা বিশেষ ভাবে হ্রাস করা হল। স্থির হল যে জার্মানী যুদ্ধজাহাজ হিসেবে ৬টি ডেষ্ট্রয়ার, ৬টি ছোট ক্রুজার এবং ১২টি টর্পেডো নৌকা রাখতে পারবে। কোন ডুবোজাহাজ রাখতে পারবে না। নৌবাহিনীর জন্য ১৫,০০০-এর বেশী লোক নিয়োগ করা চলবে না। জার্মানী যাতে ভার্সাই চুক্তি মেনে চলে সেই উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনী রাইন নদীর পশ্চিম দিকে জার্মানীর যে ভূখণ্ড ছিল তা দখলে রাখল। জার্মানী চুক্তি মেনে চললে ঐ সৈন্যবাহিনী একে একে সরিয়ে নেওয়া হবে বলে স্থির হল। রাইন নদীর বাম পার্শ্বস্থ অঞ্চল এবং দক্ষিণ পার্শ্বেরও কিছু অঞ্চল নিরস্ত্রীকৃত (demilitarised) হল। কাইজার এবং অন্যান্য যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইবুন্যাল গঠনের ব্যবস্থা করা হল। ভার্সাই চুক্তিতে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত শর্তগুলি পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য একটা কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এরজন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় জার্মানীকে বহন করতে হবে বলে ঠিক হয়।

সামরিক বিধিনিষেধ

এই চুক্তির ফলে অর্থ নৈতিক বিষয়েও জার্মানীকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। আলসাস্ লোরেনের লৌহ ও পেট্রোলিয়ম সম্পদ হতে জার্মানীকে বঞ্চিত হতে হয়। সার অঞ্চলে প্রচুর কয়লা সম্পদ আছে এবং ঐ অঞ্চলের কয়লাখনিগুলি ফ্রান্সকে দেওয়া হয়। ঠিক হয় যে ১৫

অর্থ নৈতিক ক্ষতি

বছর পর গণভোটের দ্বারা যদি ঐ অঞ্চলের জনগণ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তা হলে জার্মানীকে সার অঞ্চলের কয়লাখনিগুলি ক্রয় করতে হবে। জার্মানী ও লাক্সেমবার্গের মধ্যে যে বিশেষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তা বাতিল করে দেওয়ায় জার্মানীর অসুবিধা হয়েছিল।

লীগের কাউন্সিলের মতামত ভিন্ন জার্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়াকে সংযুক্ত করা চলবে না। এছাড়া যুদ্ধের জন্য জার্মানী এই চুক্তি অনুসারে মিত্রশক্তিবর্গকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হল। ডানিয়ুব, এল্‌ব (Elbe), নীমেন, ওডার এবং রাইন নদীগুলিকে আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে স্বীকার করা হল।

অন্যান্য বিধিনিষেধ

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা: প্যারিস শান্তি বৈঠকের ফলস্বরূপ ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই চুক্তিটি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে হলে এর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে হবে।

(ক) জার্মান প্রতিনিধিদের সাথে কোন আলোচনা করা হয় নি। তাদের সন্ধিপত্রে সই করতে এক প্রকার বাধ্য করা হয়েছিল। তাদের প্রতি বিজেতা রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিদের আচারণ সমর্থনযোগ্য নয়। এ কারণেই জার্মানগণ ভার্সাই সন্ধিকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া সন্ধিরূপে আখ্যায়িত করে। (খ) জার্মানীর অখণ্ডতা নষ্ট করে মূলতঃ ফ্রান্সের শক্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়। পোল্যাণ্ড-জার্মান সীমা এমনভাবে ঠিক করা হয় যাতে ভবিষ্যতে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্যের অজস্র সুযোগ থাকে। (গ) জার্মানীর সামরিক শক্তি নষ্ট করা হয় এবং তার উপনিবেশগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। (ঘ) জার্মানীকেই যুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী করা হয়, যেটি একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। (ঙ) জার্মানী যেহেতু যুদ্ধের জন্য দায়ী বলে পরিগণিত হয়, সেহেতু তার ওপর এক বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই ক্ষতিপূরণ দিতে জার্মানী একেবারেই অসমর্থ ছিল।

ভার্সাই সন্ধির বৈশিষ্ট্য

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা খুব সহজেই করা যায়। কারণ সমালোচকরা পশ্চাৎ দৃষ্টির সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। ভার্সাই সন্ধির পর যে যে ঘটনা ঘটেছিল, অনেক সমালোচক মনে করেন ভার্সাই সন্ধিই সেগুলির জন্য দায়ী। কিন্তু এটি আর যাই হোক, পক্ষপাত-শূন্য দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন নয়।

সমালোচনা

ভার্সাই সন্ধির সমালোচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের সাধারণতঃ দুভাবে ভাগ করা

হয়—জার্মান-দৃষ্টিতে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে। জার্মান দৃষ্টিতে ভার্সাই সন্ধির সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রতিশোধাত্মক মনোবৃত্তির উদ্দীপক। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর শোচনীয় অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী ভার্সাই সন্ধি। এটিকে একটি উৎপীড়ন করার কক্ষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কক্ষ হতে জার্মানরা কেবলমাত্র যুদ্ধের দ্বারা বের হতে পারে বলে মনে করা হল। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে জার্মানদের এই অভিসন্ধিমূলক সমালোচনা একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ ভার্সাই সন্ধিকে উৎপীড়নমূলক বলার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, উৎপীড়নের প্রধান অস্ত্র ছিল ক্ষতিপূরণ। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ ত জার্মানরা শোধ করেনি, জার্মানী আমেরিকার নিকট হতে যতটা ঋণ পেয়েছিল তার অনেক কম ক্ষতিপূরণ হিসেবে মিত্রশক্তিদের দিয়েছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হতে জার্মানী আর কোন ক্ষতিপূরণ দেয়নি। আরও মজার ব্যাপার যে, জার্মানী যা ঋণ নিয়েছিল তাও কখনো শোধ করেনি। দ্বিতীয়তঃ, 'যুদ্ধের জন্য দায়ী' শর্তটি অপমানজনক নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু এটিকে একটি জাতির ইতিহাসে চিরস্থায়ী ক্ষত স্বরূপ মনে করা উগ্র জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক হলেও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর দায়িত্ব যখন আমরা সকলেই অল্প বিস্তর জানি, তখন জার্মানী যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কিছুটা দায়ী ছিল সেটা অনস্বীকার্য।

জার্মান দৃষ্টিতে

নিরপক্ষে দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, ভার্সাই সন্ধিটি কতকগুলি অবাস্তব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিজেতা রাষ্ট্রগুলি তাদের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়। জার্মানীতে গণতন্ত্রের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি না করে ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার ধাঁচে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হয়। চুক্তিটির অর্থ নৈতিক শর্তগুলি ভবিষ্যতে বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। তাছাড়া, নবগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে ভবিষ্যতে জার্মান আক্রমণের হাত হতে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হয়নি।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে

ভার্সাই সন্ধি ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধঃ ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হচ্ছে এই চুক্তিটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী। বলা হয়ে থাকে যে এই চুক্তি জার্মানীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এত বেশি কঠোর শর্তাদি আরোপ করা হয় যে তা জার্মানীর পক্ষে মেনে চলা অসম্ভব ছিল এবং একারণেই জার্মানী প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই মতটি মেনে নেওয়া অসম্ভব। কারণ আমরা জানি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভন্ন কারণ ছিল। তবে ভার্সাই সন্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম একটি কারণ।

একমাত্র কারণ নয়

অন্যান্য চুক্তি :

সেণ্ট জার্মেন-এর সন্ধি দ্বারা ঘোষণা কর হল যে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে এবং এর বদলে অস্ট্রিয়াতে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। যুদ্ধের জন্য অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী দায়ী থাকায় অস্ট্রিয়াকে মিত্রশক্তি-বর্গকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেহেতু জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার নতুন সরকার এই দুটি রাষ্ট্রের মিলনের পক্ষপাতী ছিল সেজন্য এই চুক্তির দ্বারা স্থির হল যে, এই দুটি দেশকে পরস্পরের সাথে মিলতে দেওয়া হবে না। অস্ট্রিয়া এমন কোন কাজ করতে পারবে না যার ফলে তার স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে।

অস্ট্রিয়ার সাথে সেণ্ট জার্মেনের সন্ধি

সন্ধির শর্তগুলি

এই চুক্তি অনুসারে অস্ট্রিয়া ইটালীকে দক্ষিণ টাইরল, ট্রেন্টিনো, ট্রিয়েস্ট, ইস্ত্রিয়া এবং ডালমাসিয়ার নিকটবর্তী কতকগুলি দ্বীপ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ টাইরলে প্রায় ২½ লক্ষ জার্মান ভাষাভাষী লোক থাকা সত্ত্বেও এটি ইটালী লাভ করে, কারণ গোপন চুক্তি অনুসারে এটি ইটালীর প্রাপ্য ছিল। বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, নিম্ন অস্ট্রিয়ার এক অংশ (Part of lower Austria) এবং অস্ট্রিয়ান সাইলেশিয়া এই সকল অঞ্চল নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া নামক এক নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হল। পোল্যাণ্ডকে অস্ট্রিয়ান গ্যালিসিয়া দেওয়া হল। রুমানিয়া পেল বুকো-ভিনা, সার্বিয়া বসনিয়া, হার্জিগভিনা এবং ডালমাশিয়ার উপকূল ও দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া নামে এক নূতন রাষ্ট্র গঠিত হল।

এই চুক্তির অবশিষ্ট অনুচ্ছেদগুলি ভার্সাই চুক্তির বিভিন্ন শর্তের অনুরূপ। ইউরোপের বাইরে অস্ট্রিয়া যে সকল বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত এই চুক্তির দ্বারা তা হতে অস্ট্রিয়া বঞ্চিত হল। ক্ষতিপূরণ দিতেও অস্ট্রিয়া স্বীকৃত হল। অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হল। অস্ট্রিয়ার নৌবাহিনী তুলে দেওয়া হল এবং সৈন্য সংখ্যা ৩০,০০০ নির্দিষ্ট করা হল।

ট্রায়ানলের সন্ধি : ১৯২০ সালের ৪ঠা জুন ট্রায়ানন প্রাসাদে মিত্রশক্তিবর্গ হাঙ্গেরীর সাথে ট্রায়ানন সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধি অনুসারে নতুন রাষ্ট্রের নাম হাঙ্গেরী করা হল, হাঙ্গেরিয়ান প্রজাতন্ত্র নয়। এই চুক্তির ফলে হাঙ্গেরীর নিকট হতে রুমানিয়া ট্রানসিলভানিয়া

হাঙ্গেরীর সাথে ট্রায়াননের সন্ধি

এবং টেম্‌স্‌ভরের অনেকাংশ পেল। যুগোশ্লাভিয়া ক্রোসিয়া, শ্লাভোনিয়া এবং টেম্‌স্‌ভরের কিছু অংশ লাভ করল, চেকোশ্লোভাকিয়া, শ্লোভাকিয়া ও ক্যারপাথিয়ান পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ ও পূর্বে ভূখণ্ডের কিছু অংশ লাভ করে। পশ্চিম হাঙ্গেরী অষ্ট্রিয়াকে দেওয়া হল। হাঙ্গেরীর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ৩৫,০০০ নির্দিষ্ট করা হল। হাঙ্গেরীকেও যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বলা হয়।

শর্তাবলী

নিউলির সন্ধি : নিউলির সন্ধি মিত্রপক্ষ এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে যুগোশ্লাভিয়া বুলগেরিয়ার নিকট হতে পশ্চিম বুলগেরিয়ার চারটি ক্ষুদ্র অঞ্চল লাভ করে। গ্রীসকে পশ্চিম থ্রেস এবং ইজিয়ান উপকূলের কিছু কিছু অঞ্চল দেওয়া হয়। বুলগেরিয়া তার সৈন্যসংখ্যা ২০,০০০-এর অধিক বৃদ্ধি করতে পারবে না এবং অন্যান্য সামরিক কর্মচারীর সংখ্যা ১৩,০০০-এর অধিক বৃদ্ধি করা চলবে না। এছাড়া বুলগেরিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতেও বাধ্য করা হয়।

বুলগেরিয়ার সাথে নিউলির সন্ধি
।
শর্তাবলী

সেভরের সন্ধি : ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট সেভরের সন্ধি অনুসারে তুরস্ক, ইজিপ্ট, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপলিটানিয়া, মরক্কো এবং টিউনিসিয়ায় সকল অধিকার হারাল। এছাড়া আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটামিয়া এবং সিরিয়ার ওপরও তুরস্ক তার অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হল। স্মার্না ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া মাইনর অস্থায়িভাবে গ্রীসের শাসনাধীনে রাখা হল। গ্রীস ইজিয়ান সাগরস্থ কতকগুলি দ্বীপ এবং পূর্ব থ্রেস তুরস্কের নিকট হতে লাভ করে। রোড্‌স ও ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জে ইটালীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য ভবিষ্যতে ইটালী ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

তুরস্কের সাথে সেভরের সন্ধি

তুরস্ক আর্মেনিয়াকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকার করল। প্রকৃত পক্ষে আনাটোলিয়া (এশিয়া মাইনর) এবং ইউরোপের এক ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত তুরস্ককে অবশিষ্ট সকল ভূখণ্ড পরিত্যাগ করতে হল। এমন কি আনাটোলিয়ার ওপরও ফ্রান্স ও ইটালী প্রভাব বিস্তারের অধিকার একটি চুক্তির দ্বারা লাভ করে। তুরস্কের সুলতান মহম্মদের প্রতিনিধিগণ এই সন্ধি স্বাক্ষর করলেন বটে কিন্তু এই সন্ধির বিরুদ্ধে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে আন্দোলন হয় এবং শেষ পর্যন্ত এটি লসেনের সন্ধির দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

লসেনের সন্ধির দ্বারা সেভরের সন্ধির পরিবর্তন (১৯২২)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল : এই বিশ্বব্যাপী মহাসমরের ফল একদিক হতে যেমন বেদনাদায়ক; অন্যদিকে তেমনি শুভফলসূচক হয়েছিল।

খারাপ ফল : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ বহু দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। অনেক দেশে যুদ্ধ-শেষে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই যুদ্ধে ধন ও প্রাণের যে হানি হয় তা অতি ভীষণ। দুই পক্ষের প্রায় এক কোটি সৈন্য নিহত হয় এবং নিহত বেসামরিক লোকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ত্রিশলক্ষ।

মহাযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কট উপস্থিত হয় এবং কোন রাষ্ট্রই এটি হতে রক্ষা পায় নি। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পরিমাণ কমে যাওয়ায় বেকারের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যায়। এর ফলে অনেক দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে।

সুফল : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানব ইতিহাসের ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

পৃথিবীর মানচিত্রে পরিবর্তন : এই মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জাপান পৃথিবীর নানাস্থানে অবস্থিত জার্মান উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। ইউরোপে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং কয়েকটি রাষ্ট্রের আয়তন কমে যায়। অবশ্য কয়েকটি রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পায়। তুরস্কের অধীনস্থ আরব দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে।

গণতন্ত্রের প্রসার : যুদ্ধের ফলে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পতন ঘটেছিল এবং বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের প্রসার হতে থাকে। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। রুশ-বিপ্লবের পর রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক আলোড়নের সৃষ্টি করল। গণতন্ত্রের প্রসারের ফলেই বিভিন্ন দেশে নারী জাগরণ দেখা দেয় এবং এর ফলে বিভিন্ন দেশে নারীকে পুরুষের তুল্য রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধি : এই ভয়াবহ যুদ্ধে নিরর্থক নৃশংসতা দেখে বিশ্ববাসীর মনে আন্তর্জাতিক প্রীতি ও মনোভাব দেখা দেয়। ফলে জাতিসংঘ বা লীগ অব্ নেশন্স্ নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। বিশ্বে শান্তি রক্ষা করা ও যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব গঠনে জাতিসংঘ ব্রতী হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিকতার সাফল্য দাবী করতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে যুদ্ধ দ্বারা দেশের ও জগতের মঙ্গল সাধন করা যায় না। কারণ এই যুদ্ধের

শুভ ফলাফলগুলি আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যায় যে যুদ্ধ যাতে আর না সংঘটিত হয় সেইদিকেই সকলের দৃষ্টি। শুভ ফলাফলগুলি বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার জন্যই দেখা দেয়। এগুলিকে বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ফল বলা যেতে পারে।



জাতীয়তাবাদের সাফল্য : এক জাতীয় লোক এক রাষ্ট্রে স্বাধীন ভাবে বাস করবে, জাতীয়তাবাদের এইটিই মূল প্রতিপাদ্য ও লক্ষ্য। ভিয়েনা কংগ্রেসে এটিকে মানা হয় নি। কিন্তু প্যারিসের শান্তি বৈঠকে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি যেরূপ পুনর্গঠিত হল তাতে ঐ নীতি যথাসাধ্য মেনে নেওয়া হল।

জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপন : অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য ভেঙে অষ্ট্রিয়া,

হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া—এই তিনটি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের পত্তন হল। রাশিয়ার দাসত্ব বন্ধন হতে মুক্তি ও পূর্ণ স্বরাজ পেল ফিনল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া। ১৯১৯-এর মানচিত্রে জারশাসিত রাশিয়ার বদলে দেখা দিল সোভিয়েটতন্ত্রী রাশিয়া। রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্তে নতুন করে দেখা দিল পোল্যাণ্ড। আঠারো শতকে পোল্যাণ্ডের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়া তিনবার পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদ করে দেশটির বিলোপ ঘটায়। প্যারিস বৈঠকে পোল্যাণ্ডের পুনর্জন্ম হল। বল্‌কান অঞ্চলে পুরানো সার্বিয়া রাষ্ট্রটি বর্ধিত হয়ে যুগোশ্লাভিয়া নামে দেখা দিল ; সার্ব, ক্রোট ও স্লোভেন জাতির বাসভূমি রূপে এই রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হল। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, রুমানিয়া ও গ্রীসের আয়তন বেড়ে গেল। জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, রাশিয়া ও তুরস্কের আয়তন কমে গেল। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আইরিশ ফ্রি স্টেট (বর্তমানে আয়ার) নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হল।

অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়া

পোল্যাণ্ড

যুগোশ্লাভিয়া

জাতিসংঘ

অতি-জাতীয়তার স্বপ্নে মানুষ এতদিন বিভোরই ছিল, এর প্রথম সার্থক রূপায়ণ হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠায়। যুদ্ধ চলাকালীনই মিত্রশক্তি বিশ্বশান্তি রক্ষাকল্পে স্থায়ী এক বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টারও অবদান কম নয়। ভবিষ্যতে যুদ্ধ যাতে আর না ঘটতে পারে তদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনার উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের অভিমত ব্যক্ত করেন। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের দুটি সমিতি—জাতিসংঘ সমিতি (League of Nations Society) এবং স্বাধীন জাতিদের নিয়ে জাতিসংঘ সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি উইলসন্‌ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে 'বিশ্বশান্তির জন্য জাতিসংঘের' ওপর এক বক্তৃতা দেন। তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দদফায় (Fourteen Points) যুদ্ধশেষে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম দফা রূপে স্থান পায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী সরকার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল স্মাটস্‌ তাঁদের নিজ নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন। ইতিমধ্যে ধ্বংসকারী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জাতিসংঘের উৎপত্তি

যুদ্ধশেষে সর্বদিকে ধ্বংসের নিদর্শন ও বিভীষিকার ফলে মানুষের মনে চির শান্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই সমস্ত পরিকল্পনা ও ভাবাদর্শের ওপর ভিত্তি করে জাতিসংঘের চুক্তিপত্র (covenant) প্রণীত হয়, এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের জন্ম হয়। জাতিসংঘের নিয়মপত্রকে ভার্সাই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং জাতিসমূহের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী জাতিসংঘ সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য: জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তি রক্ষা করা এবং পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যুদ্ধভীতি হতে রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করা এবং কার্যকরী নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে লিপ্ত না হবার দায়িত্ব নেয় এবং জাতিগুলির মধ্যে যাতে ন্যায়সঙ্গত, সম্মানজনক ও খোলাখুলি সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেদিকেও নজর দেওয়া হবে বলে বলা হয়। এছাড়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক আইনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধিগুলি রাষ্ট্রগুলি যাতে মেনে চলে তার কথাও বলা হয়।

জাতিসংঘের নিয়মাবলী: জাতিসংঘে দু' প্রকারের সদস্য ছিল—প্রাথমিক সদস্য এবং পরবর্তীকালে যে যে রাষ্ট্র সদস্য হয়। চুক্তি স্বাক্ষরকারী (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বাদে) মিত্র রাষ্ট্র সমূহের অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক সদস্য। এদের সঙ্গে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিও জাতিসংঘের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গণ্য হয়। বিজিত রাষ্ট্রগুলির এবং পরবর্তীকালে যে সকল রাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগদান করে তাদের দ্বিতীয় প্রকারের সদস্য বলা যেতে পারে। প্রাথমিক সদস্যের সংখ্যা ছিল ৪০। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা হয় ৫৫। জাতিসংঘের সভার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে কোন রাষ্ট্রকে সদস্যভুক্ত করা যেত। আগেই বলা হয়েছে যে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, পরাজিত শত্রু রাষ্ট্রগুলি এবং রাশিয়া জাতিসংঘের সদস্য ছিল না। জাতিসংঘ পরিত্যাগ করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল না। যে কোন রাষ্ট্র আগে হতে নোটিশ দিয়ে এর সদস্যপদ ত্যাগ করতে পারত। আবার চুক্তিভঙ্গকারী, জাতিসংঘের আদর্শচ্যুত কোন রাষ্ট্রকে অন্য সদস্যরা সর্বসম্মত ভোটে সংঘ হতে সরিয়ে দিতে পারত।

জাতিসংঘের দু' প্রকারের সদস্য

জাতিসংঘের নিয়মাবলী

স্বরূপ : জাতিসংঘ একটি রাষ্ট্র বা অতিজাতীয় রাষ্ট্র ছিল না। সদস্যরাষ্ট্রগুলি সার্বভৌমিকতার একবিন্দুও পরিত্যাগ করেনি। জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না। এর শক্তি নির্ভর করত সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সদিচ্ছার ওপর।

জাতিসংঘের স্বরূপ

সংস্থাগুলি : জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সভা, কাউন্সিল, কর্মদপ্তর প্রধান ছিল। আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাকেও জাতিসংঘের দুটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ বলা যেতে পারে। এছাড়াও অর্থনৈতিক এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্থা এবং স্বাস্থ্য সংস্থা জাতিসংঘের সংস্থা হিসেবে ছিল।

জাতিসংঘের বিভাগগুলি

সভা (Assembly) : প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রই সভার সদস্য ছিল এবং প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারত। প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি করে ভোটদানের ক্ষমতা ছিল। জাতিসংঘের চুক্তিপত্র অনুসারে সভা সংঘের আওতায় অথবা বিশ্বশান্তি সংক্রান্ত যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারত। সাধারণতঃ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের সর্বসম্মত ভোট দরকার হত। সভা নতুন সদস্য নির্বাচিত করত ($\frac{2}{3}$ ভোটের দ্বারা)। সভা সংঘের চুক্তিপত্রও সংশোধন করতে পারত। অবশ্য এটি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন সভাই করত। তাছাড়া, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করত। পরিষদের কার্য, ম্যানডেট অঞ্চলের শাসন এবং জাতিসংঘের বাৎসরিক বাজেট প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলাপ-আলোচনা এর এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল।

স্বরূপ ও কার্যপরিধি

পরিষদ (Council) : জাতিসংঘের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রধান নির্বাহক ছিল পরিষদ। বৃহৎ শক্তিগুলি এর স্থায়ী সভ্য ছিল। এর সংখ্যা ছিল ৫ এবং অস্থায়ী সভ্যের সংখ্যা ছিল ১১। জাতিসংঘের এলাকাভুক্ত বা বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য যে কোন বিষয় আলোচনা করে পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারত। আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন, নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান, সভার সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত করা ইত্যাদি পরিষদের কার্যতালিকার মধ্যে ছিল। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য কাউন্সিলকে সদাসর্বদা চেষ্টা করতে হত। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ মধ্যস্থতা নিয়োগের দ্বারাও যদি অমীমাংসিত থাকত তা হলে কাউন্সিলই বিবাদটি সম্বন্ধে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত এবং বিষয়টি সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশ করতে

পরিষদের কাঠামো ও কার্যক্ষেত্র

পারত। জাতিসংঘের চুক্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ পরিষদই করতে পারত।

কর্মদপ্তর (Secretariat): জাতিসংঘের কাজকর্ম সুচারুরূপে চালাবার জন্য একটি স্থায়ী কর্মদপ্তর ছিল। একজন প্রধান কর্মসচিবের (Secretary-General) অধীনে এই বিভাগটি ছিল। প্রধান কর্মসচিব সভার দ্বারা সমর্থিত পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। সভা এবং পরিষদের কার্যতালিকা প্রণয়ন, জাতিসংঘের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ, জাতিসংঘের কার্যকলাপ সম্বন্ধে রিপোর্ট, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করা এর কার্যের মধ্যে ছিল।

কর্মদপ্তরের কাঠামো ও কার্যক্ষেত্র

আন্তর্জাতিক বিচারালয়: এটি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হতে এই বিচারালয় নিজস্ব ভঙ্গীতে কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক চুক্তির গঠন, দায়িত্ব ইত্যাদির সুবিচার এই আদালতের আওতায় আসে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা: এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। জাতিসংঘের সকল সদস্যই এই সংস্থার সদস্য ছিল।

জাতিসংঘের কার্যাবলী: এই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বন্ধ করা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা। কুড়ি বছরের ভেতরে জাতিসংঘকে প্রায় চল্লিশটি রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ মেটাবার জন্য বলা হয়েছিল। ছোটখাটো বহু বিবাদ-বিসম্বাদ সংঘ মেটাতেও সক্ষম হয়েছিল। ইরাক-তুরস্ক, গ্রীস-বুলগেরিয়া, ইটালী-গ্রীস, ফিনল্যাণ্ড-রাশিয়া, পোল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়া, হাঙ্গেরী-রুমানিয়া প্রশ্নগুলির মীমাংসা জাতিসংঘ ভালভাবেই করে এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংঘ বিশেষ চেষ্টা করে। পরাজিত শত্রুর উপনিবেশগুলির সুশাসনের জন্য সংঘের ম্যানডেট কমিশন প্রভৃত কার্য করে। সংঘ পনের বছর ধরে সার অঞ্চল ভালভাবেই শাসন করে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘ এই সময় বিশেষ চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কতকগুলি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯২৭ সালে জেনেভাতে একটি অর্থনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসারের চেষ্টা

জাতিসংঘের কার্যাবলী

করে। সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্যও লীগ বিশেষ চেষ্টা করে। ক্রীতদাস প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করবার জন্য জেনেভাতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শিশু ও নারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য, বাস্তুহারাদের পুনর্বসতির জন্য এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতিসংঘ চেষ্টা করে। জাতিসংঘের আর্থিক সাহায্যের ফলে দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে ওঠে। একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (International Labour Organisation) এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্থায়ী বিচারালয় (The Permanent Court of International Justice)। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রথম সংস্থাটি গঠিত হয়, আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসার জন্য দ্বিতীয় সংস্থাটি গঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই দুটি সংগঠন স্বাধীনভাবেই তাদের কার্য পরিচালনা করত, তবে জাতিসংঘের নিকট হতে তারা আর্থিক সাহায্য পেত। ১৯২২ হতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী বিচারালয় ৬০টি সিদ্ধান্ত এবং মতামত প্রদান করে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচেষ্টা

অতএব দেখা যাচ্ছে, ১৯২৫ হতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই সময়ে লীগ সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্যলাভ করেছিল। প্রথমতঃ এর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমস্যা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করে। তৃতীয়তঃ কতকগুলি প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। এছাড়া একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে জাতিসংঘের কর্মদক্ষতার পরিচয় দেয়। অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংঘের অসাধারণ সাফল্য দেখা যায়। প্রপীড়িত জনসাধারণের জন্য সংঘের কার্য সর্বকালে প্রশংসিত হবে। জাতিসংঘের এই কার্যগুলি সাধারণের চোখে পড়ে না বলেই মনে করা হয় যে, জাতিসংঘ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

জাতিসংঘের ব্যর্থতাঃ জাতিসংঘ কিন্তু পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করতে পারেনি, বা যুদ্ধভীতি দূর করতে পারেনি। অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে জাতিসংঘের ইতিহাস সত্যই বেদনাদায়ক। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রমাণ করে যে, জাতিসংঘ তার মূল উদ্দেশ্যে পৌছাতে পারে নি। তবে এর জন্য দাবী জাতিসংঘ ছিল না, নানা ঘটনা ও সদস্য রাষ্ট্রগুলি এর জন্য দায়ী ছিল। জাতিসংঘ যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে নি সত্য কিন্তু জাতিসংঘ কি যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল?

জাতিসংঘের কার্যের মূল্য নিরূপণ

সূচনাতেই জাতিসংঘের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ অনেকেই করেছিল। আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ রাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগ দেয়নি। জার্মানী ও অন্যান্য পরাজিত শত্রুরাষ্ট্রকে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। রাশিয়া তখন রাষ্ট্র রূপে স্বীকৃতি পায়নি। সুতরাং সুরু হতেই জাতিসংঘ ছিল বিজেতাদের সংঘ। এদের মধ্যে আবার অনেকগুলি রাষ্ট্র ছিল যেগুলি সুদূর দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় অবস্থিত। তারা ইউরোপ সম্বন্ধে চিন্তা করতে ইচ্ছুক ছিল না। এছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সদস্য রাষ্ট্রগুলি জাতিসংঘের নিকট হতে সাহায্য পাবার জন্য উদগ্রীব ছিল, সংঘকে শক্তিশালী করবার ইচ্ছা ও শক্তি দুই-ই তাদের ছিল না। যেমন জার্মানীর বদলে লিথুয়ানিয়ার সদস্যপদ প্রাপ্তি বেদনাদায়ক ও হাস্যজনক। বৃটেন (জাতি-সংঘের প্রধান স্তম্ভ) জাতিসংঘের ওপর কোন কিছুতেই নির্ভর করতে চাইত না। বিশেষ করে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের এর ওপর কোন আস্থা ছিল না। কিন্তু এগুলিই সংঘের ব্যর্থতার কারণ নয়। এর শাসনতন্ত্রেই এর ব্যর্থতার বীজ লুকিয়ে ছিল এবং জাতিসংঘের শাসনতন্ত্রে আমরা তদানীন্তন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখতে পাই। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময় কাউন্সিল বা সভার উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের সর্বসম্মত ভোটের প্রয়োজন হত। এটি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। তাছাড়া যে সকল বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দরকার হত সে সকল বিষয়েও কোন সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে হলে বৃহৎ রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করতে হত; কারণ সংঘের নিজস্ব কোন সামরিক শক্তি ছিল না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির উগ্র জাতীয়তাবোধ থাকার জন্য জাতিসংঘের ক্ষমতা বৃদ্ধি তারা পছন্দ করল না।

কোন আন্তর্জাতিক সংঘ যদি জাতীয় রাষ্ট্রগুলি দ্বারা পরিচালিত হয় তা হলে সংঘটির আদর্শ কি করে রূপায়িত হবে? এ কারণেই অনেকে বলে থাকেন যে, সংঘ বলে কিছু ছিল না, যা ছিল সেটি একটি বড় রকমের জুয়াচুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। জাতীয় রাষ্ট্রগুলির দ্বারা পরিচালিত অতিজাতীয় সংঘ অলীক। এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রভাব থাকতে পারে, কিন্তু প্রভাব থাকা মানেই ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া নয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হতে এটি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, বৃহৎ শক্তিগুলি সংঘের উদ্দেশ্য সাধনে আন্তরিকভাবে সাহায্য করছে না। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, ইটালীর ইথিওপিয়া আক্রমণ, জার্মানীর ভার্সাই চুক্তি লংঘন জাতিসংঘ প্রতিহত করতে চাইলেও ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ-নীতির ফলে তা সম্ভব হল না। প্রথম হতেই যদি জার্মানী, ইটালী ও জাপানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হত তাহলে ঐ দেশগুলি অতি সহজে জাতিসংঘের নির্দেশ অমান্য করতে সাহসী হত না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা: ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম চূড়ান্তভাবে শেষ হল।

বিভিন্ন সমস্যা

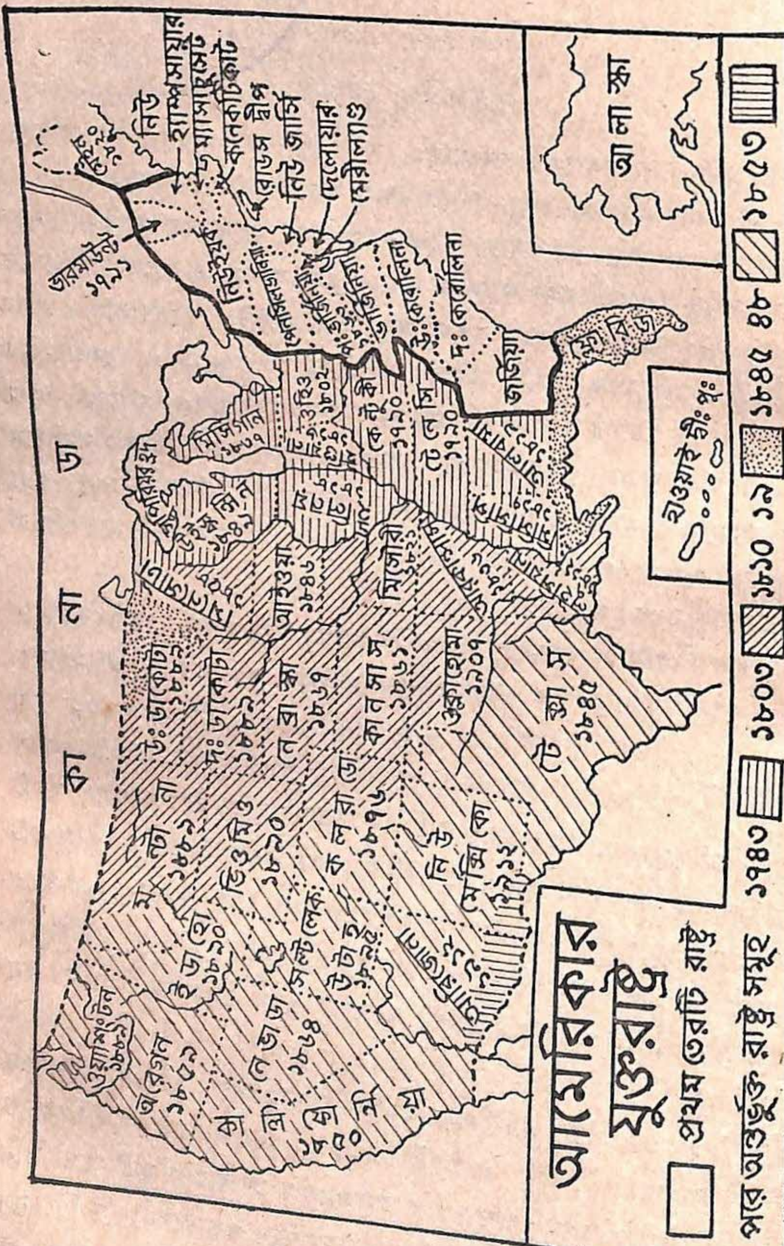
স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ হবার সাথে সাথে এল দেশগঠনের দায়িত্ব। নতুন রাষ্ট্রকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। এই সব সমস্যা হতে রক্ষা পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন ছিল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু সেদিনকার অনেক দেশপ্রেমিক কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের বিপক্ষে ছিলেন এবং অংগরাজ্যগুলিও তাদের স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাস করত। এই অবস্থায় সমগ্র দেশের জন্য উপযুক্ত সংবিধান প্রস্তুত করা এবং সমস্ত অংগরাজ্যের সম্মতিক্রমে সেই সংবিধান চালু করা এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এছাড়া সৈন্যবাহিনীর সমস্যা, শিল্পবাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ত ছিলই।

সংবিধানের স্বরূপ

নতুন সংবিধান: যাই হোক, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলেডেলফিয়াতে সংবিধান ঠিকমত রচনা করবার জন্য এক মহাসভা আহ্বান করা হয়। এই মহাসভা পরম বিজ্ঞতার সাথে যে সংবিধান তৈরী করলেন তা আজও পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি আদর্শ সংবিধান বলে মনে করা হয়। এই সংবিধান অনুসারে জাতীয় সরকার তিনটি শাখায় বিভক্ত হল—আইন-প্রণয়ন, প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগ। প্রত্যেকটি শাখারই হাতে অপর শাখার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু ক্ষমতা রইল যাতে কিনা কোন একটি শাখা অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয়ে না ওঠে।

জর্জ ওয়াশিংটন: নতুন সংবিধান অনুযায়ী প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জর্জ ওয়াশিংটন।

জীবনী: ওয়াশিংটন ভার্জিনিয়ার এক জমিদারের পুত্র ছিলেন। বাল্যকাল হতেই তিনি সত্যবাদী, কর্মঠ ও সাহসী ছিলেন। প্রথম জীবনে ওকালতি আরম্ভ করেন। তারপর যুদ্ধবিদ্যা শিখতে আরম্ভ করেন এবং ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধে তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। নানা অসুবিধার মধ্যে তাঁকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু এই


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র
প্রথম তেরটি রাষ্ট্র
পরে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র সমূহ
কা না ডা
আলাস্কা
হাওয়াই দ্বীঃ পুঃ
ক্যালিফোর্নিয়া ১৮৫০
টেক্সাস ১৮৪৫
ফ্লোরিডা

যুদ্ধে তিনি ইংরাজদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। সেনাপতি হিসেবে তিনি তাঁর সৈন্যদের নিকট হতে যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন অল্প সেনাপতির ভাগ্যেই তা জুটে থাকে।

কেবলমাত্র যোদ্ধা হিসেবেই নয়, জর্জ ওয়াশিংটন দেশের নেতা হিসেবেও কৃতিত্ব দেখান। আমেরিকার শাসনব্যবস্থা নিয়ে যখন সঙ্কট দেখা দেয় তখন তাঁকেই দেশের নেতৃত্ব করবার জন্য আহ্বান জানান হয়।



জর্জ ওয়াশিংটন

জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বেই ফিলাডেলফিয়া শহরে সংবিধান রচনা করবার জন্য এক সভার অধিবেশন বসে। এই সংবিধান অনুসারে তেরটি উপনিবেশ নিয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হল। প্রত্যেক উপনিবেশের নাম হল একটি রাষ্ট্র। সকলের উপর একটি কেন্দ্রীয় সরকার রইল। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণধারকেই প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি বলা হয়। ওয়াশিংটন প্রথম রাষ্ট্রপতি। পর পর দুবার তাঁকে তাঁর দেশের লোক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। তৃতীয় বারের জন্যও জনসাধারণ তাঁকে রাষ্ট্রপতি করতে চায় কিন্তু তিনি রাজী হননি।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে ওয়াশিংটন দেশের বহু সমস্যার সমাধান করেন। একটি নতুন রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তিনি সবগুলিই মিটিয়েছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি নানাভাবে দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁকে জেফারসন ও হ্যামিলটন সাহায্য করেছিলেন। বৈদেশিক নীতিতে ওয়াশিংটন নিরপেক্ষ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন।

জর্জ ওয়াশিংটন ন্যায়পরায়ণ ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে জাতির উন্নতির জন্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, সাধুতা ও দেশপ্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য তিনি শুধু নিজের দেশেই নয়, বিদেশেও শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন। জাতির জনক হিসেবে তিনি আমেরিকায় চিরদিন পূজিত হবেন।

রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি : ওয়াশিংটন নিজেকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তবে তাঁর সময়েই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দুটি রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে—**ফেডারেলিস্ট ও রিপাবলিকান।**

দুটি দলের নীতি

ফেডারেলিস্ট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিষয়টি নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছিল তা হল : সংবিধান প্রয়োগ করা হবে কি প্রকারে। প্রথম দলটি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়াবার পক্ষে ছিল, দ্বিতীয়টি চাইত যে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে খুব কম।

জন এডামস্ : জর্জ ওয়াশিংটনের পর প্রেসিডেন্ট হলেন কঠোর ফেডারেলিস্ট-পন্থী জন এডামস্। তাঁর আমলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ফ্রান্সের সম্পর্কের খুবই অবনতি ঘটে। শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট এডামস্-এর অসীম ধৈর্যের জন্য পুরোপুরি যুদ্ধ বেধে ওঠেনি।

জেফারসন : জন এডামস্-এর পর রিপাবলিকানপন্থী জেফারসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। তাঁর সময়ে ক্ষুদ্র জনপদ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হল।

লুইসিয়ানা ক্রয়

তাঁর শাসনকালে প্রধান ঘটনা হল ফ্রান্সের নিকট হতে লুইসিয়ানা ক্রয়। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন দ্বিগুণেরও বেশী হল। এই অঞ্চলে পরে আটটি অংগরাজ্য সৃষ্টি হল।

ম্যাডিসন : ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে জেফারসন কার্যভার ত্যাগ করেন এবং জেমস ম্যাডিসন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাঁর আমলে ইংল্যাণ্ডের সাথে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বেধে ওঠে। এই যুদ্ধে কোন পক্ষই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ঘেণ্টের সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধের ফলে অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আত্ম-প্রত্যয় অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। বিশ্বের অন্যান্য শক্তি অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোন অংশে হীন নয় এই উপলব্ধি জাতির মনে সঞ্চারিত হয়।

ইংল্যাণ্ডের সাথে যুদ্ধ

জেমস্ মনরো : আত্মবিশ্বাসী, বলিষ্ঠ, নবীন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি মনরোর ঘোষণার মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

স্বাধীন হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অল্পদিনের মধ্যে খুবই শক্তিশালী ও উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হল। একে একে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমা পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল এবং আরও কয়েকটি নতুন রাষ্ট্রের (প্রদেশ) সৃষ্টি হল। এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির সংখ্যা ৫০।

আমেরিকায় স্পেনীয় ও পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভ: দক্ষিণ আমেরিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো, হণ্ডুরাস, গুয়াতেমালা প্রভৃতি রাষ্ট্রের ইতিহাস একই সাথে গাঁথা। এই সমগ্র অঞ্চলটিকে আমেরিকা বলা হয়।

ল্যাটিন আমেরিকায় বিদেশী শাসন

ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রথম যুগে স্পেন ও পর্তুগালই অগ্রণী ছিল। এই দুই রাষ্ট্র বহুদেশ আবিষ্কার করেছিল এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনাও তাদের ছিল। স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে এই আবিষ্কৃত দেশগুলি নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ যাতে না হয় তারজন্য ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন পোপ একটি মীমাংসা করে দেন। এর ফলে পর্তুগালের আঁওতায় আসল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল, ভারত ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল নামক স্থানটি পর্তুগালের অধীনেই রইল। আর স্পেনীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং সমগ্র দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় (ব্রেজিল বাদে)।

স্পেনীয় উপনিবেশ: মেক্সিকো ও আমেরিকায় এই সময় অ্যাজেটেক সাম্রাজ্য ছিল। স্পেনের দুঃসাহসী বীর কোর্টেস এই সাম্রাজ্য ছলে-বলে-কৌশলে জয় করে। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরুদেশ। পিজারো নামক একজন স্পেনিশ যোদ্ধা পেরু জয় করে। এরূপে একে একে ব্রেজিল ছাড়া প্রায় সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা স্পেনের অধীনে আসে। স্পেন এই সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সকল উপনিবেশে প্রচুর সোনা ও রূপার খনি আবিষ্কৃত হয়। জাহাজ-বোঝাই সোনা-রূপা চালান দিয়ে স্পেন সেই যুগে সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী দেশরূপে পরিগণিত হয়।

উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রাম:

কারণ: (ক) স্পেন কি করে উপনিবেশ শাসন করতে হয় জানত না, তার শাসন অত্যাচারেরই নামান্তর ছিল। স্পেনের শাসনের মূল নীতি ছিল শোষণ—বিশেষ করে অর্থনৈতিক শোষণ। (খ) আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও তার ফলাফল স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের মনে আশার সঞ্চার করে। (গ) ফরাসী দার্শনিকদের রচনাবলী তাদের মনে রেখাপাত করে এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে তোলে। (ঘ) স্পেনে রাজশক্তি দুর্বল হলে এবং পরবর্তীকালে নেপোলিয়ন যখন স্পেন ও পর্তুগাল দখল করেন তখন স্পেনীয় ঔপনিবেশিকরা নেপোলিয়নের আধিপত্য অস্বীকার করে এবং নিজেরাই অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। ইংল্যাণ্ডও এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করেছিল।

মুক্তিসংগ্রাম : নেপোলিয়নের স্পেনজয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনীয় উপনিবেশগুলি মুক্তিসংগ্রাম আরম্ভ করে। মেক্সিকোতে এই সংগ্রাম প্রথম দেখা দেয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ভেনেজুয়েলা কন্‌ফেডারেশন নামে একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হল। একে একে মেক্সিকো, চিলি প্রভৃতি উপনিবেশগুলিতে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। ফ্রান্সিস্ মিরাদো, ডন সাইমন বোলিভার, মিগুয়েল হিদাল গো ছিলেন এই মুক্তিসংগ্রামের বীর নেতৃবর্গ। কিন্তু এই সকল আন্দোলন প্রথমে ফলপ্রসূ হয়নি। এই সকল দেশের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি সাময়িকভাবে মুক্তি-আন্দোলন দমন করেছিল। কিন্তু ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মূল স্পেনেই গণ-অভ্যুত্থান হলে এই সকল উপনিবেশেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রত্যেক উপনিবেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করল। পরে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসংঘ প্রতিক্রিয়াশীল মেটারনিকের নেতৃত্বে যখন এই সকল উপনিবেশগুলিকে পুনরায় স্পেনের অধীনে আনতে চেষ্টা করে তখন ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মনরো তাঁর বিখ্যাত ঘোষণার দ্বারা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে আমেরিকায় হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে সাবধান করে দেন। এর ফলে স্পেনীয় উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র স্বাধীনতা অর্জন করে।

স্পেনীয় উপনিবেশে

স্পেনীয় উপনিবেশগুলির ন্যায় পর্তুগীজ উপনিবেশ ব্রেজিলও স্বাধীন হয়। অবশ্য এখানে প্রথমে রাজতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হয়—পর্তুগালের যুবরাজকে ব্রেজিলবাসী তাদের সম্রাট বলে ঘোষণা করে এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল স্বাধীন হয়। পরবর্তীকালে ব্রেজিলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রেজিলে

দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকায় স্পেনীয় উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করলেও তাদের মধ্যে একতার বড়ই অভাব ছিল। পরস্পর ঈর্ষা ও স্বার্থসংঘাত দক্ষিণ আমেরিকার আধুনিক ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলি : প্রথমদিকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির রক্ষাকর্তা বলে নিজেকে মনে করত এবং নানা অজুহাতে এসব রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এসেছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকায় নিজের প্রভাব বজায় রাখবার জন্য আন্তঃ আমেরিকান সংস্থা স্থাপন করেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের গৃহযুদ্ধ :

এদিকে প্রেসিডেন্ট মনরোর কার্যকাল শেষ হবার সাথে সাথেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত বিদ্বেষ-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এটি বিশেষভাবে দেখা দিল। এই সময় হতে উত্তরাঞ্চলের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয়। ফলে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধ বেধে উঠল।

কারণ : এই গৃহযুদ্ধের কারণ ছিল অনেকগুলি, যেমন অর্থনৈতিক, দাস প্রথা সংক্রান্ত বিরোধ, আদর্শগত এবং আব্রাহাম লিঙ্কনের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন।

(ক) **অর্থ নৈতিক :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য ছিল গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ। উত্তর অঞ্চলগুলি শিল্পপ্রধান ছিল। এই দিকের জলবায়ুও কারখানা স্থাপনের উপযোগী। অন্যদিকে দক্ষিণ অঞ্চল ছিল উষ্ণপ্রধান এবং কৃষিকার্যই ছিল এই অঞ্চলের জনসাধারণের উপজীবিকা। এই অর্থনৈতিক কারণের ফলে উত্তরাঞ্চল বিদেশী শিল্পদ্রব্য আমদানীর বিপক্ষে ছিল, অন্যদিকে দক্ষিণ অঞ্চল সস্তায় শিল্পদ্রব্য ক্রয়ের পক্ষপাতী ছিল।

(খ) **দাস-প্রথা সংক্রান্ত বিরোধ :** উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি কল-কারখানায় কাজের জন্য স্বাধীন শ্রমিক প্রয়োজন বলে মনে করত এবং দাস-প্রথার বিরোধী ছিল। অন্যদিকে দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাসদের পরিশ্রমেই কৃষিকার্য চলত; এই অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের ধারণা ছিল যে দাস-প্রথা ছাড়া কৃষিকার্য অসম্ভব। এর ফলে এই অঞ্চলে দাস-প্রথা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলিও এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে।

বর্তমানকালে কিরূপে দাস-প্রথা দেখা দিল : পঞ্চদশ শতাব্দী হতে আমেরিকায় বা নতুন মহাদেশে ইউরোপীয়গণ উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে। নতুন মহাদেশে আখ, তামাক ও তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; আর এই স্থানের খনিগুলিও বিশেষ মূল্যবান। সে কারণে নতুন মহাদেশে কৃষিকার্যে ও খনির কাজে প্রচুর সংখ্যায় মজুর দরকার হয়। ইউরোপীয়গণ ঠাণ্ডা দেশের লোক। আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে তাদের পক্ষে কাজ করা কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া, ইউরোপে তখন প্রচুর সংখ্যায় মজুর পাওয়াও সম্ভব ছিল না। সে কারণে ইউরোপীয়গণ আফ্রিকা হতে নিগ্রোদের ধরে দাসরূপে আমেরিকায় বিক্রয় করত। আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রের মালিকগণ এ সকল নিগ্রোদের কিনতেন।

ক্রীতদাসদের অবস্থা : অতি নিষ্ঠুরভাবে ইউরোপীয়গণ আফ্রিকা হতে নিগ্রো দাস সংগ্রহ করত। তারপর গরু-ভেড়ার ন্যায় তাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হত। পথেই অনেকে মারা যেত। আমেরিকায় দাস বিক্রয়ের বাজারে তাদের বিক্রয় করা হত। বিক্রীত হবার পর তাদের জীবন আরও দুঃসহ হত। তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনা করা হত। হেরিয়েট বীচার স্টো নামে এক লেখিকা "টম কাকার কুটির" নামে একখানি উপন্যাসে আমেরিকার নিগ্রো-দাসদের ভয়ংকর অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন।

দাস-প্রথার অবসান : ইংল্যাণ্ড আইন করে তাই তার উপনিবেশে প্রথম দাস-প্রথার অবসান করে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি আফ্রিকা হতে আমেরিকায় দাস চালান দেয়া বন্ধ হয়। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তখন আগেকার ক্রীতদাসদের বংশধরগণ সংখ্যায় বহুলক্ষ। তাদের জন্য কি কিছুই করা হবে না? এই প্রশ্ন আমেরিকার মনীষীদের মনে এল এবং তাঁরা দাস প্রথার উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন স্থরু করলেন। আঠারো শতকের শেষভাগে পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত রেখার (Mason Dixon Line) উত্তর দিকের সব রাজ্যে দাসপ্রথা উঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মিসৌরী চুক্তি দ্বারা মিসৌরীতে দাস প্রথা চালু রাখার অনুমতি দেওয়া হল।

মিসৌরী চুক্তি

মেক্সিকো যুদ্ধের পর কালিফোর্নিয়া, নিউমেক্সিকো, টেক্সাস ও কলম্বিয়ায় দাসপ্রথা চালু থাকবে কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে ১৮৫০ এ হেনরী ক্লে ও ডেনিয়েল ওয়েব্‌স্টারের মীমাংসা দ্বারা ঠিক হয় যে, কালিফোর্নিয়াতে দাসপ্রথা থাকবে না, অন্য রাজ্যগুলিতে থাকবে কিনা তা ঠিক করবে ওই রাজ্যগুলির জনসাধারণ। এরপর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ষ্টিফেন ডগলাসের কান্‌সাস্‌-নেব্রাস্কা আইন মিসৌরী চুক্তি বাতিল করে কানসাসে দাস প্রথা চালু করা হল।

ক্লে মীমাংসা

তিন বছর পর ড্রেড স্কট মামলায় সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দেয় তার ফলে দাস প্রথা আরো সমর্থন লাভ করে। স্কট ছিলো একজন ক্রীতদাস। সে এই বলে মামলা দায়ের করে যে তার মালিক একদা তাকে দাসমুক্ত অঞ্চলে নিয়ে গিয়েছিল এবং এ কারণে সে মুক্তি পেতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট তার আবেদন বাতিল করে দিয়ে রায় দেয় যে যুক্তরাষ্ট্রে কোন দাসমুক্ত অঞ্চল নেই, সংবিধান অনুসারে ক্রীতদাস হল সম্পত্তি-বিশেষ, এ কারণে কোন অঞ্চলকেই দাসমুক্ত করার অধিকার কংগ্রেসের নেই। অতএব প্রত্যেক নতুন রাষ্ট্রেই অতঃপর দাসপ্রথা চালু করা যেতে পারে। এই সময় দাসপ্রথা বিরোধী প্রজাতান্ত্রিক দল নামে

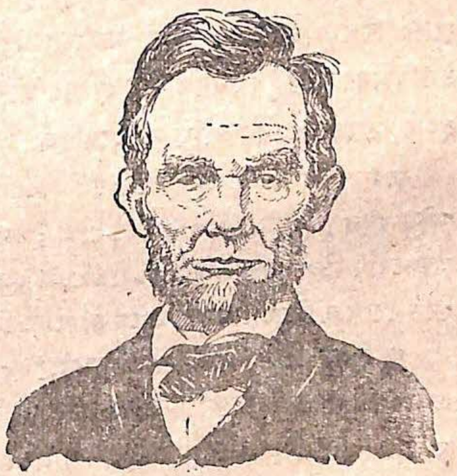
ড্রেড স্কট মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে একটি নতুন দল সৃষ্টি হয় এবং এই নতুন দলের নেতা হলেন এব্রাহাম লিঙ্কন।

আব্রাহাম লিঙ্কন:

জীবনী: আমেরিকার কেণ্টাকিতে এক অতি গরীবের গৃহে লিঙ্কনের জন্ম হয়। বাল্যকালেই তিনি খুব বলিষ্ঠ ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন জাহাজে কুলির কাজও করেন। তিনি যে কাজে হাত দিতেন তা ই সুসম্পন্ন করতেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে তিনি আইন ব্যবসায়ে ও রাজনীতিতে যোগ দেন। শীঘ্রই তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং তাঁর সাধু চরিত্রের কথা ক্রমে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ৫১ বৎসর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর নির্বাচন গৃহযুদ্ধের আর একটি কারণ। লিঙ্কন ছিলেন দাস-প্রথার ঘোর বিরোধী।

উদ্দেশ্য ও নীতি: আমেরিকায় দাস-প্রথা থাকবে কিনা এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লিঙ্কন জয়ী হন। এ কারণে দক্ষিণাঞ্চলের জনসাধারণ ভাবল যে লিঙ্কন নিশ্চয়ই আইন করে দাস-প্রথা রহিত করবেন। সুতরাং তারা উত্তরাঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে মনস্থ করল। লিঙ্কন দাস-প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন কিন্তু তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য সর্বপ্রথম কামনা করতেন এবং পরে দাস-প্রথার কথা ভাবতেন। আমেরিকার ঐক্য রক্ষার জন্য এমন কি তিনি আইন করে কেবল দক্ষিণাঞ্চলে দাস-প্রথা বজায় রাখতে চাইলেন। উত্তরাঞ্চলে অবশ্য তিনি দাস-প্রথা তুলে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীগণ এতেও সন্তুষ্ট হল না। তারা পৃথক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করল; ১৮৬১ ফলে খৃষ্টাব্দে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে যুদ্ধ বাধল।



আব্রাহাম লিঙ্কন

লিঙ্কন ও গৃহযুদ্ধ: গৃহযুদ্ধের সুরুতে দক্ষিণ অঞ্চলেরই জয় হচ্ছিল কিন্তু শেষে

লিঙ্কনের নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলেরই জয় হল। যুদ্ধ যখন চলছিল তখনই (১৮৬৩ খৃঃ) লিঙ্কন এক ঘোষণার দ্বারা দাস-প্রথার উচ্ছেদ করে নিগ্রো ক্রীতদাসদের মুক্তি দিলেন। লিঙ্কন পরাজিত দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কোন প্রতিশোধ নিতে চান নি। বরঞ্চ সর্বপ্রকার বিরোধের ক্ষত যাতে দূর করা যায় তারই চেষ্টা করেছিলেন। 'কারো প্রতি বিদ্বেষ না নিয়ে, সকলের প্রতি সমান অনুকম্পার মনোভাব নিয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার; জাতির সমস্ত ক্ষতকে নিরাময় করতে হবে,—লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্নিবাচিত হবার পর এই বাণী দেন। গৃহযুদ্ধ-শেষে একদিন থিয়েটার-গৃহে বুথ নামক এক গুপ্তঘাতকের গুলীতে তিনি সাংঘাতিক- ভাবে আহত হন এবং পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়।

আধুনিককালে, বিশেষতঃ আমেরিকার ইতিহাসে লিঙ্কনের মত রাষ্ট্রপতি বিরল। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করে বিশ্বের ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শ্রেষ্ঠ শক্তিতে উন্নীত হবার পথ সুগম করেন। গণতন্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি গণতন্ত্রকে "Government of the people, by the people, and for the people" বলেছিলেন। তাঁকে 'মহামতি' আব্রাহাম লিঙ্কন বললেও অতিশয়োক্তি করা হয় না।

গৃহযুদ্ধের ফলাফল: যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ প্রায় পাঁচ বছর ধরে চলেছিল। এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকায় প্রচুর তরুণের মৃত্যু ঘটে। সম্পত্তির বিনাশও হয় প্রচুর। ইউনিয়নের পক্ষেই তিনলক্ষ ষাট হাজার জনের মৃত্যু হয়। দক্ষিণের শুধু লোক ক্ষয়ই হয়নি, তাদের প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল।

যুদ্ধে দক্ষিণ অঞ্চল পরাজিত হয়। এর ফলে (ক) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য অটুট রইল; (খ) দাস-প্রথা উঠে গেল; (গ) দক্ষিণ অঞ্চলের যে সকল অর্থ নৈতিক অভিযোগ ছিল সেগুলি দূর করবার চেষ্টা হল; (ঘ) দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলি হতে দাস-প্রথা উঠে গেলেও নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বিদ্বেষ থেকে গেল।

গৃহযুদ্ধের ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দাস-প্রথার উচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু এই প্রথার উচ্ছেদ হলেও আমেরিকার কতকগুলি রাষ্ট্রে নিগ্রোদের অবস্থা সুবিধার নয়। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা ভাল হলেও শ্বেতাঙ্গদের মনে নিগ্রোদের সম্বন্ধে এমন এক হীন ধারণা বদ্ধমূল রয়েছে যে আইন করে সেটির উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নি। অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে সবিশেষ নজর দিয়েছেন।

গৃহযুদ্ধের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: গৃহযুদ্ধের অবসানের সাথে সাথেই

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক অধ্যায় শুরু হল। এই সময় হতে জাতি গঠনের ভিত্তি এবং গণতান্ত্রিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যমূলক জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠতে থাকল। এই সময় হতে আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। শিল্প-বিপ্লব পুরোপুরিভাবে দেখা দেয় এবং কয়েক বছরের মধ্যেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ পালটিয়ে গেল। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিণত হল।

আভ্যন্তরীণ উন্নতি

বিশ্বশক্তিরূপে আমেরিকার আত্মপ্রকাশ: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জগতে এখন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। রাশিয়ার আওতায় যে সকল রাষ্ট্র আছে সেগুলি ছাড়া জগতের সমস্ত দেশই আমেরিকার নিকট হতে হয় আর্থিক নয় সামরিক সাহায্য নিচ্ছে। যে আমেরিকা মনরো-নীতিকে তার বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি বলে মনে করত এবং ইউরোপীয় রাজনীতি হতে সরে ছিল সেই আমেরিকাই আজ জগৎব্যাপী প্রভাব বিস্তার করতে সদাচেষ্টিত।

উনিশ শতকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি: যুক্তরাষ্ট্র যে একটি বৃহৎ বিশ্বশক্তিতে পরিণত হবে তা অকল্পনীয় ছিল না। তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎ বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয় খুব দ্রুতভাবে। এই শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের সুবিধার্থে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যেমন মনরো-নীতির প্রয়োগ করেছে তেমনি এই নীতির পরিবর্তনও করছে।

মনরো নীতি: জেমস মনরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছিলেন (১৮১৭-২৫) তাঁর সময় যে নীতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করল তাঁর নামানুসারে সেই নীতিকে বলা হয় মনরো নীতি। এই নীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে আমেরিকা (উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা) আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ কোনক্রমেই বরদাস্ত করবে না। আমেরিকা আমেরিকা বাসীর জন্য। আমেরিকাও অন্য কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এই নীতির ফলে আমেরিকাতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের শোষণ করবার কোন সুযোগ আর রইল না।

গুরুত্ব: মনরো নীতি প্রথমে আত্মরক্ষামূলক নীতি বলে গণ্য হল। এর ফলে আমেরিকাবাসীগণের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হয় এবং বৃহত্তর ঐক্যসাধনে তারা ব্রতী হয়। বহির্বিশ্বের ঘটনাবলী নিয়ে তারা চিন্তা করল না। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যখনই খুব ক্ষমতাশালী রাষ্ট্ররূপে পরিণত হল, তখনই

নিজ স্বার্থানুকূলে 'মনরো' নীতির ব্যাখ্যা করল। পরবর্তীকালে বিশ্বের যে সকল বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিজ স্বার্থানুযায়ী তাতে যোগ দিয়েছে বা যোগ দিয়ে পরে সরে গেছে।

মনরো-নীতি যে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে (ক) গৃহযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো ব্যাপারে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে মেক্সিকো হতে ফরাসী সৈন্য অপসারণ করতে নির্দেশ দিল এবং ফরাসী সম্রাট সৈন্য সরাতে বাধ্য হলেন (১৮৬৫)।

(খ) ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ভেনেজুয়েলার সীমারেখা নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার মীমাংসা করে দিতে চাইল কিন্তু ইংল্যাণ্ড প্রথমে রাজি হয়নি, পরে অবশ্য ইংল্যাণ্ডকে বাধ্য হয়ে আমেরিকার মধ্যস্থতা মেনে নিতে হল। এটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে সার্বভৌম ক্ষমতা হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রথম সার্থক চেষ্টা।

(গ) এ ছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার নিকট হতে আলাস্কা ক্রয় করে এবং গৃহযুদ্ধে ইংল্যাণ্ড জাহাজ দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলকে সাহায্য করায় ইংল্যাণ্ডের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করে। একদিকে আমেরিকা যেমন মনরো নীতির মাধ্যমে প্রতিবেশীদের রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়েছিল, আবার অন্যদিকে বাইরে প্রভাব বিস্তার করবারও প্রবল ইচ্ছা ছিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের কিউবার বিদ্রোহে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে স্পেনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে স্পেন পরাজিত হয় এবং প্যারিসের শান্তি চুক্তির (১৮৯৮) ফলে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পোর্টেরিকো, গুয়াম, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ লাভ করে। এর ফলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আর আমেরিকা মহাদেশেই সীমাবদ্ধ রইল না, সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জাপানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রবেশ করল। চীনে যখন ইউরোপীয় শক্তিবর্গ নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং চীন ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করছিল সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজ স্বার্থে চীন ব্যবচ্ছেদে বাধা দেয় এবং চীনে 'Open Door' (মুক্ত দ্বার) নীতি গ্রহণ করে।

স্পেনের সাথে যুদ্ধ

বিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে থিয়োডোর রুজভেল্টের দৃঢ়তার জন্য কানাডা আলাস্কার দাবিগুলি মেনে নেয়।

রুশ-জাপান যুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা করে এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আলজেসিয়ার্স সম্মেলনে যোগ দেয়। কলম্বিয়ার নিকট হতে নানারূপ ষড়যন্ত্র করে পানামা অঞ্চলটি পৃথক করে নেয়; এবং পানামার নিকট হতে উপযুক্ত স্থান হস্তগত করে পানামা খাল খনন করে। এই এই খালের উপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব আজও রক্ষা করে আসছে। মেক্সিকোর বিপ্লবেও (১৯১৫) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে। এর পর সর্ব আমেরিকা কংগ্রেসের (Pan American Congress) প্রতিষ্ঠা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই গোলার্ধে রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করল।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনায় হস্তক্ষেপ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুরুতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করল। বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে লিপ্ত হয় বলে মনে করা হয়। আসলে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে পরিণত হয়। কিন্তু যুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্র আবার বিশ্বরাজনীতি হতে বিচ্ছিন্ন থাকবার নীতি অনুসরণ করল এবং রাষ্ট্রসংঘে যোগ না দেবার নীতি গ্রহণ করল। ফলে বিশ্বনেতৃত্ব করায়ত্ত করার সুযোগ হতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বঞ্চিত হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

যুদ্ধশেষে

ওয়াশিংটন সম্মেলন: কিন্তু দুটি বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিরাসক্ত থাকতে পারেনি। একটি হচ্ছে নৌশক্তি ব্যাপারে জাপানের সাথে প্রতিযোগিতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও সুদূর প্রাচ্যের প্রশ্নে। এই প্রশ্ন দুটি আলোচনার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সমেত নয়টি রাষ্ট্রের এক সম্মেলন ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনে আহ্বান করা হয়। এটিই **ওয়াশিংটন সম্মেলন** নামে পরিচিত। এই সম্মেলনে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একটি হচ্ছে চতুঃশক্তি (Four Power Treaty) চুক্তি। এই চুক্তিটির দ্বারা ঠিক হয় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ফ্রান্স ও জাপান প্রত্যেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলির ওপর অধিকার স্বীকার করে চলবে। অপর একটি চুক্তি হচ্ছে পঞ্চশক্তি চুক্তি (Five Power Treaty)। এ চুক্তিটির দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৌশক্তি হ্রাস করার চেষ্টা করা হয়। এটির দ্বারা ঠিক হয় যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স ও ইটালীর এই অনুপাতে যুদ্ধ-জাহাজ থাকবে—৫ : ৫ : ৩ : ১·৭৫ : ১·৭৫। এছাড়া

ওয়াশিংটন সম্মেলন

এই সম্মেলনে দুটি নবম-শক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, চীন, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল এবং বেলজিয়ামের মধ্যে এই চুক্তি দুটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এতে চীনের স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে বলে বলা হয়।

ওয়াশিংটন সম্মেলন যে উদ্দেশ্য ডাকা হয়েছিল তা সাফল্যমণ্ডিত হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান যে প্রাধান্য লাভ করেছিল তা বহুলাংশে হ্রাস পেল।

ষোড়শ অধ্যায়

সুদূরপ্রাচ্য—চীন ও জাপান

চীন ও জাপান : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন সাম্রাজ্য বাইরের জগত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। চীন নিজ সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিকে হীনচক্ষে দেখত। কিন্তু এই পাশ্চাত্ত্য শক্তির চাপেই চীন বহির্বিশ্বের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হয় এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বারংবার লাঞ্ছিত হয়।

চীনে সাম্রাজ্যবাদীদের হানা : শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপের রাজ্যগুলিতে বড় বড় কল-কারখানা গড়ে ওঠে। এ জন্য প্রচুর কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল। আবার এই সকল কল-কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যগুলিও বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃত বাজারের প্রয়োজন হল। এর ফলে চীন সাম্রাজ্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্যস্থল হল। প্রথমে পর্তুগীজগণ, পরে স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি জলপথে চীনে যায়। চীনের সম্রাট এই সকল জাতির নাবিক-দস্যুদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে ক্যাণ্টন ব্যতীত চীনের সর্বত্র বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। এতে ইংরেজদের আফিমের ব্যবসায়ে ক্ষতি হতে থাকে। ইংরেজরা গোপনে এই জঘন্য ব্যবসা ব্যাপকভাবে চালিয়ে যেতে থাকে।

চীনের সাথে ব্যবসা

প্রথম আফিম যুদ্ধ (১৮৪০-৪২) : চীনে ইংরেজদের প্রধান ব্যবসা ছিল আফিমের ব্যবসা। কিন্তু চীনে এ ব্যবসা করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল। চীন সরকার নানারূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল। ইংরেজ সরকার বাণিজ্যিক বিধি-নিষেধগুলি তুলে নেবার জন্য চীন সম্রাটকে অনুরোধ করলে তা প্রত্যাখ্যাত হল। এই সময় চীন-সম্রাট চীনে আফিম

যুদ্ধের কারণ

বিক্রয় বন্ধ করবার চেষ্টা করেন। ক্যান্টন শহরে ২০,০০০ আফিম ভর্তি বাক্স নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং বিদেশী ব্যবসায়ীদের আফিম-ব্যবসা হতে বিরত থাকতে আদেশ দেওয়া হয়। ইংরেজরা কিন্তু এই লাভজনক আফিম-ব্যবসা ছাড়তে রাজী হল না। ফলে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শক্তি চীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। এই যুদ্ধ 'প্রথম আফিম যুদ্ধ' নামে খ্যাত। দুই বৎসর ধরে যুদ্ধ চলেছিল। এবং শেষে চীন পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। নানকিং-এর সন্ধির ফলে হংকং দ্বীপটি ইংরেজদের অধীনে আসে। চীনের পাঁচটি বন্দরও ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার স্বাধীনতা পায়।

নানকিং-এর সন্ধি

কারণ ও ফলাফল

দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধ বা দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধঃ প্রথম আফিম যুদ্ধের ফলে বিদেশীদের হাতে চীনের লাঞ্ছনার সূচনা হয়। দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধ আরম্ভ হয় ইংরেজদের হিংস্র সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে চীনা কর্তৃপক্ষ একখানি চীনা-জাহাজ হতে বারজন লোককে গ্রেপ্তার করে। বন্দীরা যে জলদস্যু তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু জাহাজখানিতে যেহেতু ইংরেজ পতাকা ছিল সেহেতু ইংরেজ সরকার মনে করল যে, চীন ইংরেজ পতাকার অবমাননা করেছে। সুতরাং চীনের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়। চীন সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে অসম্মত হলে যুদ্ধ আরম্ভ হয় (১৮৫৬)। ফরাসীরা এই যুদ্ধে ইংরেজদের সহিত চীনের বিরুদ্ধে যোগদান করে, কারণ একজন ফরাসী পাদ্রী চীন-সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য দণ্ডিত হয়। এই যুদ্ধেও চীন পরাজিত হয়। তিয়েনসেনের সন্ধির (১৮৬১) ফলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করল। চীনের আরও ১১টি বন্দরে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বাণিজ্য করবার অধিকার পায়। এছাড়া, চীনকে বহির্বাণিজ্যের শুল্কসংক্রান্ত কর্তৃত্বভার ইউরোপীয়গণের হাতে ছেড়ে দিতে হয় এবং চীনদেশে ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার চীনা আইনে হবে না, তাদের নিজ নিজ দেশের আইনে হবে বলে চীনকে রাজী হতে হয়।

চীন হতে বিভিন্ন শক্তির সুযোগ সুবিধা আদায়

চীনে বিভিন্ন শক্তির প্রাধান্য স্থাপনঃ এরপর রাশিয়া, জার্মানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি চীনকে তাদের সহিত ঐরূপ অপমানজনক চুক্তি করতে বাধ্য করে। রাশিয়া চীনের উত্তরদিকে অবস্থিত মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ এবং ফ্রান্স দক্ষিণে অবস্থিত ইন্দোচীন গ্রাস করে। জাপানের হাতে চীন পরাজিত হলে ইউরোপীয় শক্তিগুলি চীনে আরও প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমে জার্মানি

কিয়াচো জেলাটি এবং সাণ্টুং বন্দরটি অধিকার করে। রাশিয়া চীনকে পোর্ট আর্থার বন্দরটি ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। ইংরেজ ও ইটালী চীনে নিজ নিজ অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করে। ইয়াংসিকিয়াং অঞ্চলে ইংরেজরা আধিপত্য করবার অধিকার আদায় করে। ফ্রান্স টন্‌কিন, য়ুনান ও কোয়াং চোয়াং অঞ্চলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের বক্সার বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকার মতন চীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে মনস্থ করল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বাধা দেয়, ফলে চীনের অখণ্ডতা রক্ষা পায়।

সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিরোধের ফলেই চীন শুধু টিকেই রইল না, চীনাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ দেখা দেয় এবং চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

চীনে প্রজাতন্ত্র : সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বারংবার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে চীনারা বুঝতে পারল তারা কত দুর্বল ও অসহায়। সে কারণে তারা দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতে প্রচুর বাধা ছিল। চীন প্রকাণ্ড দেশ, বিপুল লোক সংখ্যা তার, কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল এবং সামরিক সর্দারদের এবং বিদেশীগণের অত্যাচারে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। চীনাগণ তাদের এই দুরবস্থার জন্য বিদেশীগণকে এবং মাঞ্চু রাজবংশকে প্রধানত দায়ী করল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বক্সার নামক এক গোঁড়া দেশভক্ত দল বিদেশীগণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করল। এটিকে বক্সার বিদ্রোহ বা 'মুষ্টিযোদ্ধা বিদ্রোহ' বলা হয়। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় কারণ ইউরোপীয়গণ এক সম্মিলিত অভিযান প্রেরণ করে এটি দমন করে এবং এর পর চীনের ওপর ইউরোপীয়রা আরও অত্যাচার শুরু করল।

বক্সার বিদ্রোহ

চীনাদের জীবনে যখন ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছিল ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন এক সঞ্জীবনী শক্তির সাহায্যে মৃত জাতিকে এক নতুন আশায় উজ্জীবিত করলেন। তিনি চীনাদের জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত করেন।

'বক্সার বিদ্রোহ' চীনাদের মনে বিদেশীর প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি করল। এই সময় 'চীন নবজাগরণ সমিতি' নাম দিয়ে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন একটি সমিতি স্থাপন করেন। পরে ডাঃ সান এই সমিতির নাম দেন কুয়োমিণ্টাং বা জাতীয়তাবাদী দল। আমাদের দেশে কংগ্রেস যেমন স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলে সেই রকম চীনের কুয়োমিণ্টাং দলও চীনে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করে। কুয়োমিণ্টাং দল পাশ্চাত্য

চীনের বিপ্লব

ভাবধারাকে স্বীকার ও গ্রহণ করে পাশ্চাত্য রীতিতে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করে। এরা চীনে মাঞ্চু রাজবংশের শাসনের স্থলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। দেশের সর্বহারাদের অবস্থার উন্নতি করতেও চেষ্টা চলল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কুয়োমিণ্টাং দল মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে দক্ষিণ চীনে বিদ্রোহ করল। শীঘ্রই এই বিদ্রোহ চীনের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহীরা জয়ী হল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

কুয়োমিণ্টাং দল ও ডাঃ সান

এই প্রজাতন্ত্রের ডাঃ সানই প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে অন্য নেতার অধীনে চীন আরও শক্তিশালী হতে পারে তখন তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। এইরূপ আত্মত্যাগ ও স্বদেশপ্রেম আধুনিক পৃথিবীতে বিরল।

রাষ্ট্রপতির পদ হতে পদত্যাগ করে তিনি কুয়োমিণ্টাং দলকে আরও শক্তিশালী করতে চেষ্টা করলেন। চীনের সে সময়কার তিনটি প্রধান সমস্যার বিরুদ্ধে ডাঃ সান প্রাণপণ সংগ্রাম করেন—দেশের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দূর করে শান্তি স্থাপন করা; বিদেশীর স্বার্থ ও প্রাধান্য লোপ করা; এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের মনোভাব পরিবর্তন করা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও চীন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও চীন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন অনেক আশা নিয়ে মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। কিন্তু চীনের কোন লাভই হয়নি। জাপান যুদ্ধের সময় চীনের নিকট একুশ দফা দাবী উত্থাপন করে এবং চীনের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি য়ুয়ান-শি-কাই নিজের স্বিধার্থে জাপানের অন্যায় দাবীগুলির অধিকাংশই মেনে নেন। কিন্তু চীনের জনসাধারণ এই অন্যায় দাবীগুলি মানতে কোন মতেই রাজী হয় নি। যুদ্ধশেষে চীনের প্রতিনিধিগণ শান্তি সম্মেলনে বহু আশা নিয়ে যোগদান করেন এবং জার্মান অধিকৃত শাণ্টুং প্রদেশ প্রত্যর্পণের দাবী ও চীনের সহিত পাশ্চাত্য শক্তিগুলির যে অসম চুক্তিগুলি ছিল সেগুলি রদ করতে বলেন। কিন্তু চীনের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি অগ্রাহ্য হয়।

জাপ-বিরোধী নীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই চীন দেশে সর্বত্র ধর্মঘট, ছাত্র ও শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ মূলতঃ জাপানের বিরুদ্ধে পরিচালিত হল। জাপানী পণ্য বয়কট করা হয়। এর একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও ছিল। চীনারা ইউরোপ-আমেরিকানদের বিরুদ্ধাচরণ না করে জাপানের বিরুদ্ধাচরণ কেন করেছিল? এর সদুত্তর হিসেবে বলা যায় যে, জাপানের বিশেষ উন্নতিতে চীন ঈর্ষান্বিত হয় এবং এশিয়াবাসী হয়ে জাপান চীনের প্রতি যে

দুর্ব্যবহার করে তা চীনের অচিন্তনীয় ছিল। চীনে জাপবিরোধী আন্দোলন ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২) পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনের অখণ্ডতা রক্ষা করা হবে বলে বৈঠকে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলি ঘোষণা করে এবং দুটি চুক্তিও সম্পাদন করে। জাপান শাণ্টুং প্রদেশ চীনকে প্রত্যর্পণ করে। ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনের প্রথম কূটনৈতিক জয় সূচিত হয়।

ওয়াশিংটন সম্মেলন

এই সময়ে চীনের বহু সেনানায়ক উত্তর চীনে নিজ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ স্বার্থের জন্য ঐ সকল স্বাধীন সেনানায়কদের সমর্থন করে। কিন্তু এর মধ্যে চীনের ছাত্র ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও চীনের মুক্তি আকাঙ্ক্ষা প্রবল হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রসার ঘটে। দক্ষিণ ক্যাণ্টনে চীনের জাতীয়তাবাদী দলের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এই দলের নেতা ছিলেন ডাঃ সান-ইয়াৎ-সেন। তিনি নব্য চীনের জনক। ১৯২৩ সালে তিনি ক্যাণ্টন সরকারের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সামরিক নেতাদের বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। ১৯২১ সালে চীনে একটি কমিউনিষ্ট দল গড়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান দেখা দেয়। ডাঃ সান চীনকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য সাম্যবাদী রাশিয়ার সর্বপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করেন। মাইকেল বোরোডিন নামক এক রুশ সাম্যবাদী নেতা তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। রাশিয়া ও চীনের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির দ্বারা রাশিয়া চীনকে সমপর্যায়ভুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে নেয় এবং চীন দেশে রাশিয়ার যে সকল বিশেষ অধিকার ছিল সেগুলি রাশিয়া পরিত্যাগ করে। ডাঃ সান রাশিয়াকেই চীনের প্রকৃত বন্ধু বলে ঘোষণা করেন। ১৯২৪ সালে চীনের কমিউনিষ্টদের

চীনের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস

ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের নীতি ও কৃতিত্ব



ডাঃ সান ইয়াৎ সেন

কুয়োমিণ্টাং দলের সদস্য হবার যে সকল বাধা ছিল সেগুলি দূর করা হল। এর ফলে কুয়োমিণ্টাং দল দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীতে বিভক্ত হল। ডাঃ সানের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—সান, মিন ও চু (San, min, Chu) বা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের জীবিকা। তাঁর এই নীতি তিনটি চীনের নিকট আদর্শস্বরূপ হল।

চিয়াং-কাই শেক—১৯২৫ সালে সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হয় এবং তাঁর সহকর্মী চিয়াং কাই শেক কুমোমিণ্টাং দলের নেতা হন। তিনি সমস্ত চীনকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য চেষ্টা করেন। ১৯২৬ সালে তিনি উত্তর চীনে স্বাধীন সামরিক নেতাদের বশীভূত করবার জন্য এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই চীনের অনেক স্থান চিয়াং-এর হস্তগত হয় কিন্তু ঠিক এই সময় কুয়োমিণ্টাং দলের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়ে বিরোধ আরম্ভ হয়। কুয়োমিণ্টাং দল দুভাগে বিভক্ত হয়—বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী। বামপন্থী দল ছিল সাম্যবাদে বিশ্বাসী আর দক্ষিণপন্থী দল ছিল রক্ষণশীল। চিয়াং দক্ষিণপন্থী ছিলেন। ১৯২৭ সালে চিয়াং রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কালক্রমে চীনে দুটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়—চিয়াং সরকার বা কুয়োমিণ্টাং সরকার এবং কমিউনিষ্ট সরকার। চিয়াং কাইশেক পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাদের সহিত হাত মিলিয়ে চলতে থাকেন, সে কারণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চিয়াং সরকারকেই চীনের জাতীয় সরকার বলে স্বীকার করেন। এই কারণে চিয়াং-কাই-শেকের সহিত কমিউনিষ্টদের বিরোধ বাধে এবং শেষে তাহা গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। চিয়াং কমিউনিষ্ট দমনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিষ্ট সরকারের বিলোপ সাধন করতে পারেন নি। কমিউনিষ্টগণ নানকিং পরিত্যাগ করলেও উত্তর চীনের ইয়েনানে একটি নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় এবং প্রায় পাঁচ কোটি অধিবাসী এই শাসনে থাকে।

ক্ষমতালাভ

চিয়াং-এর সাম্যবাদ বিরোধী নীতি

গৃহযুদ্ধ

চীনের গৃহযুদ্ধের সুযোগে জাপান পুনরায় চীন অধিকার করবার চেষ্টা করে। ১৯৩১ সালে জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে অধিকার করে। এর পর কয়েক বৎসর ধরে জাপান চীনের ভেতর প্রবেশ করতে থাকে। ১৯৩৭ সালে জাপান চীনের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। জাপানের এই বর্বর আক্রমণের ফলে চীনে

জাতীয়তাবোধ নতুন ভাবে উদ্দীপিত হয়। চিয়াংপন্থী ও কমিউনিষ্টদের মধ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি যুক্তফ্রণ্ট গড়ে উঠে। চীনের কমিউনিস্টগণ জাপানের বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়াই করে এবং এর ফলে চীনাদের মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলন পূর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইহাতে চিয়াংপন্থীরা ভীত হন এবং পুনরায় চীনে কুয়োমিণ্টাং কমিউনিস্ট বিরোধ আরম্ভ হয়।

জাপানের চীন আক্রমণ ও ফলাফল

চিয়াং-এর শাসনে দেশে অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হল। এদিকে কমিউনিস্টগণ উত্তর চীনে বহু পূর্ব হতেই আধিপত্য স্থাপন করেছিল। সেখানে কমিউনিস্টরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সমর্থ হয়। প্রথমেই তারা জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে তা ভাগ করে দেয়। ফলে চিয়াং শাসিত অঞ্চলের কৃষকরাও অনুরূপ ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে এবং কমিউনিস্টদের 'মুক্তিফৌজ উপস্থিত হলে কৃষকগণ তাদের সাহায্য করতে থাকে।

চিয়াং সরকারের দোষত্রুটি

জাপানের উত্থান : মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে জাপানের অবদান নগণ্য। জাপানের প্রাচীন বা মধ্যযুগের ইতিহাসে এমন কিছু ঘটনা ঘটেনি যার জন্য ইতিহাসের ছাত্র জাপানকে স্মরণ করবে।

অবশ্য আধুনিককালের ইতিহাসে জাপান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জাপান পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করে পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নানাবিধ সংস্কার সাধন করে এবং অতি দ্রুত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমকক্ষ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

জাপানের রুদ্ধদ্বার নীতি : ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জাপান সর্বপ্রথম ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসে। পর্তুগীজগণ জাপানে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে এবং খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহু জাপানী নতুন ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মপ্রচারকদের পিছনে ইউরোপীয়দের রাজ্য বিস্তারের দুরভিসন্ধিও ছিল। সে কারণে জাপানীরা খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক ও খৃষ্টানদের ওপর উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং জাপানে ইউরোপীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। জাপানীদেরও জাপানের বাইরে যাওয়া বন্ধ করা হয়। এইভাবে জাপান বহির্জগৎ হতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

জাপানে পাশ্চাত্ত্য শক্তির প্রবেশ : ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৮ জন আমেরিকান নাবিক জাহাজ-ডুবির ফলে জাপানে এসে উঠলে জাপানীরা তাদের বন্দী করে। আমেরিকার একটি জাহাজ এসে তাদের মুক্তি চাইলে জাপানীরা কামান দেগে তাড়িয়ে দেয়। এর পর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নৌ-সেনানায়ক কমোডার পেরী চারখানি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে জাপানে এসে পৌছালেন এবং জাপানের সম্রাট ও শোগানের (প্রকৃত শাসনকর্তা) কাছে দুটি পত্র পাঠালেন। পর বৎসর (১৮৫৪) তিনি আবার দশখানি জাহাজ নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং পাঁচশত সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে জাপানে অবতরণ করলেন। জাপানীরা বুঝল, বলপূর্বক আমেরিকাকে বাধা দেওয়া সম্ভব হবে না। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত জাপানের চুক্তি হয়। এর ফলে জাপানের দ্বার বৈদেশিকদের নিকট উন্মুক্ত হয়। আমেরিকার দেখাদেখি অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ জাপানে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা চায়। জাপানকে বাধ্য হয়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলির সহিত অপমানজনক সন্ধি করতে হয়। পরবর্তীকালে জাপান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা গ্রহণ করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সমকক্ষ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

আমেরিকার সাথে চুক্তি

জাপানে নবজাগরণ : জাপানের চিন্তাশীল লোকেরা বুঝলেন যে, জাপান এক মহা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। দেশকে বিদেশীগণের হাত হতে রক্ষা করতে হলে প্রথমত শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করে দেশে ঐক্য স্থাপন করতে হবে,— দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমের রণকৌশল ও বাণিজ্য-নীতি আয়ত্ত করে পশ্চিমের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হবে। এর ফলে জাপানের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে এক রক্তশূন্য বিপ্লব সাধিত হল যা ইতিহাসে সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় না। এই সময় জাপানের সম্রাটের কোন ক্ষমতা ছিল না। দেশ শাসন করতেন শোগান উপাধিধারী এক সামন্ত এবং যুদ্ধ করত সামুরাই সম্প্রদায়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে শোগান স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন। জাপানের অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের সুযোগ-সুবিধা স্বেচ্ছায় বর্জন করে সাধারণ শ্রেণীতে পরিণত হল। সামুরাই সম্প্রদায় যুদ্ধ করার একচেটিয়া অধিকার ত্যাগ করল। জাপানের সম্রাট বা মিকাডো নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা নিলেন। বিনা রক্তপাতে এরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব খুব কমই ঘটে থাকে। জাপানের ইতিহাসে এই যুগান্তকারী ঘটনাকে 'মিকাডোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা' বলা হয়।

আভ্যন্তরীণ বিপ্লব

জাপানে শাসন সংস্কার : ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জাপানের সম্রাট মুৎসোহিটো জাপানকে শক্তিশালী করে তোলবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। জাপানের আইন-

কানুন বিধিবদ্ধ করা হল। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আবশ্যিক করা হল এবং ইংরেজী ভাষা অবশ্য-পাঠ্য বলে গণ্য হল। পশ্চিমের নানা বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য দলে দলে জাপানী যুবকদের প্রেরণ করা হল। জাপানীগণ ইংরেজদের নৌবিদ্যা, জার্মানদের রণনীতি এবং আমেরিকার ব্যবসা-বুদ্ধি আয়ত্ত করল। প্রাশিয়ার আদর্শে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করা হল (১৮৮৯)। পাশ্চাত্ত্য প্রথায় যুদ্ধের উপকরণ তৈরী করে জাপান একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হল।

আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন

শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে জাপান: মাত্র ২৫ বৎসরের মধ্যেই জাপান তার মধ্যযুগীয় দুর্বল রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হতে একটি উন্নত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রথমে কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ জাপানের এই উন্নতি গ্রাহ্য করে নি। সে কারণে জাপান যখন পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির সহিত সম্পাদিত বৈষম্যমূলক চুক্তিগুলির পরিবর্তন করতে চাইল এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলিকে অনুরোধ জানাল তখন কিন্তু বিদেশী শক্তিগুলি জাপানের এই অনুরোধ কর্ণপাত করল না। জাপান তখন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল যে, আসুরিক শক্তি না দেখাতে পারলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার স্থান ত হবেই না বরঞ্চ পাশ্চাত্ত্য শক্তির অপমান নীরবে সহ্য করতে হবে।

এর পর জাপান পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির মতন সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠল। অবশ্য এর পিছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনেক কারণ ছিল। প্রতিবেশী চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাপান পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির মতন চীনের নিকট অনেক সুযোগ-সুবিধা দাবী করল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কিউরাইল দ্বীপ নিজের দখলে আনল। বনিন দ্বীপও জাপানের অধীনে চলে গেল। এর পর জাপান কোরিয়ার উপর নজর দিল। কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থিতিই জাপানকে এর দিকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করল—চীন, জাপান ও রাশিয়ার সংযোগ স্থলে কোরিয়া অবস্থিত ছিল। এছাড়া কোরিয়ার সামরিক গুরুত্বও ছিল প্রচণ্ড।

জাপানের সম্প্রসারণ নীতি

কোরিয়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন ছিল। অবশ্য চীন কোরিয়াকে করদ রাজ্য বলে মনে করত, যদিও চীনের প্রভাব কোরিয়ায় বিশেষ ছিল না।

কোরিয়া নিয়ে চীন জাপান দ্বন্দ্ব

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জাপান কোরিয়ায়, সাথে একটি বাণিজ্যিক ও মৈত্রীমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে জাপান কোরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে মেনে নেয়। এতে

চীন প্রতিবাদ জানায় এবং কোরিয়াকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত নানারূপ চুক্তি করতে পরামর্শ দেয়। ফলে কোরিয়ায় গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। এটি বন্ধ করবার জন্য চীন ও জাপান উভয়েই কোরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করে। এমনকি চীন ও জাপানী সৈন্যদলের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষও ঘটে। এর পর চীন ও জাপান ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কোরিয়াকে কেন্দ্র করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুসারে ঠিক হয় যে, কোরিয়া হতে উভয়েই সৈন্য সরিয়ে নেবে ; ভবিষ্যতে কোন পক্ষ যদি কোরিয়াতে সৈন্য প্রেরণ করতে ইচ্ছুক হয় তা হলে অপর পক্ষকে আগেই জানাতে হবে ; কোরিয়ার একটি নিজস্ব সৈন্যবাহিনী থাকবে এবং এই সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করবে তৃতীয় কোন শক্তি।

চীন ও জাপানের যুদ্ধ : কোরিয়া সম্বন্ধে চীন ও জাপানের এই বোঝাপড়া খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের সুরুতেই কোরিয়ায় গুপ্ত সমিতিগুলির নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদেশীদের কোরিয়া হতে তাড়িয়ে দেবার জন্যই এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ দমন করবার জন্য কোরিয়ার রাজা কোরিয়াস্থ চৈনিক রাজদূতের পরামর্শে চীন সম্রাটের সাহায্য চেয়ে পাঠান। জাপানকে পূর্বেই খবর দিয়ে চীন কোরিয়ার সৈন্য প্রেরণ করল। কিন্তু চীন ও জাপানের সৈন্য কোরিয়ায় পৌঁছাবার পূর্বেই কোরিয়ায় বিদ্রোহ দমিত হল।

এই সময় জাপান চীনের নিকট এক প্রস্তাব পেশ করে। এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল যে কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী চীন ও জাপান এক জোটে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। চীন এই প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করলে জাপান ঘোষণা করল যে, সে একাই কোরিয়ার সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে জাপান দুর্বল কোরিয়া সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং কোরিয়া সরকার চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জাপানের সাহায্য প্রার্থনা করে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, জাপান কোরিয়াকে সামরিক সাহায্য দেবার জন্য যেন অপেক্ষা করছিল। চীন জাপানের সহিত বোঝাপড়া করবার জন্য যুদ্ধকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করল। ফলে শুরু হল ১৮৯৪-৯৫ এর চীন-জাপান যুদ্ধ।

যুদ্ধের কারণ : জাপান একটি ক্ষুদ্র দেশ, কিন্তু দেশের আয়তনের তুলনায় জাপানে লোকসংখ্যা বেশী। সে কারণে চীনের অধীনে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য জাপান পরিকল্পনা করে। জাপানে অল্পদিনের মধ্যেই শিল্প-বিপ্লব দেখা দেয়। ফলে, জাপানের কলকারখানাগুলির জন্য কাঁচামাল এবং শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য বাজারের প্রয়োজন হলে জাপান চীনের দিকে দৃষ্টি দিল।

কারণ চীন তখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। জাপানও অনুরূপ সুয়োগ-সুবিধা দাবী করল কিন্তু চীন কর্ণপাত করল না। ফলে, জাপান যুদ্ধের পথ গ্রহণ করল। জাপান কোরিয়ার ওপর চীনের আধিপত্য মানতে রাজী হল না। এই সময় কোরিয়ায় পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি আধিপত্য স্থাপন করছিল। জাপান এতে ভীত হল, কারণ কোরিয়া জাপানের খুবই নিকটে। জাপান তার নবলব্ধ শক্তির পরিচয় দিতে উদ্‌গ্রীব হল যার ফলে পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলি জাপানের প্রতি আর বৈষম্যমূলক ব্যবহার করতে ভয় পাবে। তাছাড়া কোরিয়াকে ভবিষ্যতে 'Jumping ground' হিসাবে ব্যবহার করা যাবে ভেবে জাপান এ দেশটিকে নিজের অধিকারে আনতে চাইল।

যুদ্ধের দায়িত্ব ঃ এই যুদ্ধের জন্য দায়ী কেবলমাত্র জাপানেরই ছিল না। চীনও সমভাবেই দায়ী ছিল। তখনকার চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। চীনের মূল ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদীরা যে হামলা চালাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে চীন সরকার কিছুই করতে পারছিল না। এ অবস্থায় কোরিয়ায় তার মিথ্যা কর্তৃত্ব রাখবার জন্য জাপানের সাথে যুদ্ধ করা একেবারেই উচিত হয়নি।

চীনের দায়িত্ব

যুদ্ধের গতি ঃ এই যুদ্ধে জাপান যে চীনের নিকট পরাজিত হবে তা সকলেই মনে করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের সুরুতেই বোঝা গেল চীনই পরাজিত হবে। যুদ্ধের কয়েক মাসের মধ্যেই জাপান কোরিয়া হতে চীনকে বিতাড়িত করল এবং ইয়ালু নদী পার হয়ে জাপানী সৈন্য মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করে চীনের রাজধানী পিকিং-এর দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। চীন সরকার জাপানের সাথে সন্ধি করবার জন্য ব্যগ্র হল। এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের **সিমনোসেকির চুক্তি** দ্বারা চীন-জাপান যুদ্ধের অবসান ঘটল। এই চুক্তি স্বাক্ষরের আগেই চীন জাপানের শক্তি খর্ব করবার জন্য জার্মানী, রাশিয়া ও ফ্রান্সের সাথে এক চুক্তি করে. যারা ফলে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের সিমনোসেকির সন্ধির কয়েকটি শর্ত কার্যকরী হতে পারেনি।

চীনের পরাজয়

সন্ধি স্থাপন

সিমনোসেকির চুক্তির শর্তগুলির মধ্যে এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(ক) চীন কোরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল। (খ) লিয়াওটাং উপদ্বীপ জাপানকে ছেড়ে দিতে হল। এই অঞ্চল জাপানের অধীনে চলে গেলে জাপান সমগ্র চীনের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবে বলে রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স এর বিরোধিতা করে এবং

সন্ধির শর্ত

যার ফলে জাপান এই অঞ্চল পেয়েও পেল না। (গ) চীন ফরমোসা ও পেসকাডোরেস জাপানকে ছেড়ে দিল। (ঘ) জাপানকে চীনদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা দিতে হল এবং এরজন্য চারটি বন্দর চীন জাপানী বণিকদের জন্য উন্মুক্ত করল। (ঙ) চীনকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে হল।

পরোক্ষ ফল

চীন-জাপানের যুদ্ধ দূর-প্রাচ্যের আধুনিক ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চীনকে পরাজিত করাতে ইউরোপীয়দের নিকট জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি জাপানের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হল। 'পীত বিপদ' (Yellow Peril) পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গকে চিন্তিত করে তুলল। জাপান এই যুদ্ধজয়ের ফলে পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির সহিত তার পূর্বের অ-সম ও অপমানজনক চুক্তিগুলি নাকচ করতে সমর্থ হল। জাপানে বৈদেশিক জাতিগুলির extra-territorial অধিকারগুলি পরিত্যক্ত হল, এবং শুল্ক স্থাপনের উপর জাপান তার কর্তৃত্ব ফিরে পেল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-জাপান চুক্তি ইউরোপীয়দের নিকট জাপানের কিরূপ মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা প্রমাণ করে। এই চুক্তিটি জাপান ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত হয়। চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়ী না হলে এটি কখনও সম্ভব হত না। এই যুদ্ধজয়ের ফলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারিত হবার পথ খুঁজে পেল। জাপান ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া দখল করল এবং চীনদেশের মূল ভূখণ্ডে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। জাপানের আভ্যন্তরীণ নীতিতে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রেও এই যুদ্ধজয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাপানী জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবাদ তীব্রতর হয়। কোরিয়া ও চীনদেশে জাপানী শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি হওয়ায় জাপানে শিল্পায়ন দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। ইস্পাত, কার্পাস, সিল্ক ও জাহাজ শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে।

জাপানের দিক হতে

চীনের পক্ষে

চীন-জাপান যুদ্ধ চীনের পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক হল। সিমনোসেকির চুক্তির শর্তগুলিকে এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল বলা যেতে পারে। এই চুক্তি অনুসারে চীনকে বহু অঞ্চল ও বিরাট ক্ষতিপূরণ জাপানকে দিতে হল। এ ছাড়া, এই যুদ্ধের পরোক্ষ ফলাফল চীনের পক্ষে আরও মারাত্মক হল। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চীন তার অন্তঃসারশূন্যতা ও দুর্বলতা প্রকাশ করল। চীন সাম্রাজ্য এশিয়া মহাদেশের 'রুগ্ন ব্যক্তি'তে পরিণত হল। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি চীনদেশে কনসেশনের লড়াই (Battle for the Concession) সুরু করল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকার মতন চীনদেশকেও

ব্যবচ্ছেদ করবার চেষ্টা করল। চীনদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব লোপ পাবার আশঙ্কা দেখা দিল। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে চীনদেশে জাতীয়তাবাদী ও বিদেশী বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি হল। জাপানের হস্তে পরাজয়ের ফলে চীনের মাঞ্চু সাম্রাজ্যকে সংস্কার ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আদর্শে পুনর্গঠিত করবার জন্য আন্দোলন দেখা দিল।

রুশ-জাপান যুদ্ধ : জাপানের শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হবার পিছনে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। রাশিয়া জাপানকে চীন-জাপান যুদ্ধের ফল সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে দেয়নি। লিয়াওটুঙ উপদ্বীপ এবং পোর্টআর্থার বন্দর জাপানকে ফিরিয়ে দিতে হয় এবং রাশিয়া এই দুটি স্থান গ্রাস করে নেয়। চীনে বক্সার বিদ্রোহের সুযোগে রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং কোরিয়াতেও তার প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়।

যুদ্ধের কারণ

রাশিয়ার অভিসন্ধিতে জাপান ও ইংল্যাণ্ড ভীত হল এবং ফলে এই দুই রাষ্ট্র ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এই চুক্তির ফলে রুশ-জাপান যুদ্ধ ত্বরান্বিত হল। কারণ এই চুক্তির জন্য অন্য কোন ইউরোপীয় শক্তি যুদ্ধে যোগ দিতে পারেনি। চুক্তিটির অন্যতম শর্ত ছিল যে, যদি একাধিক কোন রাষ্ট্র যুগপৎ জাপান বা ইংল্যাণ্ডকে আক্রমণ করে তবে একে অন্যকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করবে।

ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি

ইঙ্গ-জাপান চুক্তি সম্পাদিত হবার পর জাপান ও রাশিয়া এক বৈঠকে মিলিত হয়। এতে ঠিক হয় যে, রাশিয়া ক্রমে ক্রমে মাঞ্চুরিয়া হতে তার সৈন্য সরিয়ে নেবে। কিন্তু দেখা গেল রাশিয়া তার সৈন্য সরিয়ে নিলই না, বরঞ্চ মাঞ্চুরিয়ায় সামরিক শক্তি বাড়াল এবং কোরিয়াতে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারে মনোযোগী হল। রাশিয়ার এই অভিসন্ধি জাপানকে ভাবিয়ে তুলল।

মাঞ্চুরিয়ায় রুশস্বার্থ ও জাপানের বিরোধিতা

জাপান রাশিয়ার নিকট প্রস্তাব করল যে, রাশিয়া ও জাপান উভয়েই কোরিয়া ও চীনের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা স্বীকার করবে এবং এই দেশে উভয় পক্ষই সমান সুযোগ-সুবিধা পাবে। কোরিয়াতে জাপানের বিশেষ স্বার্থ রাশিয়া স্বীকার করলে জাপানও মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার বিশেষ স্বার্থ স্বীকার করবে। জাপানের এই প্রস্তাব রাশিয়া গ্রহণ না করে পাল্টা এক প্রস্তাব পেশ করল। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, দক্ষিণ কোরিয়ায় জাপানী স্বার্থ রাশিয়া স্বীকার করতে প্রস্তুত কিন্তু উত্তর কোরিয়া অঞ্চল নিরপেক্ষ থাকবে এবং মাঞ্চুরিয়া হতে জাপান সরে যাবে। কিছুদিন ধরে উভয় শক্তির মধ্যে

কোরিয়ায় রাশিয়ার অভিসন্ধি

কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা চলতে থাকল। এর ভেতর রাশিয়া কাঠুরিয়ার ছদ্মবেশে কিছু সংখ্যক রুশসৈন্য কোরিয়ায় প্রেরণ করে। জাপান এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

যুদ্ধের গতি ঃ রাশিয়া তখন ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি, আর কোথায় ক্ষুদ্র জাপান। জাপান যে রাশিয়ার হাতে পরাজিত হবেই তা সকলেই ভেবেছিল, কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করল জাপান। প্রথমেই কোরিয়ার ইয়ালু নদীতে রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে। এর পর লিয়াও-ইয়াং, সাহো, পোর্ট আর্থার এবং মুকডেনের যুদ্ধে জাপান জয়ী হল। ১৯০৫-এর মে মাসে সংঘটিত সুসিমার বিখ্যাত নৌযুদ্ধে (The Battle of Tsushima) রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধের পর এত বড় নৌযুদ্ধ আর হয়নি। এই নিদারুণ পরাজয়ের পর রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ পরিত্যাগ করা ছাড়া উপায় রইল না।

রাশিয়ার পরাজয়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মধ্যস্থতায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পোর্টস মাউথে জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হল। এই সন্ধি অনুসারে কোরিয়াতে জাপানের আধিপত্য রাশিয়া স্বীকার করল; জাপান লিয়াওটুঙ উপদ্বীপের ইজারা লাভ করল এবং পোর্ট আর্থার পর্যন্ত রুশ রেলপথের কতক অংশ জাপানের পরিচালনাধীনে এল। রাশিয়া জাপানকে শাখালিন দ্বীপের দক্ষিণ অংশ ছেড়ে দিল এবং মাঞ্চুরিয়া হতে সৈন্য সরিয়ে নিল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ অবশ্য রাশিয়াকে দিতে হল না।

পোর্টসমাউথের সন্ধি

রুশ-জাপান যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল ঃ রুশ-জাপান যুদ্ধের ফল সুদূর-প্রসারী হয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এই যুদ্ধের ফল লক্ষ্য করা যায়। এই যুদ্ধজয়ে জাপানের মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে গেল এবং জাপান প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হল। জাপানের সাম্রাজ্য লিপ্সা বাড়তির পথেই থাকল। মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনে জাপান তার প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেল।

জাপানের দিক হতে

যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হল। এই অঞ্চলে রাশিয়া সাম্রাজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ত্যাগ করল। জাপানের হাতে পরাজিত হয়ে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ল। রাশিয়ার শাসন-সংস্কারের দাবী নিয়ে এক বিপ্লব দেখা দিল।

রাশিয়ার ক্ষেত্রে

রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ে এশিয়ার জনসাধারণের আনন্দের

সীমা রইল না। অনেকে জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়কে এশিয়ায় ইউরোপের আধিপত্যের অবসানের সূচনা বলে মনে করল। চীনে 'চীন নবজাগরণ সমিতি'নাম দিয়ে একটি সমিতি স্থাপিত হল। এই সমিতি চীনে জাতীয়তাবোধ জাগায়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসেও জাপানের জয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এই সময় খুব জোরদার হয়।

চীন ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে

রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের সুযোগ নিল অষ্ট্রিয়া। বোসনিয়া ও হারজিগোভিনা নামক বলকান অঞ্চলে অবস্থিত দুটি প্রদেশ তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ডের সাথে রাশিয়ার মৈত্রীমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সম্ভাবনা দেখা গেল। ইংল্যাণ্ডের বহুদিনের রুশভীতি দূর হল। এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ বোঝাপড়া সম্ভব হল।

ইউরোপে

রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সা বেড়েই চলল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সে কোরিয়া দখল করল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও জাপান: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জাপানের পক্ষে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়। সুদূর প্রাচ্যে জাপান অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে পরিগণিত হয়। নিজের সুবিধার জন্য জাপান মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং চীনদেশে অবস্থিত জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চলগুলি অধিকার করে নেয়। চীন এর তীব্র প্রতিবাদ করলে জাপান চীনের নিকট একুশ দফা দাবী উপস্থিত করে। চীনের স্বাধীনতা হরণ করাই ছিল এই দাবীর মূল উদ্দেশ্য। চীনের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জাপানের অন্যায় দাবীগুলি মেনে নেন কিন্তু চীনজাতি সমগ্রভাবে জাপানের অন্যায় দাবীগুলি মানতে রাজী হয়নি। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই উন্নতি লাভ করে। মিত্রশক্তি প্রচুর পরিমাণে জিনিস-পত্র জাপানের নিকট হতে ক্রয় করে। এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলিতে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া জাপানের রণতরী ভূমধ্যসাগরে মিত্রপক্ষের সাহায্যের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে জাপানের সম্মান খুবই বেড়ে যায়। কারণ ভাস্কো-দাগামার জলপথে ভারতে আসার পর হতে প্রাচ্যের কোন রাষ্ট্রেরই শক্তির প্রতীক হিসেবে কোন জাহাজ ভূমধ্যসাগরে যেতে পারেনি। জাপানের তথা এশিয়ার ইতিহাসে এটি এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

চীনের ওপর জাপানের অন্যায় দাবীর বিরোধিতা কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র

করতে সাহসী হয় নি। বরঞ্চ তারা জাপানকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র লানসিং ইশাই এগ্রিমেণ্টের দ্বারা (Lansing Ishii Agremeent) চীনের ওপর জাপানের বিশেষ স্বার্থ স্বীকার করে নেয়। জাপান অবশ্য চীনের ভৌমিক অখণ্ডতা এবং চীনে 'মুক্ত দ্বার নীতি' (Open Door Policy) ভঙ্গ করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভার্সাই সন্ধিতে জাপান চীনের শানটুং প্রদেশ লাভ করে। এবং চীনে জার্মানী যে সকল সুবিধা ভোগ করত সেগুলিও জাপান ভোগ করতে থাকবে বলে ঠিক হয়। ১৯২০ সালে জাপান একদা জার্মান অধিকৃত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলি রাষ্ট্রসংঘের নিকট হতে ম্যানডেট হিসেবে পায়। জাপান রাষ্ট্রসংঘের পরিষদে একজন স্থায়ী সদস্য হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু জাপান ভার্সাই সন্ধিতে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে মনে করল, কারণ সে যতটা লাভবান হবে আশা করেছিল তা হল না। যুদ্ধের পর ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় সিংহের ভাগ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সই পেল। ফলে, জাপানের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। এর পর আবার ওয়াশিংটন কনফারেন্সের (১৯২১) ফলে তাকে শানটুং প্রদেশটিও চীনকে ফিরিয়ে দিতে হল। ১৯২৭ সালে ব্যারন টানাকা জাপানের প্রধান মন্ত্রী হলেন এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। তিনি জাপানের পররাজ্য গ্রাসের পরিকল্পনা ঠিক করেন। এটিকে টানাকা মেমোরিয়াল বলা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জাপান ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। এই সময় চীনে কুয়োমিণ্টাং ও কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে গৃহবিবাদ চলছিল। ফলে জাপানকে চীন ঠিকভাবে বাধা দিতে পারল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী জাপান

জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে সেখানে মাঞ্চুকুয়ো নামে এক তাঁবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করল। রাষ্ট্রসংঘ জাপানের এই আক্রমণাত্মক নীতির প্রতিবাদ করলে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জাপান রাষ্ট্রসংঘ পরিত্যাগ করে। এর পর জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নবরূপ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

সপ্তদশ অধ্যায়

রুশ-বিপ্লব

উনিশ শতকে রাশিয়া সবদিক হতে অনুন্নত ছিল। ফলে, বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় এক বিপ্লব হয়। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় এটিও পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করে।

জার শাসিত রাশিয়ার অবস্থা : রাশিয়ার সম্রাটকে জার বলা হত। রাশিয়ার বিখ্যাত জার মহামতি পিটারের (১৬৮২-১৭২৫) প্রচেষ্টায় রাশিয়া একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর পর দ্বিতীয় ক্যাথারিনের চেষ্টায় রাশিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্র-পরিবারের মধ্যে অন্যতম সদস্যরূপে গণ্য হবার যোগ্য হয়ে ওঠে। এর পর নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাশিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। জার প্রথম আলেকজাণ্ডার ইউরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও ইউরোপের উন্নত দেশগুলির তুলনায় রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। রাশিয়ার জার গোয়েন্দা পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্যেই ইচ্ছামত দেশ শাসন করতেন। গণতন্ত্র বলে কিছুই ছিল না। প্রদেশগুলিতে প্রদেশপালেরাই হর্তাকর্তা ছিল। গ্রাম অঞ্চলে মির নামক গ্রামপঞ্চায়েত ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল। তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কিছুই ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে ডুমা বা জাতীয় সভা নামক একটি প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হয় কিন্তু নানা কারণে এই সভা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে নি।

জারতন্ত্রের অকর্মণ্যতা

এই সময়ে ধর্মযাজকদের ক্ষমতা প্রচুর ছিল। জনসাধারণ অশিক্ষিত থাকার ফলে নানারূপ ধর্মীয় কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। ফলে, ধর্মযাজকদের স্বর্ণ যুগ দেখা দেয়। যাজক সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ছিল।

রাশিয়ার সমাজ-ব্যবস্থায় উৎকট পার্থক্য ছিল। জনসংখ্যার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনই গুরুত্ব ছিল না। জনগণের বিপুল অংশই ছিল কৃষির উপর নির্ভরশীল। অভিজাত এবং চাষী এই দুই শ্রেণীতে এরা বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ জমির মালিক ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। অর্থনৈতিক জীবনে চাষী ছিল তার মনিবের ওপর নির্ভরশীল। তারা ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এক আইন দ্বারা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভূমিদাসদের ভূমি না দিয়ে মুক্ত করলেন। এতে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হল।

সামাজিক বৈষম্য

উনিশ শতকে রাশিয়া ছিল একটি কৃষিপ্রধান এবং শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত দেশ। অবশ্য কয়েকটি শহরাঞ্চলে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলির অধিকাংশেরই মালিক ছিল বিদেশীরা। এই সমস্ত মিল মালিকেরা শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

রাশিয়ায় এই অবস্থা বেশীদিন রইল না। ইউরোপের অন্যান্য দেশ হতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ রুশ দেশেও এসে পৌছল। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা এবং বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দেশে শাসন সংস্কার দাবি করল। জার কঠোর হস্তে এসব দাবি বন্ধ করতে চেষ্টা করলে দেশে একাধিক সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে উঠল। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার এদের হাতে প্রাণ দিলেন।

সমাজতন্ত্রবাদ: গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের মত সমাজতন্ত্রবাদ উনিশ শতকের একটি বিরাট আন্দোলন। শিল্পবিপ্লব প্রসূত কারখানা প্রথার দোষত্রুটি দূর করার জন্যই সমাজতন্ত্রবাদ দেখা দেয়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রত্যেক দেশেরই জাতীয়-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বৈষম্যমূলক বণ্টন ব্যবস্থার জন্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই এর ফলভোগ করছিল। এদের বলা হয় পুঁজিপতি সম্প্রদায়। অন্যদিকে কঠোর শ্রম করেও শ্রমিক-শ্রেণী জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদাও মেটাতে পারত না। ফলে তাদের মধ্যে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামী মনোভাব গড়ে উঠল।

উৎপত্তি ও অর্থ

পুঁজিপতি সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর উপর মুষ্টিমেয় ধনী মালিকের অন্যায় প্রভুত্ব ও শোষণের ফলেই সমাজতন্ত্রবাদের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত মূলধন এবং ভূ-সম্পত্তি অধিকার করে মানুষের পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করাকে বন্ধ করাই সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজ কর্তৃক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং আয় বণ্টন ব্যবস্থাকে, সমাজতন্ত্রবাদ বলা যেতে পারে। সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তিগত ভাবে মূলধন এবং সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা হয় না।

উদ্দেশ্য

কার্ল মার্ক্সের পূর্বগামী সমাজতন্ত্রীরা: উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে একশ্রেণীর সামাজতান্ত্রিকের আবির্ভাব হয়। এদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রবার্ট ওয়েন, টমাস্ হফ্স্কিন, উইলিয়ম টম্প্সন এবং ফ্রান্সের চার্লস্ ফোরিয়ার ও সেন্ট্ সাইমন-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা এমন সমাজ স্থাপন করতে চাইলেন যে সমাজে সকলেই যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে এবং সকলের শ্রম দ্বারা

লব্ধ আয় সকলের মধ্যে ন্যায্যভাবে ভাগ করা হবে। কার্লমার্ক্স এদের নাম দেন—অবাস্তব আদর্শবাদী (Utopians)। এঁরা মনে করতেন যে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেই মানুষের মনে সমাজতন্ত্রের ধারণা বদ্ধমূল হবে। জনসাধারণের নিকট প্রচারকার্য করা, জনসাধারণকে বিপ্লবী করে তোলা এঁরা পছন্দ করতেন না। একারণেই এঁরা সফলতা অর্জন করতে পারেননি।

এঁদের মতবাদ

অবাস্তব আদর্শবাদী সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেননি সত্য কিন্তু তাঁদের মতামত শ্রমিকশ্রেণীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির ওপর তাঁদের চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদকে প্রকৃত ক্ষেত্রে কার্যকরী ও বাস্তবধর্মী করে তুললেন কার্ল মার্ক্স। তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে এক নতুন রূপ দিলেন।

এঁদের প্রভাব

কার্ল মার্ক্স : কার্ল মার্ক্স ছিলেন জার্মানীর লোক। তিনি এক ইহুদী পরিবারে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জার্মানীর বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে ডক্টরেট উপাধি পান এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তার মৌলিকতার জন্য অল্প বয়সেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ইতিহাসেও সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রথম হতেই তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমাজে আর্থিক বৈষম্যের কারণ ও তার প্রতিকার নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। তাঁর বিপ্লবী মতবাদের জন্য তিনি দেশ হতে বিতাড়িত হন এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভবঘুরের ন্যায় ঘুরে বেড়ান। শেষে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর "কমিউনিস্ট ম্যানিফেষ্টো" অথবা "সাম্যবাদীর ইস্তাহার" প্রকাশিত হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "ড্যাস ক্যাপিট্যাল" লণ্ডন হতে প্রকাশিত হয়। তিনি জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর শেষ জীবন বড়ই দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছিল। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস নামক একজন জার্মান তাঁকে সমস্ত বিষয়ে সাহায্য



কার্ল মার্ক্স

জীবনী

করেন এবং এই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব এখনও সকলের নিকট আদর্শনীয় হয়ে রয়েছে।

মার্ক্সের মতবাদ ঃ মার্ক্স মানবসমাজের ইতিহাসের ধারা, বিভিন্ন যুগে সমাজের আর্থিক অবস্থা ও তার পরিবর্তনের কারণ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করেছেন এবং নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মতে শ্রেণী—বিরোধের মধ্য দিয়ে সমাজ অগ্রসর হয় এবং বিভিন্ন যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে। দেশের সম্পদ ও সম্পদ অর্জনের উপকরণ (জমি, খনি, কলকারখানা ইত্যাদি) যখন যে শ্রেণী হস্তগত করে তখন সেই শ্রেণীই দেশের প্রভু হয়ে বসে। যেমন, যে যুগে জমি ছিল সমাজের একমাত্র সম্পদ, সে যুগের জমিদারশ্রেণী সাধারণ লোকের

মার্ক্সীয় সাম্যবাদ

উপর আধিপত্য করত। পরবর্তীকালে শিল্পবিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং সংখ্যাল্প ধনিক সম্প্রদায় অর্থের বলে সমাজে প্রাধান্য লাভ করে। এই ধনতান্ত্রিক সমাজে একদিকে ধনিকশ্রেণী ও অন্যদিকে শ্রমিকগণ রয়েছে। অর্থাৎ একদিকে বিত্তবান ও অন্যদিকে বিত্তহীন। এদের মধ্যে স্বার্থসংঘাত অবশ্যম্ভাবী, কারণ এদের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। অবশ্য মার্ক্সের মতে এই শ্রেণী সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিপ্লব আসবে। বিপ্লবের ফলে যে নতুন সমাজের অভ্যুদয় ঘটবে, তা হবে সাম্যবাদী সমাজ। এই বিপ্লবে শাসনক্ষমতা যাবে বিত্তহীন সর্বহারা বা 'প্রলেতারিয়েতের' হাতে। দেশের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে দেশের জনসাধারণ। এই মতবাদকে বলা হয় মার্ক্সবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ।

মার্ক্স মানব-ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে মানুষের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি সবই নির্ভর করে অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার ওপর এবং মানুষের ইতিহাস এই অর্থনৈতিক সংঘাতের ই বিবরণ মাত্র। তাঁর মতে বর্তমানকালে ধনিক শ্রেণী যে আর্থিক লাভ করেন তা শ্রমিকগণেরই প্রাপ্য। কারণ তাদের শ্রমের ফলেই কাঁচামালগুলি শিল্প-সামগ্রীতে পরিণত হয়।

মার্ক্সীয় মতবাদের সমালোচনা ঃ মার্ক্সের মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে অর্থনৈতিক প্রেরণা-ই মানব-সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে একমাত্র কারণ নয়। ধর্মভাব, দেশাত্মবোধ, যুগন্ধর প্রতিভা, ঐতিহ্য নানা প্রকার শক্তি ও প্রভাবের ফলেই মানবসমাজের বিবর্তন ঘটে থাকে। এ ছাড়া, মার্ক্স ধনিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে অহি-নকুল সম্বন্ধ দেখেছিলেন

এবং শেষোক্ত শ্রেণীই যে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের প্রভু হয়ে দাঁড়াবে তাও অভ্রান্ত নয়। কারণ, ধনিকশ্রেণী মার্ক্সের সময়ে যেরূপ শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করত আজকাল আর সেরূপ সম্ভব নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই অল্পবিস্তর কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং শ্রমিক-শ্রেণীর উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করছে। তাছাড়া, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই মার্ক্সের মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অল্পবিস্তর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে নিয়েছে।

মার্ক্সবাদের গুরুত্ব : মার্ক্সের মতবাদে যত ত্রুটি থাকুক না কেন এটি সত্য যে তিনিই প্রথম আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার নির্ভীক সমালোচনার দ্বারা সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি ন্যায্য ও মানবোচিত ব্যবহার করবার আবশ্যকতা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর মতবাদ কোন ভৌগোলিক বা জাতিগত সীমারেখা স্বীকার করে না—'শ্রমিকদের কোন দেশ নেই'—সকল দেশের নির্যাতিত শ্রমিকদের মনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করল এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগে আন্তর্জাতিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করল। এর ফলে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ স্থাপিত হল। এছাড়া তাঁর মতবাদে বিশ্বাসীগণই রুশ-বিপ্লবের ন্যায় এক যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত করে ইতিহাসে এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন।

রুশ বিপ্লবের কারণ রুশ বিপ্লব একটি আকস্মিক ঘটনা নয়, এটি এক দীর্ঘকালব্যাপী-বিপ্লবী আন্দোলনের এক পূর্ণাঙ্গ পরিণতি। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় রুশ-বিপ্লবও অনেকগুলি কারণের সমষ্টিগত ফল। এই কারণগুলি ছিল বিভিন্ন ধরনের এবং ব্যাপক।

রাজনৈতিক কারণ

রাশিয়ার সম্রাটদের জার বলা হত। রোমানফ বংশীয় জাররা তিনশো বছর ধরে রাজত্ব করছিলেন। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা বা ফ্রান্সের ন্যায় কোন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা রাশিয়ায় ছিল না। গোয়েন্দা পুলিশ ও সৈন্যের সাহায্যে জার দেশ শাসন করতেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশ হতে যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ রাশিয়ায় পৌছাল তখন শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা জারের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লাগল। দেশে একাধিক সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে উঠল। জারের অনেক কর্মচারী এদের হাতে নিহত হলেন। দেশে কয়েকটি রাজনৈতিক দল স্থাপিত হল এবং শাসন সংস্কার দাবি করল। জার এদের দাবি গ্রাহ্য করলেন না। জার দমনমূলক আইন ও কঠোর নির্যাতন দ্বারা সংস্কার আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করেন। অগণিত দেশভক্তদের সুদূর সাইবেরিয়ায়

নির্বাসিত করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মার্ক্স-পন্থী সাম্যবাদী দলটি প্রবল হয়ে উঠল কিন্তু এই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ঐক্য না থাকায় জারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ধ্বংস করতে পারল না। অবশ্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জাপানের নিকট রাশিয়ার পরাজয় হলে শাসন-সংস্কারের দাবি নিয়ে এক বিপ্লব দেখা দেয়। কলকারখানায় ধর্মঘট ও গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয়। এই বিপ্লবী মনোভাব সৈন্যদলের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সাময়িকভাবে বিদ্রোহ দমন করলেন এবং প্রজাদের এক প্রতিনিধি সভা (ডুমা) আহ্বান করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ডুমায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা স্থান পেল না। জার ঘোষণা করলেন ডুমার সদস্যগণ কেবল পরামর্শ দিতে পারবে, শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হবে আগের মত জারেরই নির্দেশে। কিন্তু এই সময় জারের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না; কুচক্রী রাসপুটিন জার দ্বিতীয় নিকোলাসের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে যথেচ্ছাচার চালালেন। রাজ্য শাসনের যা কিছু ব্যবস্থা সবই রাসপুটিন করতে লাগলেন। একদিকে এই রাসপুটিন চালিত দুর্নীতি-অনাচারের পঙ্কিল স্রোত, আর একদিকে শাসন-বিশৃঙ্খলার ফলে দেশের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠল। দেশের জনসাধারণের মনে অসন্তোষ-বিদ্রোহের তীব্র বহ্নি জলতে থাকল। এই সময় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সমগ্র ইউরোপ প্রকম্পিত করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সহিত একযোগে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জার সরকারের চরম অকর্মণ্যতার ও অব্যস্থার জন্য যুদ্ধের উপকরণের অভাবে দলে দলে রুশ-সৈন্য জার্মান-সৈন্যদের হাতে নিহত ও বন্দী হতে লাগল। সৈন্যদলে ঘোর অসন্তোষ দেখা দিল। দেশে চরম খাদ্যাভাব ঘটল। শহরের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। আন্দোলনকারীদের প্রতি সৈন্যদের গুলি চালাতে আদেশ করলে তারা সে আদেশ অমান্য করল। সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিক একজোটে শান্তির দাবী জানাল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে একটি গণ-অভ্যুত্থান হল। পেট্রোগ্রাডে এই অভ্যুত্থান ঘটে। বিপ্লবীরা জয়ী হল। জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কুখ্যাত রাসপুটিন পূর্বেই নিহত হন। এই বিপ্লবে সোস্যালিষ্ট রিভল্যুশনারি ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাট এই দুটি দল প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। এর পর রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়। অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে বলশেভিক দল লেনিনের নেতৃত্বে বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করল।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যা রুশ জনসাধারণকে বিপ্লবী করে তুলল। কলকারখানার শ্রমিকদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়ে। অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ছিল বিদেশীরা। এরা শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রবলভাবে দেখা দিল। বহু কৃষককে জোরপূর্বক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে বলা হলে কৃষিকার্য অবহেলিত হল।

অর্থনৈতিক

রাশিয়ার সমাজ-জীবনে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর স্বার্থসংঘাত বিপ্লবানুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। রুশ-সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—অভিজাতশ্রেণী ও সার্ফ সম্প্রদায়। অভিজাতশ্রেণীই ভূমির মালিক ছিল। যদিও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সার্ফদের ভূমিদাসত্ব হতে মুক্তি দেওয়া হয় তবুও তাদের ব্যক্তিগত অধিকারে জমি ভোগ করবার অধিকার দেওয়া হয়নি। এ কারণে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে এবং তারা যে কোন পরিবর্তনের জন্য সদা-চেষ্টিত হল। ধর্মযাজকরাও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ ধর্মযাজকই অর্থপিশাচ, বিলাসী এবং আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। রাশিয়ার সমাজ-জীবন তারা আরও কলুষিত করে তুললেন।

সামাজিক

এই সময় রাশিয়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তিত হয়েছিল। বহু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও চিন্তাশীল লোকেদের সম্মিলিত সাধনা রাশিয়ায় এক নতুন যুগের অবতারণা করল। টলস্টয়, গর্কি, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, গোগল প্রভৃতি সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ অকর্মণ্য ও অযোগ্য স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এক দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করেন। তাঁরা সকলেই ভালভাবে উপলব্ধি করেন যে ইউরোপের উন্নত দেশসমূহের তুলনায় রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা অতি হীন। এ ছাড়া, লেনিনের প্রবর্তিত রুশ বলশেভিক্ বিপ্লবীদের মুখপত্র সুবিখ্যাত 'প্রাভদা' পত্রিকার অবদান কম নয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তখনকার শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গণ-বিপ্লববাদী পত্রিকাটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'বলশেভিক' বিপ্লবীদের মুখপত্র হলেও রুশ-জনসাধারণের মধ্যে প্রাভদা পত্রিকা পড়বার প্রবল ঝোঁক দেখা দেয়। এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে যথেচ্ছাচারী জার এবং তাঁর অনুগত অনুচর দুর্নীতিগ্রস্ত স্বার্থান্বেষী অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কিরূপ মনোভাব ছিল।

মানসিক

লেনিন : আধুনিক শক্তিশালী রুশ রাষ্ট্রের স্রষ্টা লেনিন ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর নেতৃত্বে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিত্তহীন শ্রমিকগণ দেশ শাসন ব্যাপারে কর্তৃত্বলাভ করে।

লেনিন ছিলেন রাশিয়ার বলশেভিক দলের নেতা। রুশ ভাষায় বলশেভিক শব্দের অর্থ সংখ্যাধিক্য। লেনিনের আসল নাম ছিল ভ্লাদিমির উলিয়ানভ। লেনিন তাঁর ছদ্মনাম। এই ছদ্মনাম তাঁকে নিতে হয়েছিল, কারণ রাশিয়ায় তখন আত্মগোপন করে কাজ করতে হত। কিন্তু ছদ্মনামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। নিকোলাই লেনিন ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী দলে যোগদান করেন, ফলে তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। সেখান হতে মুক্তি পেয়ে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করতে থাকেন। তিনি বিদেশে থেকে দেশের গণ-আন্দোলন পরিচালনা করতেন। শেষে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কৌশলে 'জার'-এর দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা-চরদের ফাঁকি দিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং রাশিয়ায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের গণ-আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু এই আন্দোলন সফল হয়নি। লেনিন পুনরায় রাশিয়া হতে পালিয়ে যান এবং এক গুপ্ত ঘাঁটিতে বাস করতে থাকেন। এই গুপ্ত ঘাঁটি হতে রাশিয়ার বিপ্লবী জনগণের নিকট নানারূপ ফন্দী ও কৌশলের সাহায্য তিনি সুচিন্তিত বিধিনির্দেশ পরিকল্পনাদি পাঠাতেন। সুদীর্ঘকাল ধরে এইভাবে বিপ্লবের কার্যাবলী পরিচালনা করবার পর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে লেনিন ছদ্মবেশে রাশিয়ার গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করবার জন্য ফিরে আসলেন। আন্তরিক অধ্যবসায় এবং বিপ্লবী-সঙ্গীদের প্রাণপাত প্রচেষ্টায় লেনিনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। এ ছাড়া, তিনি বিপ্লবী জনসাধারণকে রাজনৈতিক জ্ঞানে শিক্ষিত করবার জন্য সুবিখ্যাত 'প্রাভদা' পত্রিকা প্রকাশিত করতে থাকেন। জারের পতনের পর প্রজাতন্ত্রী সরকার রাশিয়ার কোন সমস্যারই সমাধান করতে পারল না। তখনও মহাযুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার দাবি প্রজাতন্ত্রী সরকার মিটাল না। খাদ্যের সুবণ্টন ও জমি

ঘটনাবহুল জীবন



লেনিন

পুনর্বণ্টনও তারা করতে নারাজ হলে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকগণ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে রাশিয়ার শাসন-ক্ষমতা অধিকার করল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে লেনিনের মৃত্যু হয়।

তাঁর কার্যাবলী

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বলশেভিকগণ ক্ষমতা দখল করল। নবগঠিত সরকারের প্রধান কর্মকর্তা হলেন লেনিন। তাঁর নেতৃত্ব বলশেভিকগণ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে নতুন রুশ রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠা করলেন। এই নতুন রাষ্ট্রটির নামকরণ হল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র।

লেনিন আধুনিক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মহান নেতা। তাঁর নেতৃত্বে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বহু বাধা, সঙ্কট অতিক্রম করে স্বীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

লেনিন বলশেভিক দলের সপ্তম অধিবেশনে বলশেভিক দলের নতুন নামকরণ করলেন 'কমিউনিষ্ট পার্টি' বা 'সাম্যবাদী দল'।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ক্ষমতা দখলের সঙ্গে তাঁর দল ঘোষণা করল যে রাশিয়ায় পুঁজিপতিদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির বিনাশ হয়েছে এবং জনগণ রাষ্ট্রপরিচালনার ভার পেয়েছে।

ক্ষমতা দখলের পরই নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেসের এক সভা বসে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে রাশিয়া তখন হতে হল U.S.S.R. বা Union of Soviet Socialist Republics. এ ছাড়া যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বিনা ক্ষতিপূরণে সমগ্র রাশিয়া হতে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত করা হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার ঘরে বাইরে শত্রু

লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় শ্রমিক-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশে শান্তি হল না এই ব্যবস্থা অনেকেই মানতে চাইল না। দেশের অভ্যন্তরে অভিজাত শ্রেণী এবং ক্ষমতা-লোভী বিপক্ষ দলের সহিত লেনিনের সাম্যবাদী দলের সংঘর্ষ বাধল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেনিনের বিচক্ষণ বুদ্ধি এবং সুতীক্ষ্ণ কূটনীতির নিকট তারা পরাজিত হল। এই সময় লেনিনের নেতৃত্বে সাম্যবাদী দল বিশ্বযুদ্ধ হতে বিদায় নিল এবং ব্রেষ্টলিটভ্‌স্কের সন্ধি দ্বারা (১৯১৮) জার্মানীর সহিত যুদ্ধ বন্ধ করল।

এই নবরাষ্ট্রের নতুন বিপদ দেখা দিল। রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি সন্তুষ্ট হয়নি। তা ছাড়া পৃথিবীর একটি দেশে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাও তারা মনেপ্রাণে চাইছিল না। কারণ এই দেশগুলির প্রত্যেকটি ছিল ধনতান্ত্রিক দেশ। তারা শ্রমিক-প্রাধান্যের ভয়ে ভীত হল। জারের আমলের কয়েকজন রুশ সেনানায়ক সাম্যবাদী রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি আঠারটি দেশ রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করল। লেনিনের মহান

নেতৃত্বে এবং অন্যান্য কম্যুনিষ্ট নেতাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় সোভিয়েট রাষ্ট্র এতগুলি বিরোধী শক্তিকে একে একে পরাভূত করল এবং দেশে সাম্যবাদীদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

দুর্ভিক্ষ

যুদ্ধে সাম্যবাদীদের জয় হলেও গৃহযুদ্ধে সমগ্র দেশ বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লেনিনের নেতৃত্বে সাম্যবাদীগণ প্রাণপণ চেষ্টা করে এই সকল সমস্যার সমাধান করতে লাগলেন। আনন্দের কথা যে রাশিয়ার এই দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীর নিকট ভারতের পক্ষ হতে সাহায্য পাঠান। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশগুলি সন্ধি করল এবং নতুন সরকারকে স্বীকার করে নিল। আমেরিকা অবশ্য অনেক পরে রুশ সরকারকে স্বীকার করে।

সমাজতান্ত্রিক সংস্কার

লেনিন সাম্যবাদী দলের সহযোগিতায় নতুন আদর্শে নতুন ছাঁদে উন্নতভাবে অনাচার-জীর্ণ প্রাচীন রাশিয়াকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে অগ্রসর হলেন। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, কল-কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, স্কুলকলেজ, দপ্তরখানা, চিকিৎসালয় সবগুলিই জনসাধারণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করলেন এবং সোভিয়েট বা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় রুশ জনগণের ভেতর হতে সুদক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেশ-শাসনের জন্য গণতন্ত্রী পরিষদ সৃষ্টি করলেন। নতুন রাষ্ট্রের প্রতীক-চিহ্ন হল কাস্তে আর হাতুড়ী লাঞ্ছিত লাল পতাকা। সমগ্র রাশিয়া হতে জাতি ও ধর্মগত বিধিনিষেধ দূর করা হল। স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হল। ধনী নির্ধন সকলেই সমান বলে ঘোষণা করা হল। লেনিন সমগ্র রাশিয়াকে কয়েকটি প্রজাতান্ত্রিক অঞ্চলে ভাগ করলেন। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রত্যেকটি প্রজাতান্ত্রিক অঞ্চলের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়া হল।

আভ্যন্তরীণ নীতি

লেনিন বুঝেছিলেন যে দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য সরকারের কঠোর নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য দেখতে পাওয়া যায় তিনি কঠোর হস্তে সকল প্রকার সরকার-বিরোধী সমালোচনা বন্ধ করে দেন। প্রয়োজন হলেই দেশে সামরিক আইন জারী করতেন। গুপ্তচরদের সাহায্যে সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং পার্টির ভেতরে বা বাইরে সকল শত্রুর প্রাণদণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। প্রতি-বিপ্লবগুলিকে রোধ করবার জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন করেন। ঐ কমিশন বহু লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে।

এরপর লেনিন জনসাধারণের সুবিধার্থে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ **New Economic Policy** বা **N.E.P.** প্রবর্তন করলেন। এই নতুন অর্থ নৈতিক নীতি অনুসারে চাষবাস, ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্যে রুশ জনসাধারণের ব্যক্তিগত লাভের জন্য অধিকার দেওয়া হল। কলকারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ভার রইল সোভিয়েট সরকারের ওপর। লেনিনের এই ব্যবস্থার নাম হল **State Capitalism.**

নতুন অর্থ নৈতিক নীতি

বৈদেশিক নীতি: লেনিনের বৈদেশিক নীতিতে কয়েকটি পর্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

সাম্যবাদী রুশ সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই যুদ্ধবিরতির জন্য চেষ্টা করে জার্মানীর সহিত ব্রেষ্টলিট্‌ভস্কের সন্ধি স্বাক্ষরিত করে। এর ফলে রাশিয়াকে তার পূর্ব-অধিকৃত বহু স্থান ছেড়ে দিতে হয়। রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বিদেশী রাষ্ট্রগুলি এর সুযোগ নেয়। রুশ সরকার শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার শত্রুদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়। যে সকল রাষ্ট্র রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিল তাদের প্রতি রুশ সরকারের ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে যায়। ফলে এই সকল রাষ্ট্রের সহিত নয়া রুশ সরকারের কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। এই রাষ্ট্রগুলিও প্রত্যুত্তরে সাম্যবাদী রুশ সরকারকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে।

জার্মানীর সাথে সন্ধি

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মস্কোয় কমিন্‌টার্ন স্থাপিত হয়। এর মাধ্যমে রুশ বিপ্লবকে বিশ্ব বিপ্লবে পরিণত করার ইচ্ছা রুশ সরকারের ছিল। কমিন্‌টার্নের সহিত রুশ সরকারের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল।

কমিন্‌টার্নের প্রতিষ্ঠা

রুশ সরকার সর্বপ্রকার শোষণের বিরোধী ছিল। পুঁজিপতি রাষ্ট্র ও সামাজ্যবাদ ধ্বংস করবার জন্য রুশ-সরকার বিশ্বের বিভিন্ন অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য করতে থাকে। বিশ্বের নানা দেশে রাশিয়ার যে সকল বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ছিল সেগুলি নয়া রুশ সরকার ত্যাগ করে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সাহায্য দান

পোল্যাণ্ডের সহিত যুদ্ধে রাশিয়া ভিশ্চুলার যুদ্ধে পরাজিত হয়। জোর করে সাম্যবাদের প্রসার সম্ভব নয় তা রুশ সরকার বুঝতে পারে। ফলে তার বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন ঘটে।

পোল্যাণ্ডের সাথে যুদ্ধ

আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক সম্মেলনে রাশিয়া যোগদান করে। জার্মানির সহিত

র‍্যাপালোর সন্ধি দ্বারা বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতার ভাব ফুটে ওঠে।

লেনিন বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আশা পরিত্যাগ করেন এবং পুঁজিপতি রাষ্ট্রগুলির সাথে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি মেনে নেন। অধুনা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পঞ্চশীলের কথা শোনা যাচ্ছে; সাম্যবাদীদের মতে লেনিনই এর প্রবর্তক। পরবর্তীকালে রাশিয়ার সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মিত্রতামূলক যে সকল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, লেনিনের বৈদেশিক নীতির ফলেই সম্ভব হয়েছিল, যদিও তিনি এই সকল চুক্তিপত্র দেখে যেতে পারেন নি। সংক্ষেপে লেনিন শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতিই পছন্দ করতেন এবং শেষে অনুরূপ নীতিই অনুসরণ করেন। অনুন্নত দেশসমূহকে সর্বপ্রকার সাহায্য করাও তাঁর বৈদেশিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। চীনকে সাহায্যদান এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আন্তর্জাতিক উত্তেজনার প্রশমন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা এবং বিশ্বশান্তি রক্ষাই লেনিনের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল।

লেনিনের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নীতি

এইভাবে সব দিক দিয়ে লেনিনের নির্দেশে সোভিয়েট রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হল। সোভিয়েট রাশিয়ায় আর কোন শ্রেণীভেদ রইল না। রুশ বিপ্লবের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে যে একটি নতুনতর সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন এবং লেনিনের মহান কার্যাবলীর জন্যই এটি সম্ভব হল।

ষ্টালিন ও ট্রটস্কি : লেনিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় ক্ষমত হস্তগত করবার জন্য লেনিনের অনুচরদের মধ্যে কলহ ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই অনুচরদের মধ্যে এক দলের নেতৃত্ব করেন ষ্টালিন এবং অন্য দলের ট্রট্স্কি। পরিশেষে ষ্টালিন বিজয়ী হন এবং ট্রট্স্কি প্রাণ নিয়ে দেশ হতে পালিয়ে যান। তাঁর সমর্থকদের প্রকারান্তরে হত্যা করা হয়।

ষ্টালিন-ট্রটস্কি দ্বন্দ্ব

ষ্টালিন ও ট্রট্স্কির ক্ষমতা দখলের লড়াই কেবলমাত্র দুটি ব্যক্তির লড়াই নয়। দুটি নীতিরও লড়াই। ট্রট্স্কি চেয়েছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শক্তির দ্বারা রাশিয়ান-মার্কা সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করা। ষ্টালিনের নীতি ছিল প্রথমে একটি রাষ্ট্রে (রাশিয়ায়) সমাজতন্ত্রের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট উদাহরণ স্বরূপ তৈরী করা।

এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ট্রট্স্কি অপেক্ষা ষ্টালিনের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর ক্ষমতা ও প্রভাব বেশি ছিল। ট্রট্স্কির ব্যবহারের জন্য অনেকে তাঁকে পছন্দ করত না। ষ্টালিন কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন।

ষ্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাশিয়ার অগ্রগতি ঃ

ষ্টালিনের আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ সোভিয়েট রাশিয়াকে অর্থনৈতিক দিক হতে উন্নত ও আত্মনির্ভর করে তোলাবার জন্য ষ্টালিন প্রথম হতেই সচেষ্ট হলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লেনিন-প্রবর্তিত নতুন অর্থনৈতিক নীতির (N. E. P.) পরিবর্তন করেন নি। এর পর তিনি সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। দ্রুত দেশের শিল্পায়ন, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, ভারী শিল্পের (ইস্পাত প্রভৃতি) ব্যাপক বিস্তার উৎপন্ন সামগ্রীর ন্যায্য বণ্টন ইত্যাদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের ফলে রাশিয়ায় কৃষি ও শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি দেখতে পাওয়া গেল। ষ্টালিনের নেতৃত্বে মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েট রাশিয়া কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতিতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হল। ষ্টালিন কৃষির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষবাস ও যন্ত্রপাতি নিয়োগ করতে বললেন এবং যৌথ খামারের প্রবর্তন করলেন। আমাদের জাতীয় সরকার বর্তমানে এই নীতি গ্রহণ করেছেন। কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে রাশিয়ার জাতীয় সম্পদ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনসাধারণ প্রভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ

ষ্টালিনের রাজনৈতিক কার্যাবলী ঃ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এক নতুন সংবিধানের প্রবর্তন হল। এটিকে 'ষ্টালিন সংবিধান'ও বলা হয়ে থাকে। এই সংবিধানে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সুপ্রীম সোভিয়েটের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এই সুপ্রীম সোভিয়েটের কাজ সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করা এবং মন্ত্রিসভা ও প্রধান কর্মচারীদের নিয়োগ করে শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা করা। সুপ্রীম সোভিয়েট দুভাগে বিভক্ত—কাউন্সিল অব দি ইউনিয়ন এবং কাউন্সিল অব দি ন্যাশনেলিটিজ। সুপ্রীম সোভিয়েট একটি প্রেসিডিয়াম বা সভাপতিমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ভার একটি মন্ত্রিসভার উপর। মন্ত্রীদের পিপল্স কমিশার বলা হয়। এই শাসনতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ মাত্রেরই ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। শহর ও গ্রামের স্থানীয় সোভিয়েট বা পঞ্চায়েতগুলি নিজ নিজ অঞ্চলের শাসন পরিচালনায় দায়িত্ব পায়। সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে ১৫টি রাষ্ট্র রইল। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত থাকা বা না থাকা প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাধীন হল, অবশ্য পৃথক হবার কথা

নতুন সংবিধান


সোভিয়েট রাষ্ট্রসঙ্ঘ
১ রাশিয়া সাধারণতন্ত্র
২ ফিনো-কারেলিয়া
৩ এস্তোনিয়া
৪ ল্যাটভিয়া
৫ লিথুয়ানিয়া
৬ শ্বেতরাশিয়া
৭ মোলডেভিয়া
৮ ইউক্রেন
৯ জর্জিয়া
১০ আজারবাইজান
১১ আর্মেনিয়া
১২ কাজাখস্তান
১৩ তুর্কমেনিস্তান
১৪ উজবেকিস্তান
১৫ তাজিকিস্তান
১৬ কিরঘিজিয়া

কোন রাষ্ট্রই চিন্তা করে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ নিজ জাতীয় সোভিয়েট দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সমস্ত জাতীয় সোভিয়েটের প্রতিনিধিগণকে নির্বাচনে দাঁড়াতে হয়।

ষ্টালিনের পররাষ্ট্র নীতি ঃ পররাষ্ট্র নীতিতে ষ্টালিন লেনিনের পদাঙ্কই অনুসরণ করেন। তিনি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি আন্তর্জাতিক বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং সেই কারণেই ট্রট্স্কির সহিত তাঁর কলহ হয়। তিনি আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করে এবং যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব উত্থাপন করে।

রাষ্ট্র সংঘে যোগদান

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কিন্তু রাশিয়ার প্রস্তাবে রাজী হয়নি। ষ্টালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া বরাবরই জঙ্গীবাদীদের তীব্র সমালোচনা করেছিল এবং জগতের জনসাধারণকে যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়েছিল।

১৯৩৮-৩৯ সালে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে এক পরিবর্তন দেখা যায়। রাশিয়া এই সময় বুঝতে পারে যে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের আক্রমণাত্মক নীতির এবং কার্যের বিরোধিতা এবং প্রতিরোধ করা পাশ্চাত্য শক্তিগুলির আদৌ ইচ্ছা নেই। তখন বাধ্য হয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে জার্মানীর প্রতি তার পূর্ব নীতি পরিবর্তন করতে হয়। ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে রাশিয়া জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ-চুক্তি সম্পাদিত করে পাশ্চাত্য দেশগুলিকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। তবে এই অনাক্রমণ-চুক্তিটি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সাথে সাথেই এই চুক্তিটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন

ষ্টালিনের দোষ-ত্রুটি ঃ ষ্ট্যালিন অপ্রতিহত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি পরবর্তীকালে খুবই সন্দিগ্ধপরায়ণ হয়ে পড়েন, অনেকটা আওরংজেবের মতন। ১৯৩৬ সালে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে জিনোভিয়েভ (কমিনটার্ণের সভাপতি), কামেনভ ও আরও পাচজনকে রাষ্ট্রবিরোধী (ষ্টালিন-বিরোধী ?) কার্যকলাপের জন্য বিচারের প্রহসন করে হত্যা করা হয়।

১৯৩৬-এর পার্জ

ষ্টালিনের হাত হতে সামরিক বাহিনীর প্রখ্যাত সেনাপতিগণও রেহাই পাননি। ১৯৩৭ সালে নিছক সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কয়েকজন প্রকৃত সাম্যবাদী পার্টির নেতা এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের বিচার

করে হত্যা করা হয়। এগুলিকে ইংরেজী ভাষায় '**purge**' বলে। নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখবার জন্য ষ্টালিন মাঝে মাঝেই এরূপ পার্জের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ষ্টালিন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন রাশিয়ায় তাঁর অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল। এদিক হতে হিটলার ও মুসোলিনী অপেক্ষা তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা বেশি ছিল।

ষ্টালিনের ডিক্টেটরী মনোবৃত্তির পরিচয়

অনেকে বলেন, ষ্টালিন এরূপ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুযায়ী তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন।

সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে ষ্টালিনের অবদান কেউই অস্বীকার করেন না। তবে দেশশাসনে তিনি যেরূপ ডিক্টেটারী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন তা কোন ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।

রুশ বিপ্লবের প্রভাব ঃ রুশ-বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল এবং এক নতুন ধরনের সমাজ গড়ে উঠল। এই সমাজে শ্রেণীগত ভেদ রইল না। দেশের যা কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ—তৈল, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি খনিজ-পদার্থ, খাল-বিল-নদী, বন, জমি, কলকারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, দপ্তরখানা, চিকিৎসাগার সবই হল সর্বসাধারণের বা রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সমবায় রীতিতে জমিগুলিতে চাষের ব্যবস্থা হল। সকল মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা হল। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সর্বপ্রকারের শোষকদের শোষণ বন্ধ করে এক শোষণহীন স্বাধীন মানব-সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হল। সংক্ষেপে, জারের আমলের দুর্নীতি-অনাচারে পূর্ণ রাশিয়া বিপ্লবের ফলে মাত্র ২০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হল। রাশিয়ায় বিপ্লবের এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব বলতে হবে।

রাশিয়ায়

রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার বিত্তহীন শ্রমিকগণ দেশ-শাসন ব্যাপারে কর্তৃত্ব লাভ করল। রুশবিপ্লবীগণ সকলেই কার্লমার্ক্সের মতের অনুগামী। মার্ক্সের মতবাদ (সাম্যবাদ) আন্তর্জাতিক মতবাদ। 'শ্রমিকদের কোন দেশ নেই' মার্ক্সের এই বাণী সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদীগণ মেনে নিলেন এবং ট্রট্স্কি প্রমুখ কয়েকজন নেতা অন্যান্য দেশেও রাশিয়ার মত বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করতে থাকেন। এর জন্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ গঠিত হয়েছিল এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রচারিত হতে লাগল। কমিন্টার্ন নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটি রাশিয়ার নেতৃত্বে

বিশ্বে

স্থাপিত হল। এর ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে (ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইত্যাদি) এক ভীতির সঞ্চার হল। শ্রমিকদের কোন দেশ নেই এবং তারা সবদেশেই শোষিত হচ্ছে—এই সাম্যবাদী ঘোষণাটি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে শঙ্কিত করে তুলল। তারা একদিকে রাশিয়াকে শক্তির দ্বারা ধ্বংস করতে চাইল ও অন্যদিকে নিজ নিজ দেশে শ্রমিককল্যাণ আইন প্রণয়ন করে শ্রমিকদের শোষণ সীমিত করতে চেষ্টিত হল। কয়েকটি রাষ্ট্রে উগ্র জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করে সাম্যবাদকে ধ্বংস করতে চাইল। জার্মানী ইতালী প্রভৃতি দেশে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হল। তবু একথা স্বীকার্য যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সমস্ত দেশেই সাম্যবাদী দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

এশিয়ার শোষিত দেশগুলিতে সাম্যবাদ সহজেই প্রভাব বিস্তার করে। চীনদেশে সাম্যবাদী দলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীকালে এই দলই চীন দেশে ক্ষমতা দখল করে। এছাড়া রাশিয়া তার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে যে বিস্ময়কর উন্নতি করল তা বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিকট আদর্শস্থানীয় হল। পৃথিবীর বহুরাষ্ট্র এ বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়াকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ইউরোপে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব

ইটালী, জার্মানী ও জাপানের শোষণবাদী আগ্রাসী কার্যক্রম

যুগটির বৈশিষ্ট্য

সূচনা ঃ ১৯১৯ হতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটিতে ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি বজায় ছিল সত্য, কিন্তু তাই বলে এই যুগটিকে শান্তির যুগ বলা যায় না। এটিকে যুদ্ধবিরতি বা যুদ্ধের প্রস্তুতির যুগ বলা যেতে পারে।

এই যুগটিতে অবশ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তৎপরতা দেখা যায়। ফলে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ইউরোপে যেখানে মাত্র পাঁচটি সাধারণতন্ত্র ছিল ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সেখানে ষোলটি সাধারণতন্ত্রের উদ্ভব হল। এই যুগে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার বিস্তার লাভ করে।

রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এ যুগটিতে তিনটি নতুন পরীক্ষা সুরু হল। কমিউনিজম্, ফ্যাসিজম্ ও নাৎসীজম্।

আশা করা গিয়েছিল যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার ফলে আর কোন যুদ্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ এগিয়ে যাবে না। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মন হতে যুদ্ধের বীভৎসতার ছবি মুছে গেল এবং তারা যুদ্ধবাজ হয়ে উঠল এবং শেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সুরু হল। কিভাবে এই যুদ্ধ দেখা দিল তা আমরা আলোচনা করব।

ইটালী ঃ ইটালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছিল জার্মান ভীতির জন্য নয়, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য হতে কিছু রাজ্যাংশ পাবার জন্য। যুদ্ধ শেষে যদিও ইটালী অনেক নতুন জায়গা পেয়েছিল কিন্তু তার পাবার আশা আরও বেশি থাকায় ইটালী যুদ্ধের শেষে অতৃপ্ত দেশে পরিগণিত হয়। ভার্সাই সন্ধিতে ইটালী উপনিবেশ বলে কিছু পায়নি। সুতরাং ভার্সাই সন্ধির প্রতি ইটালীবাসীদের মনোভাব ভাল ছিল বলা যায় না। যুদ্ধের ফলে ইটালীর ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, জীবিকা নির্বাহের ব্যয় মান দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। ইটালীতে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও ইটালীবাসীরা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান কখনো ছিল না। রাজনৈতিক সাম্য, আইনের অনুশাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সমস্যাগুলির

যুদ্ধোত্তর ইটালীর অবস্থা

সমাধান না করতে পারায় জনসাধারণের মধ্যে অপরিমেয় হতাশা, তীব্র অসন্তোষ এবং গণতন্ত্রে অবিশ্বাস প্রকট হয়। ফলে তারা নতুন ধরনের রাজনৈতিক অবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। মুসোলিনী তাঁর ফ্যাসীবাদী দল নিয়ে ঠিক সময়েই জনসাধারণের নিকট উপনীত হলেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করলেন।

যুদ্ধোত্তর ইটালীতে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বলে কিছু রইল না। একটির পর একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হতে থাকল। নতুন মন্ত্রিসভা দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। দেশে খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ, ধর্মঘট ইত্যাদি দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হল। সমাজতন্ত্রী দল ইটালীতে রাশিয়ার মত সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকে। তদানীন্তন সরকার এই সকল বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রতিহত করতে অক্ষম হয়। দেশের এই শোচনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসোলিনী তাঁর ফ্যাসীদল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এক কালোকোর্তা বাহিনী গঠন করেন; ইটালীর যুবকবৃন্দ দলে দলে তাঁর কালোকোর্তা বাহিনীতে যোগদান করে এবং ফ্যাসীদলের সক্রিয় সদস্য হয়। মুসোলিনীর ফ্যাসীদল প্রথমে সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। সমাজতন্ত্রীদলের সভা বা অন্যান্য কার্যকলাপ পণ্ড করাই প্রথমে ফ্যাসীদলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এইভাবে ইটালীর পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আস্থা এই দল অর্জন করে। সমাজতন্ত্রীরা মিলান প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রিক শহরে সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করলে ফ্যাসীদল ঐ সকল হরতাল ভেঙে দিতে সক্ষম হয়। এর ফলে ফ্যাসীদলের ক্ষমতা ইটালীতে খুবই বৃদ্ধি পায়। ফ্যাসীদল একে একে সমস্ত সরকারী কার্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদি দখল করে। এর পর ১৯২২ সালে মুসোলিনী সুযোগ বুঝে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে রোমে গিয়ে জোরপূর্বক ক্ষমতা হস্তগত করেন। ইটালীর রাজা মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল মেনে

মুসোলিনীর আবির্ভাব
ফ্যাসীদলের সাহায্যে ক্ষমতা দখল


মুসোলিনী

নিলেন এবং মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। মুসোলিনী নামে প্রধানমন্ত্রী হলেও আসলে তিনি ইটালীর সর্বেসর্বা হলেন।

ইটালীবাসীরা কেন মুসোলিনীকে নেতা হিসাবে মেনে নিল : কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে ইটালীতে ফ্যাসীবাদ হচ্ছে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের তদানীন্তন সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তারা তাদের সামনে ধ্বংসস্তূপ, বেকারত্ব এবং দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। তাদের নিকট বর্তমান ছিল অন্ধকার এবং ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। তাদের আত্মীয়স্বজনের পুঁজি যা ছিল সমস্ত হারিয়েছিল, সুযোগ-সুবিধা বলে কিছু ছিল না। এ রকম অবস্থায় মুসোলিনী তাঁর দলের মূল নীতি প্রচার করলেন যাতে সুষ্ঠু জীবন যাপনের এক চিত্র যুবকগণ দেখতে পেল এবং এ চিত্রে শুধু তাদের বেকারত্বের অবসানের কথা ছিল না, ইটালীর বহুমুখী উন্নতির কথা ছিল। সহজেই ইটালীর যুবকবৃন্দ মুসোলিনীর দলে যোগদান করল এবং তাঁকে অবিসংবাদী নেতারূপে মেনে নিল।

মুসোলিনীর সাফল্যের কারণ

মুসোলিনীর আভ্যন্তরীণ নীতি : মুসোলিনী ইটালীতে যে ফ্যাসীবাদের প্রবর্তন করলেন সেটির প্রধানতঃ চারটি মূলনীতি ছিল—(ক) রাষ্ট্রই সর্বেসর্বা; রাষ্ট্র এর অন্তর্গত সকল ব্যক্তি ও সংঘের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে এবং জনসাধারণের সহিত সম্পর্ক খুব নিবিড় থাকবে, যার ফলে তাদের ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবান্বিত করবে এবং এইভাবে তাদের প্রকৃত শিক্ষিত করে তুলবে। এই রাষ্ট্র শান্তিবাদকে অস্বীকার করে। মুসোলিনীর মতে আন্তর্জাতিক শান্তি হল বিকলাঙ্গের স্বপ্ন এবং সাম্রাজ্যবাদই হল রাষ্ট্রের জীবনের যেমন চরম এবং পরম কাম্য, তেমনি চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় নিয়ম। এ হতে মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। (খ) ফ্যাসীবাদ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে অস্বীকার করে। (গ) এটি সমাজতন্ত্রবাদের বিরোধী। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা রাষ্ট্রের কর্তব্য। (ঘ) ফ্যাসীবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। "শাসনকার্যের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তির সন্ধান করা উচিত; তাঁকে কর্তৃত্ব ও শ্রদ্ধার উচ্চতম বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।" সংক্ষেপে তাঁর পূজা করতে হবে—এটাই ছিল ফ্যাসীবাদ তথা মুসোলিনীর মূল নীতি।

ফ্যাসীবাদের মূলনীতি

মুসোলিনী এই নীতিগুলিকে কার্যে পরিণত করতে চাইলেন। ইটালীবাসীরাও সাময়িকভাবে মুসোলিনীকে পূজা করতে থাকে। প্রথমেই শাসনব্যবস্থায় তিনি

বহু পরিবর্তন নিয়ে এলেন যাতে শাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগেই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য তিনি ক্ষমতা হস্তগত করার সাথে সাথেই পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্তন করেন নি। অবশ্য কয়েক বৎসর পর তিনি পার্লামেন্ট তুলে দেন এবং তিনি ডুসে (Duce) পদবী গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা প্রভৃতি ধ্বংস করা হয়। ফ্যাসীদল ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯২৬ সালে মুসোলিনীকে ডিক্রীর দ্বারা শাসন কার্য চালাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কয়েকটি শ্রমিক সিণ্ডিকেট গঠন করা হয় এবং কলকারখানায় ধর্মঘট ও কাজ বন্ধ বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়। শ্রমিকদের দৈনিক কার্যের সময়ও বৃদ্ধি করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯২৮ সালে মুসোলিনী পূর্ণবয়স্ক ভোটাধিকার তুলে দিলেন এবং শিক্ষাগত ও সম্পত্তিগত গুণের ওপর ভোটাধিকার নির্ধারিত হল।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই নীতিগুলির প্রয়োগ ও তার ফলাফল

ইটালীর বহুমুখী উন্নতি

ইটালীর বৈষয়িক উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হল এবং এই উন্নতি রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক জীবনে সুস্পষ্ট-ভাবে দেখা গেল। ইটালীর বাৎসরিক বাজেট উদ্বৃত্ত হল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে দেশের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করবার জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইটালীর শিল্পোন্নয়ন, কৃষির উন্নতির জন্য কল্যাণ-মূলক কার্য, জাহাজ প্রস্তুত ইত্যাদি ব্যাপারে সবিশেষ নজর দেওয়া হল। ইটালীতে কয়লা একেবারেই পাওয়া যায় না। সে কারণে শিল্পোন্নয়নে বিশেষ বাধা ছিল। মুসোলিনী এতে পিছিয়ে গেলেন না। ইটালীর খরস্রোতা নদনদীগুলিকে বিজ্ঞানের সাহায্যে বেঁধে এবং তা হতে জলবিদ্যুৎ সৃষ্টি করে তিনি কয়লার অভাব মোচন করলেন। ইটালী দ্রুত শিল্পোন্নয়নের দিকে এগিয়ে গেল। ইটালীর তৈরী বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামের মান বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আদৃত হল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্য মুসোলিনী নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। এর মধ্যে 'গমের জন্য লড়াই' (Battle of wheat) অন্যতম। ফলে দেশে পতিত জমি বলে কিছু রইল না। দেশ কৃষি উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি করল এবং ইটালী খাদ্য উৎপাদনে একটি উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হল।

ধর্মীয় সমস্যার সমাধান

মুসোলিনী ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে পোপের সহিত বহুদিনের বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন। পুনরায় রাষ্ট্রের ধর্ম রোমান-ক্যাথলিক বলে গৃহীত হল। এর ফলে মুসোলিনী রোমান-ক্যাথলিকদের সমর্থন লাভ করেন।

মুসোলিনী ইটালীর বহু কিছু উন্নতি করেছিলেন। সামরিক শক্তিতে ইটালীকে ইউরোপের একটি বিশিষ্ট শক্তিতে পরিণত করেন। ইটালীর বহুমুখী উন্নতির জন্য তাঁর অবদান কম নয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তিনি ইটালীর সম্মান, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন, তবে ইটালীবাসীদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করেন।

বৈদেশিক নীতি : মুসোলিনীর নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ইটালীকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা, ইটালীর উপনিবেশের পরিধির বিস্তার ঘটান, ভূমধ্যসাগরকে ইটালীর হ্রদে পরিণত করা। এ সকল উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করবার জন্য মুসোলিনী সকল প্রকার সামরিক শক্তির বৃদ্ধি সাধন করেন। প্রথম দিকে মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতি ছিল ফরাসী ও যুগোশ্লাভিয়া বিরোধী। ইটালীর ফরাসী-বিরোধী নীতি গ্রহণ করার কয়েকটি কারণও ছিল। ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সই ছিল ; ফ্রান্সে মুসোলিনীর শাসন-বিরোধী বহু ইটালীয়ান পালিয়ে যায়, ফ্রান্স এমন কতকগুলি স্থান দখল করেছিল যেগুলি ইটালীর প্রাপ্য বলে মুসোলিনী মনে করতেন ; দানিয়ুব-তীরবর্তী দেশসমূহে প্রভাব বিস্তারের জন্য ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এ ছাড়া ইটালী ও ফ্রান্স বিভিন্ন নৌশক্তি সম্মেলনে একমত হতে পারেনি। কিন্তু দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কোন যুদ্ধ ঘটেনি। বরঞ্চ জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুত্থানে ইটালী ও ফ্রান্সের সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক হতে দেখা যায়। অবশ্য এই সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

মূল উদ্দেশ্য ও তার কার্যকরী রূপ

মুসোলিনী ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে ইটালীর প্রভাব বিস্তারের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন এবং কয়েকটি রাষ্ট্রের সহিত পারস্পরিক সাহায্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

এর পর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মুসোলিনী নজর দেন। তিনি আফ্রিকাকে ইটালীর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান ক্ষেত্র বলে মনে করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং দেশটি ইটালীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। জাতিসংঘ এর সমালোচনা করলে ইটালী জাতিসংঘ পরিত্যাগ করে। ইথিওপিয়ান যুদ্ধের পর ইটালীর সহিত জার্মানীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। ১৯৩৭ সালে মুসোলিনী কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে যোগদান করেন এবং রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি সম্পূর্ণ হল। ১৯৩৯ সালে মুসোলিনী আলবানিয়া দখল করেন। ১৯৪০ সালে জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের পরাজয়ের

অব্যবহিত পরই মুসোলিনী ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে কিছু সফলতা লাভ করলেও ইটালী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। মুসোলিনীর দেশবাসীরাই তাঁকে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে হত্যা করে।

জার্মানী: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে জার্মানী পরাজিত ও লাঞ্ছিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তার ভৌমিক অখণ্ডতা নষ্ট হয়, উপনিবেশ বলে কিছুই থাকে না, সামরিক শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রচুর ঋণের ভার (যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ) তার ওপর বর্তায়। যুদ্ধশেষের পর জার্মানীতে কিছুদিনের জন্য অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার রাজত্ব চলতে থাকে। জার্মানী রাজনৈতিক গণ্ডগোলের শ্রেষ্ঠস্থান রূপে পরিগণিত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং জার্মানীতে তথাকথিত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়; ফ্রেডারিক ইবার্ট এবং ফিলিপ শিডাম্যান নতুন সরকার পরিচালনার ভার পান।

অস্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থা

জার্মানীতে এই রাজনৈতিক পরিবর্তনটি এক গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলে অনেক ঐতিহাসিক আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব বলে কিছু ঘটেনি। বিজেতা রাষ্ট্রগুলি জার্মানীতে রাজনৈতিক পরিবর্তন দাবী করেছিল বলেই এরূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। কিন্তু এটি নিছক পরিবর্তন ছিল, জার্মান জনসাধারণ এই পরিবর্তন চায়নি। তারা প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসীও ছিল না। এ কারণে জার্মানীতে অচল অবস্থা রয়ে যায় এবং নানারূপ অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটতে থাকে।

নতুন প্রজাতন্ত্রী সরকারের স্বরূপ

রাজ্যশাসনভার মেজরিটি সোস্যালিস্টদের হস্তগত হয়। এ ছাড়া, এই সময় জার্মানীর সাম্যবাদী দল রক্তাক্ত বিপ্লবের সাহায্যে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কয়েকজন সেনাপতি ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য রাজনৈতিক উত্থান সংঘটিত করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। ক্যাপ পুস, মিউনিক পুস এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষতিপূরণ সমস্যা যুদ্ধোত্তর জার্মানীর অন্যতম প্রধান সমস্যা। জার্মানীকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয়। এবং একারণেই এক বিরাট ক্ষতিপূরণের বোঝা তার ওপর বর্তায়। জার্মানী শেষ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা—ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মানীর উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হয়। তার ব্যবসাবাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কলকারখানার উৎপাদন

একেবারে কমে যায়। এর ভেতর ফ্রান্স জার্মানীর শিল্পকেন্দ্র বা প্রাণকেন্দ্র রূঢ় অঞ্চল ক্ষতিপূরণ বাবদ জোর করে দখল করে। ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও রূঢ় অঞ্চল দখলের ফলে ও অন্যান্য কারণে জার্মানীতে অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। প্রজাতান্ত্রিক সরকার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পর অবশ্য অবস্থার কিছুটা উন্নতি করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হতে ঋণ নিয়ে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি করলেও ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের অর্থ নৈতিক মন্দার হাত হতে দেশকে বাঁচাতে পারেনি। এবং ঠিক এই সময়েই হিটলার তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। জনসাধারণকে, বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়কে, আশার কথা তিনি শুনালেন।

জার্মানীর অর্থ নৈতিক অবস্থা

বৈদেশিক নীতি—১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রজাতান্ত্রিক সরকার রাশিয়ার সহিত র‍্যাপালোর সন্ধি স্বাক্ষরিত করেন। রাশিয়া এই চুক্তির ফলে জার্মানীর নিকট হতে নেওয়া পূর্ব-ঋণ পরিশোধের হাত হতে মুক্তি পায়। এই চুক্তিটির সহিত একটি গোপন চুক্তি সংযোজিত হয়। এর দ্বারা ঠিক হয় যে প্রতি বৎসর কিছুসংখ্যক জার্মান সামরিক অফিসার রাশিয়ায় বিশেষ ধরনের শিক্ষার জন্য প্রেরিত হবে। কারণ জার্মানীতে ভার্সাই সন্ধির ফলে বিশেষ ধরনের সামরিক শিক্ষা দেওয়া বে-আইনী ছিল। হিটলারের ক্ষমতা হস্তগত করার পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল।

প্রজাতন্ত্রী সরকারের পররাষ্ট্র নীতি

রাশিয়ার সহিত চুক্তি

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রজাতান্ত্রিক সরকার লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত করে এবং ইউরোপের রাজনীতিতে জার্মানীর অংশ গ্রহণ সুরু হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানী জাতিসংঘে যোগদান করে এবং কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচিত হয়।

লোকার্নো চুক্তি

আভ্যন্তরীণ ইতিহাস—১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি ইবার্টের মৃত্যুর পর বিখ্যাত সেনাপতি হিনডেনবার্গ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৬ হতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সুসময় বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই অবস্থারই বিশেষ উন্নতি হয়। এই সময়টা স্টাসম্যানের যুগ বলা হয়। তিনি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে এই সময়ে হিটলারের নাৎসী দল সম্বন্ধে জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহী ছিল না। জার্মানীতে যেন রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা চলে এসেছিল। কিন্তু

রাষ্ট্রপতি পদে হিনডেনবার্গ

১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের অভূতপূর্ব বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার জন্য এই রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায় এবং সুযোগ বুঝে হিটলার তাঁর অনুগামীদের সাহায্যে ক্ষমতা হস্তগত করেন।

হিটলারের ক্ষমতা দখল :—হিটলার জার্মানীর আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে 'নাৎসী দল' গড়ে তোলেন। তিনি একটি ঝটিকা বাহিনী তৈরী করেন। ইটালীতে যেমন যুবক শ্রেণী দলে দলে মুসোলিনির ফ্যাসীদলে যোগ দিয়েছিল, জার্মানিতে সেরূপ নাৎসী দলে জার্মান যুবক সম্প্রদায় দলে দলে যোগ দেয়। তবে মুসোলিনী অপেক্ষা হিটলারের সংগঠনী প্রতিভা বেশী ছিল। তিনি তাঁর দলের রীতিনীতি ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত করেন। স্বস্তিকা চিহ্নকে দলের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন। 'হিটলারের যুবসংঘ' বলে একটি সংঘ স্থাপিত হয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকবৃন্দই হিটলারের যুব-আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ ছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নাৎসী দল রাইখস্টাগে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং হিটলার প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হস্তগত করেন এবং ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা ছিলেন।



হিটলার

আভ্যন্তরীণ নীতি : নাৎসীবাদ ফ্যাসীবাদেরই একটি সংস্করণ। জাতি এবং রাষ্ট্রই সব কিছু। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে কিছু নেই। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সকল ব্যক্তি ও সংঘের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া উচিত। জার্মান জাতিকে শক্তিশালী করতে হবে। নাৎসীবাদ নেতৃপূজা পূর্ণভাবে সমর্থন করে এবং জঙ্গীবাদের মহিমা প্রচারে পঞ্চমুখ। মানুষের জীবনে যুদ্ধই প্রাণশক্তি। জার্মান জাতিই প্রকৃত আর্য জাতি। বর্ণসঙ্করের হাত হতে একে বাঁচাতে হবে। যা কিছু জার্মানপন্থী তাই শ্রেষ্ঠ এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করবার জন্য সদা-সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। রাষ্ট্রকে সর্ব ব্যাপারে স্বাবলম্বী হতে

নাৎসীবাদের মূলনীতি

হবে। বিশেষ করে অর্থ নৈতিক ব্যাপারে আত্মনির্ভরতা একান্ত প্রয়োজন। গণতন্ত্র শাসনতন্ত্র হিসাবে একেবারেই অচল।

নাৎসীদলের এই নীতিগুলি হিটলারের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি স্বৈরাচারের নামান্তর ছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে চ্যান্সেলার নিযুক্ত হবার পরই হিটলার নাৎসী দলকে জার্মানীতে একমাত্র দলে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনের সময় রাইখস্টাগে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। এই অজুহাতে হিটলার রাষ্ট্রপতি হিনডেনবার্গের সহায়তায় শাসনতন্ত্র সাময়িকভাবে বাতিল করে দেন এবং কমিউনিস্টদের দায়ী করে তাদের নির্মূল করা হয় এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে হিটলার সর্বময় কর্তৃত্ব হস্তগত করেন।

হিটলারের আভ্যন্তরীণ নীতির স্বরূপ

হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরই জার্মানীর শাসনতন্ত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আনা হয়। এই পরিবর্তনগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) **সাংবিধানিক পরিবর্তন**—পূর্বেকার জার্মান রাজ্যগুলিকে নামে মাত্র রাখা হল। তাদের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। এর ফলে জার্মানী যুক্তরাষ্ট্র হতে প্রকৃতপক্ষে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হল। রাজ্য সরকারগুলির সহিত নাৎসী দলের আঞ্চলিক সংস্থাগুলির সম্পর্ক নিকটতর করা হল।

সাংবিধানিক পরিবর্তন

(খ) **শাসনতান্ত্রিকঃ** সরকারী কর্মচারী আইন দ্বারা (১৯৩১) জার্মান ভিন্ন অন্যান্য কর্মচারীদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করতে বলা হল। এই আইন বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত বলে ঘোষণা করা হল। ফলে নাৎসী শাসনের বিরোধিতা করবার জন্য কেউ রইল না।

শাসনতান্ত্রিক

(গ) **বিচার সম্বন্ধীয়ঃ** বিচার ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন আনা হল। আইন সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা পরিত্যাগ করে আইনের এক নূতন ব্যাখ্যা করা হল। রাষ্ট্র এবং নাৎসী শাসন আইনকে যেমনভাবে ব্যাখ্যা করবে তাই আইনের সঠিক ব্যাখ্যা বলে ধরা হবে। জনতা বিচারালয় (People's Court) বলে এক প্রকারের নতুন বিচারালয় স্থাপন করা হল। এই শ্রেণীর বিচারালয়ের কাজ হল রাষ্ট্রবিরোধী এবং নাশকতামূলক কার্যকলাপের সত্বর বিচার করা। এই বিচারালয়ের কার্যাবলী গোপন রাখা হত। একমাত্র ফুয়েরের (হিটলারের) নিকট এই শ্রেণীর বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে

বিচার সম্বন্ধীয় পরিবর্তন

আপীল করা যেত। যারা দোষী বলে বিবেচিত হত তাদের জীবন বন্দীশিবিরে অকথ্য অত্যাচারের পর নাশ করা হত।

(ঘ) **রাজনৈতিক:** জার্মানীতে নাৎসীদলই একমাত্র রাজনৈতিক দল রূপে পরিগণিত হল। অন্যান্য দলগুলিকে আসুরিক শক্তি দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হল।

রাজনৈতিক পরিবর্তন

(ঙ) **জাতিগত:** পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হিটলার তথা নাৎসীদল জার্মান জাতির বিশুদ্ধতার প্রচারে পঞ্চমুখ ছিল। জার্মানদের এই জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য নাৎসী সরকার জার্মানীতে বসবাসকারী অন্যান্য জাতিদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে। বিশেষ করে ইহুদীদের ওপর অত্যাচার চরমে পৌছায়। ইহুদীদের জাতি হিসেবে বয়কট করা হয়। লক্ষ লক্ষ ইহুদী প্রাণভয়ে জার্মানী হতে পালিয়ে যায়, আর যারা পালিয়ে যেতে পারল না তাদের অধিকাংশই বন্দীশিবিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ইহুদীদের ওপর জার্মানদের আক্রোশের আবার আর একটি কারণও ছিল। জার্মানগণ মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাদের পরাজয় ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই ঘটেছিল। অতএব এই বিভীষণদের আগে হতেই ধ্বংস করা প্রয়োজন বলে নাৎসী সরকার ইহুদীদের ওপর এরূপ অকথ্য অত্যাচার করে।

জাতিগত নীতি

(চ) **ধর্মীয়:** বিভিন্ন ধর্মমতগুলির একীকরণ করা নাৎসী সরকারের নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম নীতি ছিল। রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নিবিড় করবার জন্য এরূপ প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ ব্যাপারে একজন জাতীয় বিশপও নিযুক্ত করা হয়। বিভিন্ন খৃষ্টান চার্চগুলি যখন এই নীতির বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে তখন নাৎসী সরকার ধর্মযাজকদের শাস্তির ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণের মনে ধর্মভাব শিথিল করবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে।

ধর্মীয় নীতি

(ছ) **শ্রমিক সম্বন্ধীয়:** শ্রমিক সংস্থাগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। নাৎসীদলের অঙ্গ হিসেবে নাৎসী শ্রমিক ফ্রন্ট খোলা হয়। এর একটি সংবিধানও তৈরী করা হয়। ধর্মঘট এবং কারখানা বন্ধ রাখা বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। নতুন শাসনতন্ত্রে নিয়োগকারীদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা এবং দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নাৎসী সরকারের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। অল্প কিছু

শ্রমিক সম্বন্ধীয় নীতি

দিনের মধ্যেই এই নীতির সুফল পাওয়া যায়। জার্মানী হতে বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হয়। দেশের উন্নতির জন্য জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, ব্রিজ, খাল খনন ইত্যাদি কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ার ফলে অল্প কিছুদিনের ভিতরই পরিবহণ ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়।

জার্মানীর বহুমুখী উন্নতি

হিটলার তথা নাৎসী সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দেয়। দেশকে আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চলে। কারণ, পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করলে, পরনির্ভরশীলতা পূর্ব হতেই পরিত্যাগ করা উচিত বলে মনে করা হয়েছিল। এর ফলে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে চতুঃবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই সময় জার্মানীর শিল্পোন্নতিও চরমভাবে দেখা যায়। জার্মান বৈজ্ঞানিকদের সহায়তায় জার্মানীর কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হতে থাকে যেগুলির চাহিদা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয়। এর ফলে জার্মানীর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ়তর হয়। নাৎসী সরকার এই পরিকল্পনার ফলে প্রধান প্রধান শিল্পগুলিকে সরকারী আওতায় আনবার চেষ্টা করে।

হিটলারের পররাষ্ট্রনীতি :

হিটলারের সকল চিন্তার মূল ভিত্তি ছিল জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ; ভবিষ্যতে বিশ্ব শাসনের ভার জার্মানীর ওপর যে ন্যস্ত হবে সে বিষয়ে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তার আত্মজীবনীতে (মেন্ ক্যাম্ফ) তাঁর পররাষ্ট্র নীতির মূল বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন—তদানীন্তন জার্মান রাষ্ট্রের বাইরে অবস্থিত জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে জার্মান সাম্রাজ্য গঠন করা (Third Reich) হিটলারের মতে একান্ত প্রয়োজন। এবং এই স্থান সমস্যা জার্মানীর চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলিকে কুক্ষিগত করতে পারলে কিছুটা সমাধান হবে। হিটলারের জোরদার বৈদেশিক নীতির আর একটি দিক হল ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি ভঙ্গ করা এবং ভার্সাই সন্ধির মারাত্মক সমালোচনা করা।

হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেননি। বরঞ্চ তিনি উদ্দেশ্যমূলক শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। এরূপ নীতি গ্রহণ করবার কারণ হচ্ছে, বিশ্বকে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেওয়া, জার্মানীকে সামরিক শক্তিতে সজ্জিত করবার জন্য সময় নেওয়া।

যখন জার্মানী সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হবে তখন প্রয়োজন-মাফিক অঞ্চলগুলি সামরিক শক্তির সাহায্যে দখল করা।

পররাষ্ট্রনীতির কার্যকরী রূপঃ হিটলার প্রথমেই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হতে জার্মান প্রতিনিধিকে দেশে ফিরতে আদেশ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় অস্ত্রসজ্জার কথা ঘোষণা করেন। জার্মানী জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে। ইউরোপে যখন আবিসিনিয়া নিয়ে গণ্ডগোল চলছিল সেই সুযোগে হিটলারের সৈন্যবাহিনী রাইন অঞ্চল দখল করে বসল (১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস)। এই ভাবে হিটলার ভার্সাই চুক্তি এবং লোকার্নো চুক্তি ভঙ্গ করলেন।

রাইন অঞ্চল দখল

হিটলার বুঝলেন যে তাঁর পররাষ্ট্রনীতিকে কার্যকরী করতে গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া প্রয়োজন। ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের ফলে এইরূপ একটি সুযোগ এল। কারণ ইটালী আবিসিনিয়া দখলের ফলে ইটালীর সহিত গ্রেট বৃটেন, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ইটালী আবিসিনিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় হিটলার অষ্ট্রিয়ায় নিজের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা আরম্ভ করলেন। এর ফলে অষ্ট্রিয়া একটি জার্মান রাজ্য (German State) বলে নিজেকে স্বীকার করল এবং জার্মানী অষ্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে হিটলার ও মুসোলিনী জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করেন। এর ফলেও জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে সম্পর্কের আরও উন্নতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ দুই দেশ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের 'অক্টোবর প্রটোকল' নামে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে হিটলার জাপানের সহিত কমিউনিস্ট বিরোধী এক চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইটালী এই চুক্তিটি গ্রহণ করে। বিশ্বের রাজনৈতিক আকাশে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং প্রায় ৬।৭ বৎসর ধরে বিশ্বের রাজনীতিতে স্থির বিন্দুরূপে থেকে যায়।

ইটালীর সমর্থন লাভ

জাপান ও ইটালীর সহিত কমিউনিস্ট বিরোধী চুক্তি

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হিটলার নানা অজুহাতে অষ্ট্রিয়া দখল করে জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করেন। এর পর সুদেতেনল্যাণ্ড নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে বিবাদ আরম্ভ হয়। সুদেতেনল্যাণ্ডে বহু জার্মান বাস করত। হিটলার প্রথমেই তাঁর প্রচার বিভাগ দ্বারা চেক-সরকার কর্তৃক সুদেতেন জার্মানদের ওপর তথাকথিত অত্যাচারের কথা

দৈনিক ঘোষণা করতে থাকেন এবং সুদেতেন অঞ্চল জার্মানীর সহিত যুক্ত করবার যৌক্তিকতা দেখান। হিটলার ভেবেছিলেন চেক সরকার তাঁর কথাতেই ভীত হয়ে সুদেতেন অঞ্চল জার্মানীকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু চেক সরকার এ ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব দেখায়। হিটলার সামরিক শক্তি প্রয়োগের কথা ঘোষণা করবার সাথে সাথে বৃটেন ও ফ্রান্স চিন্তিত হয়ে পড়ে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হিটলারকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য জার্মানীতে যান। এর পর বৃটেন, ইটালী ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়কগণ মিউনিকে হিটলারের সহিত মিলিত হন এবং চেকোশ্লোভাকিয়া-সমস্যার সমাধান বের করেন। হিটলার সুদেতেন অঞ্চল মিউনিক চুক্তির ফলে পেলেন। মিউনিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী শক্তিবর্গ সুদেতেন অঞ্চল বাদে অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়ার অখণ্ডতা রক্ষা করা হবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। হিটলার ছমাস পরেই মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করে অবশিষ্ট চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেন। এর পর হিটলার লিথুয়ানিয়াকে মেমেল শহর সমেত অঞ্চলটি ছেড়ে দেবার জন্য এক চরম পত্র দেন। লিথুয়ানিয়া হিটলারের দাবী মেটালে হিটলার লিথুয়ানিয়াকে আক্রমণের হাত হতে নিষ্কৃতি দেন। এর পর হিটলার পোল্যাণ্ড-এর নিকট ডানজিগ বন্দরসহ করাইডর দাবী করেন। ফ্রান্স ও বৃটেন ইতিমধ্যে বুঝেছিল যে তোষণ নীতি দ্বারা হিটলারের পররাজ্য গ্রাস করবার তৃষ্ণা দূর করা যাবে না। তারা ঘোষণা করল যে জার্মানী যদি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে তা হলে উভয় রাষ্ট্র ঐ আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি

হিটলার তাঁর পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের জন্য সাময়িক ভাবে রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে ইচ্ছুক ছিলেন। অপর দিকে সোভিয়েট ইউনিয়নও আত্মরক্ষার জন্য জার্মানীর সহিত চুক্তি করতে মনস্থ করে। কারণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ-নীতির ফলে হিটলার একের পর এক অঞ্চল দখল করছিলেন। স্তালিন বুঝলেন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। হিটলার এই সুযোগে রাশিয়ার সহিত ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে বসলেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা না করে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। বৃটেন ও ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে সেখানে মাঞ্চুকুয়ো নামে এক তাঁবেদার রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রসংঘ জাপানের এই আক্রমণাত্মক নীতির প্রতিবাদ করলে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জাপান রাষ্ট্রসংঘ পরিত্যাগ করে। এই বছরেই জাপান চীনের জেহল নামক প্রদেশটি দখল করল এবং ক্রমে ক্রমে চীনের বিস্তৃত উপকূলভাগ জাপান দখল করে নেয়। জাপানের এই আক্রমণাত্মক কার্যে সমগ্র চীনদেশে এক প্রবল জাপ-বিরোধী মনোভাব দেখা দেয় এবং চীনারা জাপানী পণ্য বর্জন করল। এতে জাপান আরও ক্রোধান্বিত হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক একটি নীতি-নির্ধারক ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। ঘোষণাটি টানাকা মেমোরিয়ালের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। এর দ্বারা চীনের ওপর জাপান সর্বময় কর্তৃত্ব দাবী করে এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত চীনের সম্পর্ক জাপান নিয়ন্ত্রণ করতে চায় বলে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই সময় অবশ্য জাপান তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির সার্থক রূপায়ণের জন্য এক অভিনব পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এটিকে 'এশিয়ার নতুন ব্যবস্থা' (New Order) বলা হয়। এর দ্বারা জাপান এশিয়াকে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির শোষণ হতে রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প হল এবং 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের' জন্য বলে ঘোষণা করল।

এই নতুন ব্যবস্থায় এশিয়ার পরাধীন রাষ্ট্রগুলির পক্ষে জাপানের প্রতি শ্রদ্ধাই জাগরূক হবার কথা কিন্তু জাপানের সম্প্রসারণ নীতি শীঘ্রই প্রমাণ করে দিল যে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বদলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করাই জাপানের উদ্দেশ্য। 'নূতন ব্যবস্থায়' জাপানই মধ্যমণি হিসাবে থাকবে, আর অন্য রাষ্ট্রগুলি তার তল্পি-বাহকের কাজ করবে। এই কারণে জাপানের বহুল প্রচারিত নতুন ব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্রই বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। এর ফলে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ প্রকাশ পেল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জাপান চীনের মূল ভূখণ্ড অধিকার করবার জন্য বিনা যুদ্ধ ঘোষণায় চীন আক্রমণ করল। প্রথমে জাপান চীনের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে কিন্তু চীনারা বারংবার পরাজিত হয়েও জাপানের বশ্যতা স্বীকার করল না। এই অঘোষিত যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত চলেছিল। চীন জয় করা জাপানের পক্ষে সম্ভব হয়নি। জাপানের আক্রমণাত্মক নীতির ফলেই চীন ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশ্য আমেরিকা চীন-জাপান যুদ্ধে চীনকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

জাপান সাম্যবাদী রাশিয়াকে প্রথম হতেই সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে এবং

সাম্যবাদী রাশিয়াকেই তার প্রধান শত্রু বলে মনে করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জাপান জার্মানীর সহিত কমিণ্টার্ন বিরোধী (Anti-Comintern Pact) চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ইটালী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তির বিশ্বরাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাপান সম্পর্কে বিশেষ অবনতি দেখা যায়। সমুদ্রে মৎস্য ধরবার অধিকার ও মাঞ্চুকো ও মোঙ্গলীয় সীমান্ত নিয়ে উভয়ের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধে।

এই বছরই জার্মানী রাশিয়ার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করলে জাপান জার্মানীর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়। ফলে ১৯৩৬-৩৭-এর কমিণ্টার্ন-বিরোধী চুক্তিতে ফাটল ধরবার উপক্রম হয়। এই সময় জাপান ঘোষণা করে যে, সে এখন হতে নিজ স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করবে। এজন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরুতে জাপান নিরপেক্ষ থাকে।

ফ্রান্স :

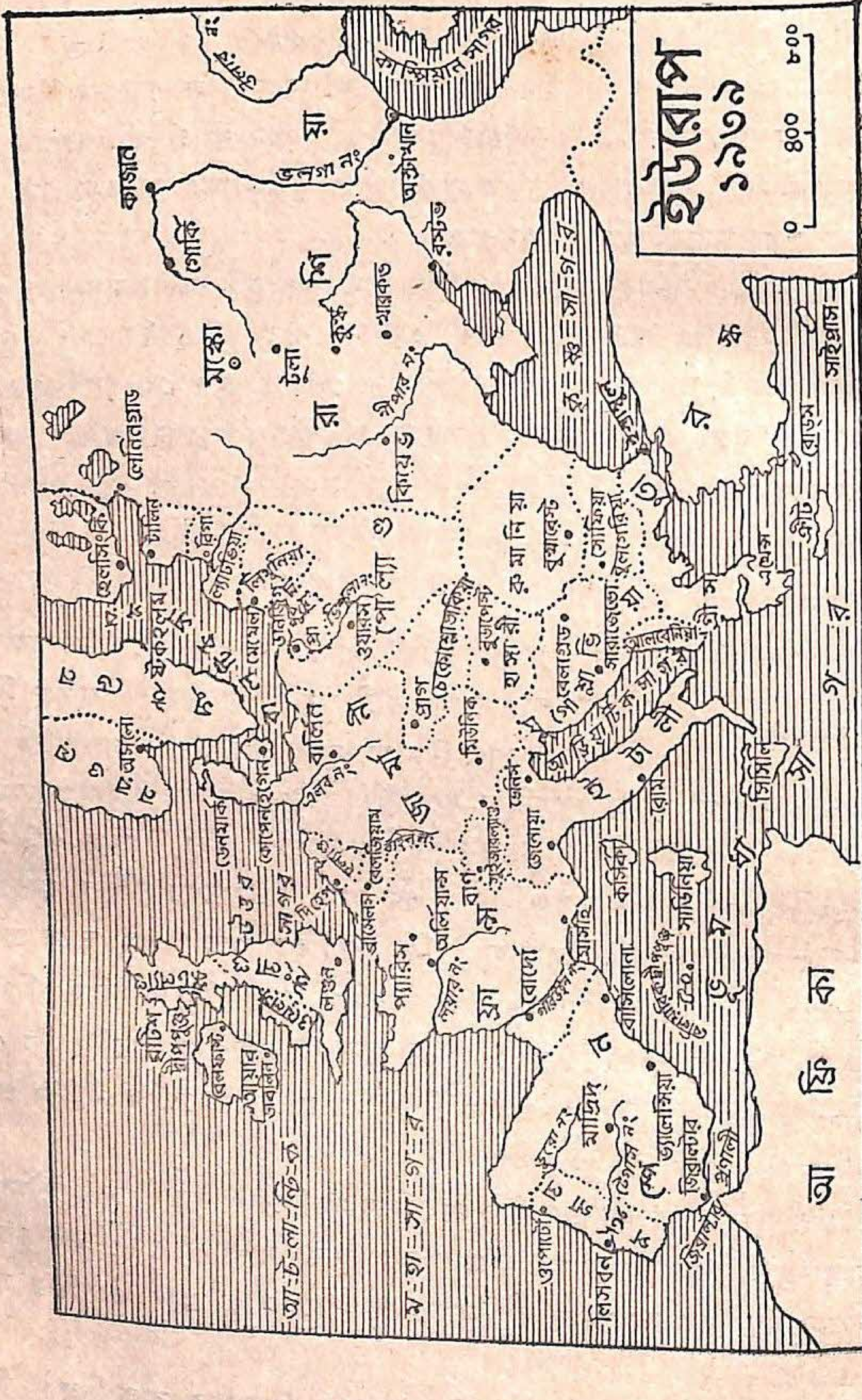
বৈদেশিক নীতি

ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর হতেই জার্মান আক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষা করাই ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল। এ কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে ফ্রান্স নিরাপত্তামূলক সন্ধি স্থাপনে ব্যস্ত থাকে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দেই ফ্রান্স আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সহিত জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে এক পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্থাপন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এটি সম্ভব না হওয়ায় দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সাথে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্পাদিত করে। এই ভাবে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়ার সহিত চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হয়। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই রাষ্ট্রগুলি অল্পবিস্তর জার্মানীর সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত। অতএব জার্মান ভীতিই যে ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এটা অনস্বীকার্য।

ইটালীর সাথে ফ্রান্সের নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু হিটলারের অভ্যুত্থানের ফলে দুই দেশের মধ্যে মিত্রতামূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিটি কিন্তু ফ্রান্সের দিক হতে ভালো বলা যেতে পারে না। ফ্রান্স এ চুক্তির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সাম্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের তিক্ততার সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু হিটলারের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই ফ্রান্স রাশিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ


ইউরোপ
মস্কো
কাজান
ভলগা নং
কাস্পিয়ান সাগর
কৃষ্ণ সাগর
বার্লিন
প্যারিস
লণ্ডন
রোম
মাদ্রিদ
লিসবন
ডেনমার্ক
কোপেনহেগেন
ভেনিস
জেনোয়া
আফ্রিকা

প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয়—একটি অনাক্রমণ চুক্তি এবং অন্যটি পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি। কিন্তু এই চুক্তি দুটি অল্প দিনই কার্যকরী ছিল। এর পর বিশ্বপরিস্থিতির বিশেষ অবনতি ঘটে। ইটালীর ইথিওপিয়া আক্রমণ, জার্মানীর অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার এবং জাতিসংঘের আক্রমণ রোধ করার ব্যর্থতা ইত্যাদি ঘটনা ফ্রান্সকে চিন্তিত করে তোলে। এই সময় ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কও খুব শিথিল হয়ে পড়ে। কিন্তু এই সম্পর্ক দৃঢ়তর হয় যখন হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করতে উদ্যত হন। মিউনিক চুক্তিতে ফ্রান্স অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিল। এর পর জার্মানী পোল্যাণ্ডের ওপর অযথা দাবী করলে ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের সহিত এক জোটে পোল্যাণ্ডকে জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

স্পেনে গৃহযুদ্ধ :

ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির তুলনায় স্পেন খুবই অনুন্নত দেশ। রাজনৈতিক দিক হতে দেখতে গেলে স্পেনে গণতন্ত্র বলে কিছুই ছিল না। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, ধনীদের অত্যাচার এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের মধ্যে আত্মকলহ—এটাই ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের গৃহযুদ্ধের পূর্বেকার স্পেনের ইতিহাস।

স্পেনে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র প্রথমে দেশ শাসন করত। কিন্তু এটি যুদ্ধোত্তর স্পেনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারলে না। ইতিমধ্যে মরক্কোর নেতা আবদুল করিমের নিকট স্পেনের পরাজয় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাবার ব্যবস্থা করেছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রিম ডি রিভেরা কর্তৃক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিও স্পেনের সমস্যার সমাধান করতে পারল না। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে এক প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। এই প্রজাতন্ত্রী সরকার সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রজাতন্ত্রী সরকার যখন স্পেনকে এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেষ্টা করে তখন দেশে প্রতিক্রিয়াশীলরা এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে এবং পরিশেষে বিদ্রোহ করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জেনারেল ফ্রাঙ্কো, যিনি স্পেনীয় মরক্কোর সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন, সরকারের বিরুদ্ধে এক সামরিক উত্থান ঘটিয়ে স্পেনের মূল ভূখণ্ডে উপনীত হলেন। একে একে তিনি স্পেনের পশ্চিম অঞ্চল দখল করে রাজধানী মাদ্রিদের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হলেন।

প্রজাতান্ত্রিক সরকার

প্রজাতন্ত্রী সরকার ভ্যালেনসিয়ায় রাজধানী স্থাপন করল। স্পেনের এই গৃহযুদ্ধ, স্পেনের ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ থাকত। আন্তর্জাতিক মূল্য এর কিছুই হত না, যদি ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি স্পেনের এই গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করত। কিন্তু ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলি স্পেনের এই গৃহযুদ্ধে অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করে ; যার ফলে স্পেনের গৃহযুদ্ধ একটি ক্ষুদ্র আকারের বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনা হিসেবে বিশ্বের ইতিহাসে স্থান পায়।

ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে সামরিক বিদ্রোহ

ইটালী ও জার্মানী ফ্রাঙ্কোকে যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করে। অন্যদিকে প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে সোভিয়েট রাশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্রীরা নানাভাবে সাহায্যে করে। ফলে স্পেনের গৃহযুদ্ধ যেন একটি পরস্পর বিরোধী মতবাদের লড়াইয়ে পরিণত হয়—একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র।

ইটালী, জার্মানী ও রাশিয়ার হস্তক্ষেপ

ইঙ্গ-ফরাসী সরকার কিন্তু এই গৃহযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি। এর পিছনে অনেক কারণ ছিল। বিশেষ করে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের শাসনকাল বিশেষ গৌরবজনক ছিল না। তবে এটা ঠিক যে, বৃটেন ও ফ্রান্স এই গৃহযুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ না করতে অনুরোধ জানিয়েছিল।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে যে সকল রাষ্ট্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল তারা নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই করেছিল। জার্মানী ও ইটালী এক বশংবদ স্পেন চাচ্ছিল যার ফলে আর এক বিশ্বযুদ্ধে তাদের নানা দিক হতে সুবিধা হবে।

গৃহযুদ্ধের ফলে জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই গৃহযুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শক্তিগুলির কেবলমাত্র শক্তির অপব্যবহার হয়েছিল, তারা যা ভেবেছিল তা হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্পেন প্রথম হতেই নিরপেক্ষ ছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সজ্জিত মহড়া বলা যায়।

ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ

উনবিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

১৯৩৯-১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি ছিল জাতির সাথে জাতির যুদ্ধ। বিশ্বের বিরাট সংখ্যক লোক এই যুদ্ধে যোগদান করে এবং এই যুদ্ধের মত ভয়াবহ এবং লোকক্ষয়কারী মহাসমর পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেমন একটিমাত্র কারণের জন্য দেখা দেয়নি, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও একটি কারণে সংঘটিত হয়নি। এর জন্য বিবিধ কারণের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিছনেও এরূপ বিবিধ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণ বর্তমান ছিল।

সূচনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত বলা যায় যে ভার্সাই সন্ধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম মূল কারণ। ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর ওপর এমন সব কঠোর শর্তাদি আরোপ করেছিল যে তার পক্ষে কোন ক্রমেই ঐ সব শর্ত মেনে চলা সম্ভব ছিল না। এর ফলে জার্মানী বুঝতে পারে যে একমাত্র সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে যুদ্ধের দ্বারাই তার পক্ষে ঐ সন্ধির অন্যায় শর্তগুলি হতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ভার্সাই চুক্তি প্রণয়নের সময় জার্মানীর প্রতিনিধিদের মতামতকে কোন মূল্যই দেওয়া হয়নি এবং ঐ সন্ধিকে গ্রহণ করতে জার্মানীকে বাধ্য করা হয়েছিল। এমনকি জার্মান প্রতিনিধিগণের প্রতি সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্যও দেখান হয়নি। এর ফলে জার্মানগণ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে এবং সুযোগ পেলেই এর প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে। ভার্সাই চুক্তি একদিকে যেমন জার্মানীকে অত্যন্ত দুর্বল করে ফেলে, আবার অপর দিকে তাকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রচুর অর্থ দিতেও বলা হয়। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও পরাজিত জার্মানীর পক্ষে অত ক্ষতিপূরণ দেওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। এ সকল কারণে জার্মানরা কখনই ভার্সাই সন্ধিকে ন্যায়সঙ্গত সন্ধি বলে মনে করেনি।

ভার্সাই সন্ধির কঠোরতা

দ্বিতীয়ত, জার্মানীতে নাৎসীদের অভ্যুত্থানও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রসঙ্গে নাৎসীদের আদর্শ সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলিকে অস্বীকার করা ; (২) ইউরোপের যে সকল অঞ্চলে জার্মান জাতির লোক বেশী বাস করে ঐসকল অঞ্চলগুলিকে নিয়ে এক বৃহত্তর জার্মানী গড়ে তোলা ; (৩) ঐ দলের মতে যেহেতু জার্মান জাতি

নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান ও এর নীতিগুলি

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি অতএব জার্মান জাতির নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে অপর জাতিগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করা। এছাড়া নাৎসীবাদে বলা হল যে, রাষ্ট্রের জন্যই ব্যক্তি, ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নাৎসীবাদের মূল ধারণাগুলিকে কার্যকরী করতে গেলে যুদ্ধ করা ভিন্ন উপায় ছিল না, কারণ ঐ সকল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে অপর রাষ্ট্রের স্বার্থে আঘাত করতে হবে এবং তার ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

তৃতীয়ত, হিটলারের পররাষ্ট্রনীতিও যুদ্ধের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। হিটলার যে ভাবে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন তার ফলে আন্তর্জাতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। হিটলার যখন অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করলেন তখন পর্যন্ত ইউরোপের শক্তিগুলি তাঁকে বাধা দেয় নি। অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া লাভ করেও যদি তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন তা হলেও যুদ্ধকে রোধ করা যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিটলার তখন পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন। সুতরাং হিটলারের আগ্রাসী নীতি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করতে বাধ্য করে।

হিটলারের বৈদেশিক নীতি

চতুর্থত, দূরপ্রাচ্যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদ নীতিও যুদ্ধের অন্যতম কারণ। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলেও জাপানকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। জাতিসংঘও জাপানের বিরুদ্ধে কোন সামরিক বা অর্থনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়। এর ফলে জাতিসংঘের মর্যাদা ও সম্মান বহুলাংশে হ্রাস পায়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জাপান অতি তৎপরতার সহিত সম্প্রসারণ নীতি কার্যকরী করতে থাকে। এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জাপান সুদূর-প্রাচ্যের একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দখল করতে সমর্থ হয়। জাপান যেভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিগুলি লঙ্ঘন করে তার সম্প্রসারণ নীতি কার্যকরী করছিল তার ফলে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি

পঞ্চমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য ইটালীর পররাষ্ট্র নীতিও দায়ী ছিল। ইটালীতে মুসোলিনীর অধীনে ফ্যাসিস্ত দলের ক্ষমতালাভের ফলে ইটালীও সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করে। ইটালীর অভিযোগ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইটালীকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল সে তার উপযুক্ত মূল্য পায়নি। এজন্য মুসোলিনী ক্ষমতা লাভ করে ইটালীর উপর যে অন্যায় করা হয়েছিল তার প্রতিশোধ নেবার জন্য চেষ্টা করতে সুরু করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইটালীর পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিকে

ইটালীর পররাষ্ট্র নীতি

দখল করা। ইটালী কর্তৃক ইথিওপিয়া দখলের ফলে জাতিসংঘ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ষষ্ঠত, জার্মানী, জাপান এবং ইটালী কর্তৃক একটি শক্তিগোষ্ঠী গঠন করার ফলেও যুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জার্মানী, জাপান ও ইটালী—এই তিনটি রাষ্ট্রই সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল এবং এই তিনটি রাষ্ট্র একত্রিত হওয়ায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হিটলার জাপানের সহিত কমিউনিস্ট-বিরোধী "কমিন্টার্ন-বিরোধী চুক্তি" সম্পাদন করেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে মাসে ইটালীও ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় ঐ তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনটি রাষ্ট্র পরস্পরের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট হিটলার সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত এক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। এর ফলেও হিটলারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে জার্মানী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও সাহায্য লাভ করায় তার পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

রাষ্ট্রজোট গঠন

সপ্তমত, জাতিসংঘের দুর্বলতা ও শোচনীয় ব্যর্থতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি অনুসারে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং যুদ্ধের অবসানের জন্য জাতিসংঘ গঠিত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটি তার প্রধান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়। এর জন্য প্রধানত দুটি কারণ ছিল। একটি হচ্ছে জাতিসংঘ চুক্তিপত্রে এমন কতকগুলি গলদ ছিল যে সেগুলির ফলে জাতিসংঘের পক্ষে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা এবং আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান করবার বিশেষ কোন উপায় ছিল না। অন্য কারণ হচ্ছে, জাতিসংঘের প্রধান সভ্যগণও তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তেমন সজাগ ছিল না। ঐ সকল রাষ্ট্র জাতীয় স্বার্থের কথাই বেশী চিন্তা করত। এছাড়া জাতিসংঘে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যোগদান করেনি এবং প্রথম দিকে জার্মানী ও সোভিয়েট ইউনিয়নও এর সভ্য ছিল না। এর ফলেও জাতিসংঘ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে আমরা দেখতে পাই যে জাপান, জার্মানী ও ইটালী যখন জাতিসংঘ সংক্রান্ত চুক্তি ভেঙে রাজ্য গ্রাস করছিল জাতিসংঘ তখন ঐ কাজে প্রকৃত বাধাদানে অসমর্থ হয়।

জাতিসংঘের দুর্বলতা

অষ্টমত, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের জার্মানী, জাপান ও ইটালীর প্রতি তোষণ নীতিও যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট দায়ী। অনেকে মনে করেন যে ইঙ্গ-ফরাসী তোষণ নীতিই

যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বড় কারণ। এটি অস্বীকার করা যায় না যে প্রথম হতেই যদি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একত্রে জার্মানী, জাপান ও ইটালীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে চেষ্টা করত তা হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে খুব সম্ভব রোধ করা যেত। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের তোষণ নীতি জার্মানী, ইটালী ও জাপানকে আরও বেশী শক্তিশালী করে তুলেছিল এবং তার ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

ফ্রান্স ও বৃটেনের জার্মান তোষণ নীতি

নবমত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশু কারণ হচ্ছে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ। হিটলার অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া লাভ করেও যখন সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না এবং মিউনিক চুক্তি ভেঙে পোল্যাণ্ডের ডানজিগ বন্দর এবং পোলিশ্ করাইডর দাবী করে বসলেন তখন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাদের তোষণনীতি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে তা ভাল করেই বুঝতে পারে। এবং এর ফলে ঐ দুটি দেশ জার্মানীর প্রতি তাদের আপসমূলক নীতি পরিত্যাগ করে। বৃটেন ও ফ্রান্স বুঝল যে জার্মানীকে বাধা দিতে না পারলে হিটলার সমগ্র ইউরোপ অধিকার করে বসবেন। এই জন্য ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স স্থির করে যে জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে তারা পোল্যাণ্ডকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এই জন্যই গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর অর্থাৎ হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের দুদিন পরে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল।

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দশম কারণ হচ্ছে বৃটেন ও ফ্রান্স প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতে স্বার্থপর নীতি গ্রহণ করে। ঐ দুটি দেশ ইউরোপে রাজনৈতিক অবস্থা অপরিবর্তিত রাখতে চেষ্টা করে। এছাড়া এই দুটি দেশ যুক্তভাবে একই নীতি গ্রহণ না করায় শান্তি রক্ষার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজ ফরাসী ও মার্কিন ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনেতাগণ অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র জার্মানী, ইটালী ও জাপানকেই যুদ্ধের জন্য দায়ী করেন কিন্তু এমত গ্রহণযোগ্য নয়।

বৃটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থপরতা

পরিশেষে আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। ইউরোপ যেন মানসিক উন্মায়ু রোগে ভুগছিল। প্রত্যেক রাষ্ট্রই জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। মানব-সভ্যতার ও কৃষ্টির সুমহান ঐতিহ্যের কথা সকলেই ভুলে গেল। যুদ্ধকে তারা রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে

মনস্তাত্ত্বিক কারণ

ব্যবহার করতে চাইল এবং যুদ্ধকে একটি নৈতিক কর্তব্য এবং সভ্যতার বিশিষ্ট অংশরূপে মেনে নিল। একারণে অনেকে মনে করেন যে আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সুরু হয়েছিল বলে নয়, বরং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ বছর শান্তি কিভাবে বজায় ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ঃ যুদ্ধ মানুষের ইতিহাসে বারবার ঘটেছে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত সর্বনাশা যুদ্ধ আর হয়নি। এই যুদ্ধের পরিধি ছিল পৃথিবীব্যাপী। এ যুদ্ধে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই সৈন্যরা যুদ্ধ করল না, গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকরা এবং কলকারখানায় ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর ও শ্রমিকেরা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। এযুদ্ধে এমন সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল যা মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। যুযুধান প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করতে চেয়েছিল এবং নিজ নিজ রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ যুদ্ধে নিয়োগ করেছিল বলে এটিকে **সামগ্রিক যুদ্ধ (Total war)** বলা হয়।

সামগ্রিক যুদ্ধ

যুদ্ধের গতি ঃ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। এর দু'দিন পরে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ইটালী যুদ্ধের প্রথম দিকে নিরপেক্ষ থাকল।

যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্মানী অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। অভিজ্ঞ সেনাপতিদের দ্বারা সুপরিচালিত দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা পোল্যাণ্ডের পক্ষে সম্ভব হল না। এর ওপর পেছন দিক হতে রাশিয়া পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল। যুদ্ধ শুরু হবার দু সপ্তাহের মধ্যে জার্মানী ও রাশিয়া পোল্যাণ্ড দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল।

প্রথম বছর

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে জার্মানী পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ সুরু করল। একে একে নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর নিকট পরাজিত হল। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে ফ্রান্স সন্ধি প্রার্থনা করতে বাধ্য হল। জার্মানী ফ্রান্সের উত্তরভাগ ও পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি নিজের অধিকারে রাখে। দক্ষিণ ফ্রান্সে জার্মানীর তাঁবেদার এক সরকার (ভিসি সরকার) প্রতিষ্ঠিত হল। অবশ্য ফ্রান্সের বাইরে হতে ফরাসী নেতা দ্যগল ফ্রান্সের মুক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকলেন। আফ্রিকায় অবস্থিত ফরাসী উপনিবেশগুলি দ্যগলকে সাহায্য করতে থাকে।

ফ্রান্সের পতনের পর বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও রুমানিয়া স্বেচ্ছায় জার্মানীর পক্ষে

যুদ্ধে যোগদান করে। এই অবস্থায় গ্রেট বৃটেন বাধ্য হয়ে কিছুকাল একক অবস্থায় যুদ্ধ চালাতে থাকে। এইবার জার্মানী গ্রেট বৃটেনকে কাবু করবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করল। চার্চিলের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গ্রেট বৃটেন আত্মরক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে জাতীয় রক্ষা ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে ব্রতী হল।

বৃটেনের ওপর বিমান আক্রমণ

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত যুদ্ধের গতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জার্মানীর অগ্রগতি কোথাও বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে,



হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস এই সবগুলি রাষ্ট্রই জার্মানীর কুক্ষিগত হয়। আফ্রিকাতে জার্মান সৈন্য সেনাপতি রোমেলের নেতৃত্বে অভূতপূর্ব কৃতিত্ব দেখায়।

তৃতীয় বছর

১৯৪১-এর জুন মাসে অনাক্রমণ চুক্তির শর্ত ভেঙে হিটলার হঠাৎ রাশিয়া আক্রমণ করেন। যুদ্ধের গতিপথে এ ঘটনা এক নাটকীয় পরিবর্তন। রাশিয়ার সৈন্যদল জার্মান আক্রমণে ক্রমশই পিছু হটতে থাকে। জার্মানরা রাশিয়ার প্রায় অর্ধেকটা জয় করতে সমর্থ হয় কিন্তু এই বিরাট দেশকে গ্রাস করা এবং রুশবাসীদের অদম্য দেশপ্রেম ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ধ্বংস করা জার্মানীর পক্ষে সম্ভব হল না। ১৯৪২-এর মাঝামাঝি হতেই রাশিয়ায় জার্মান সৈন্যের পরাজয় সুরু হল।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা

সুদূর-প্রাচ্যে: এদিকে দূর-প্রাচ্যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রবল হয়ে উঠল। জার্মানীর বিজয়ে জাপান উৎসাহ পেল এবং জার্মানীর হাতে পরাজিত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির এশিয়ায় যেসব উপনিবেশ ছিল সেগুলি এই সুযোগে নিজের অধীনে আনার জন্য জাপান সচেষ্ট হল।

জাপানের যুদ্ধে যোগদান

জাপান মনে করেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার চিরাচরিত নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে জাপানকে সক্রিয়-ভাবে বাধা দিতে আসবে না। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জের নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে এক অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করে। এই অবরোধ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যাতে তুলে নেয়, তার জন্য জাপান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 'শান্তি বৈঠক' চালাতে থাকে। কিন্তু 'শান্তি বৈঠক' চলাকালীন জাপান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে এবং ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর সে কোন রকম যুদ্ধ ঘোষণা না করেই পার্ল হারবার নামক মার্কিন নৌঘাঁটি আক্রমণ ও ধ্বংস করে। ফলে জাপানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি অক্ষশক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এইভাবে সম্পূর্ণ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হল।


চার্চিল

যুদ্ধে যোগদান করেই জাপান অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সাথে ফিলিপাইন, হংকং, জাভা, সুমাত্রা, মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি জয় করে ভারতের পূর্বসীমান্তে উপনীত হল। ১৯৪২-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত জাপানের অগ্রগতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। একমাত্র হাওয়াই দ্বীপ ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি হাতছাড়া হয়ে যায়।

জাপানের বিজয় অভিযান

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে মিত্রশক্তির প্রতিরোধ বহুগুণে বেড়ে যায় এবং যুদ্ধের গতিতে এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত রণাঙ্গনে বিপুল শক্তি যোগাতে থাকে। ফলে অক্ষশক্তির অগ্রগতি বন্ধ হয়ে আসে।

চতুর্থ বছর

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্তালিন এবং চীনের জেনারেল চিয়াং কাইশেক বিভিন্ন সম্মেলনে মিলিত হয়ে সামরিক পরিকল্পনা ঠিক করেন। এই সময় রুশ সৈন্য ও জনসাধারণ জার্মান বাহিনীকে প্রবলভাবে প্রতিরোধ করে। বৃটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিল রাশিয়াকে সাহায্য করবে।

পঞ্চম বছর

এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন জেনারেল আইসেন-হাওয়ারের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড হতে এক বিপুল সেনাদল ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফরাসী উপকূলে নরম্যাণ্ডি আক্রমণ করে। জার্মানরা প্রবলভাবে প্রতিরোধ চালিয়েছিল কিন্তু বিমান আক্রমণে তাদের সরবরাহ ব্যবস্থা, নগর ও শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় এবং জার্মান বাহিনী ফ্রান্স ছেড়ে নিজের দেশের দিকে চলে যেতে থাকে।

মিত্রশক্তির ফ্রান্সে অবতরণ

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে ইউরোপীয় রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামে পিছু হটতে সুরু করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে জার্মানীতে এসে দুদিক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ বাহিনী মিলিত হয়। এই সময় রুশরা যাতে বার্লিনে ঢুকে গ্রেপ্তার না করতে পারে সেজন্য হিটলার আত্মহত্যা করেন। হিটলারের মৃত্যুর সাথে সাথে ইউরোপে যুদ্ধের অবসান হল। জার্মান-শক্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তারা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে।

জার্মানীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণ

জাপানের ওপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ

জাপানের আত্মসমর্পণ

এই সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও যুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়ে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে সুরু করে কিন্তু জাপান সহজে আত্মসমর্পণ করতে চাইল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য মিত্রশক্তি জাপানকে হুঁশিয়ার করে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। জাপান এই ঘোষণায় সাড়া না দেওয়ায় ১৯৪৫-এর ৬ই ও ৯ই আগস্ট মার্কিন বিমান হতে যথাক্রমে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হল। এই শহর দুটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জাপান বাধ্য হয়ে ২রা সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করল। পারমাণবিক বোমার আঘাতে এই ভাবে লক্ষাধিক লোকের জীবন নাশ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল।

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

যুদ্ধোত্তর ইউরোপ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। এই যুদ্ধের ন্যায় সর্বনাশা যুদ্ধ আর হয়নি। জগতের সমস্ত রাষ্ট্রই এই যুদ্ধের দ্বারা কোন না কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুদ্ধ শেষে নতুন নতুন এমন সমস্যার সৃষ্টি হয়, যেগুলির সমাধান এখনও সম্ভব হয়নি। যুদ্ধাবস্থায় মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রপ্রধানগণ নানা বৈঠকে মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে ঠিক করেন যুদ্ধান্তে কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ওয়াশিংটন, কুইবেক, কাসাব্লাঙ্কা, কায়রো, তেহেরান, ইয়াল্টা প্রভৃতি স্থানে বৈঠক হয় এবং শেষ বৈঠক হয় পট্‌স্ডাম নামক স্থানে। এই সকল বৈঠকে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিভিন্ন মিত্রশক্তির মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য ঘটেনি। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে বিজেতা দেশগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিল এবং পৃথিবী দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন জোটের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার মতানৈক্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং দুটি শিবিরের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War) সুরু হয়। সেইজন্যেই যুদ্ধোত্তর ইউরোপে আমরা যে সকল রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখি সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজয়ী শক্তিগুলির সর্বসম্মতিক্রমে সাধিত হয়নি, —বরঞ্চ এগুলিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অভিব্যক্তি বলা যেতে পারে

যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৈঠকগুলি

মিত্রশক্তির মধ্যে মতানৈক্য ও ঠাণ্ডা-লড়াই

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল তখন হতেই শান্তিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা মিত্রশক্তিবর্গের নেতাগণ উপলব্ধি করেছিলেন।

এজন্যই আমরা দেখি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট (Roosevelt) এবং চার্চিল (Churchill) যুক্তভাবে একটি সনদ ঘোষণা করেন। ওটি অতলান্তিক সনদ (Atlantic Charter) নামে পরিচিত। এই সনদের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, সকল প্রকার ভয় ও অভাব হতে স্বাধীনতা, সকল প্রকার শক্তি প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা, নিরস্ত্রীকরণের

অতলান্তিক সনদ



প্রয়োজনীয়তা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা হয়।

যুদ্ধ চলাকালে মিত্রশক্তিবর্গের রাষ্ট্রগুলিকে United Nations বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বলা হত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট প্রথম ঐ নামটি ব্যবহার করেন বলে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য যে বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তার নাম দেওয়া হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা United Nations।


রুজভেল্ট

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জাতিপুঞ্জ (U. N.) গঠনের জন্য মিত্রশক্তিবর্গের নেতাগণের মধ্যে বহু আলোচনা হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী চার্চিল, রুজভেল্ট, লিটভিনভ এবং সুং একটি যুক্ত ঘোষণা দেন। এর এক বছর পরে রাশিয়া, চীন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটবৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রিগণের মধ্যে মস্কোতে একটি সম্মেলন হয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রিরা ঘোষণা করেন যে, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করবার জন্য সমান সার্বভৌম অধিকারের ভিত্তিতে সকল শান্তিপ্রিয় দেশকে নিয়ে একটি বিশ্বসংগঠন প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বিভিন্ন সম্মেলন

মস্কো সম্মেলনের পর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কায়রোতে একটি সম্মেলন হয়েছিল। এর পর তেহেরান সম্মেলন, Bretton Woods Conference এবং হট্ স্প্রিং সম্মেলন (Hot Spring Conference) হয়েছিল। এসকল সম্মেলনে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওক্স (Dumberton Oaks) নামক স্থানে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই জাতিপুঞ্জের গঠন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলনে স্থির হয়, জাতিপুঞ্জের একটি সাধারণ সভা, ১১জন সদস্য নিয়ে একটি নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং একটি স্থায়ী দপ্তরখানা থাকবে।

এর পর স্তালিন, রুজভেল্ট এবং চার্চিলের মধ্যে ইয়াল্টায় (Yalta) একটি

সম্মেলন হয়। এখানে জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থাগুলি এবং সভ্যদের ভোটদানের পদ্ধতি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে যেসকল দেশ অক্ষ-শক্তিবর্গের (Axis Powers) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সানফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল ঐ নির্দিষ্ট স্থানে সম্মেলন সুরু হয়। এই সম্মেলনে জাতিপুঞ্জের গঠনপ্রণালী নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিষদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাগণ বুঝেছিলেন যে, অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান করতে না পারলে স্থায়ী বিশ্বশান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে ৫০টি রাষ্ট্র যোগদান করে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর ঐসকল রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সনদ অনুমোদন করে।



স্তালিন

জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য : জাতিপুঞ্জের চারটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সমান অধিকারের নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা। এর তৃতীয় উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানুষের মঙ্গলসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং মানুষের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। জাতিপুঞ্জের চতুর্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন জাতির কার্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা।

জাতিপুঞ্জের নীতি : জাতিপুঞ্জ কি কি নীতি অনুসারে কাজ করবে তাও জাতিপুঞ্জের সনদে স্থির করে দেওয়া হয়। জাতিপুঞ্জ প্রত্যেকটি সভ্যরাষ্ট্রের সমান

সার্বভৌম অধিকারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সনদ অনুসারে সভ্যরাষ্ট্রগুলি যে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে সেগুলি তাদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করতে হবে। সভ্যরাষ্ট্রগুলিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধগুলির মীমাংসা করতে হবে। সভ্য রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগে ভীতি প্রদর্শন করা হতে বা শক্তি প্রয়োগ করা হতে নিরস্ত থাকবে। জাতিপুঞ্জ যখন সনদ অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবে তখন প্রত্যেকটি সভ্যরাষ্ট্রকে জাতিপুঞ্জকে সকল প্রকার সাহায্য করতে হবে এবং যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তাকে কোনপ্রকার সাহায্য করা চলবে না। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যাতে জাতিপুঞ্জের সভ্য নয় এমন রাষ্ট্রগুলিও ঐ সকল নীতি মেনে চলে সে বিষয়ে জাতিপুঞ্জ ব্যবস্থা গ্রহণ কর। কোন রাষ্ট্রের কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করবে না। অবশ্য কোন রাষ্ট্র শান্তি-ভঙ্গ করলে বা শান্তিভঙ্গের ভয় দেখালে বা কোন দেশ আক্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

নীতি

জাতিপুঞ্জের প্রধান সংস্থাগুলি : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ছয়টি সংস্থা আছে।

(১) **সাধারণ সভা** (General Assembly) : সাধারণ সভায় রাষ্ট্রসংঘের প্রত্যেকটি সভ্যরাষ্ট্রই (member state) প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়। তবে কোন রাষ্ট্রই পাঁচজনের বেশী প্রতিনিধি পাঠাতে পারে না। সভায় উপস্থিত ও ভোটদানকারী রাষ্ট্রগুলির অন্ততঃ কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন না পেলে সভা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে না, অবশ্য অন্যান্য ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করতে গেলে উপস্থিত ভোটদানকারী রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশের সমর্থন এবং সকল সভ্যরাষ্ট্রের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন পেলেই চলবে। সাধারণ সভার সদস্যগণ সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান করেন। এছাড়া এটির বিশেষ অধিবেশনও হতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ অথবা সাধারণ সভার অধিকাংশ সভ্যরাষ্ট্র অনুরোধ করলে সেক্রেটারী জেনারেল এরূপ বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন।

সাধারণ সভার গঠন ও কার্যাবলী

সাধারণ সভার সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থাগুলির কাজকর্ম ব্যাপারে আলোচনা করা, সমালোচনা করা, পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি। রাষ্ট্রসংঘের সনদের অন্তর্গত যে-কোন ব্যাপার নিয়ে এবং রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থাগুলির অধিকার ও কর্মের ব্যাপারে সাধারণ সভা আলোচনা করতে পারে এবং রাষ্ট্রসংঘের সভ্যদের

নিকট অথবা নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অথবা উভয়কে একই সঙ্গে পরামর্শ দান করতে পারে।

সাধারণ সভা নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সভ্যদের, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সভ্যদের, এবং অছি পরিষদের সভ্যদের নির্বাচিত করে। নিরাপত্তা পরিষদের বাৎসরিক ও বিশেষ রিপোর্টগুলি সাধারণ সভার অধিবেশনে পেশ করা হয় এবং আলোচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নের জন্য, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এবং মানুষের মৌলিক স্বাধীনতাগুলি লাভ করবার জন্য সাধারণ সভার অনুসন্ধানের ও পরামর্শ দানের অধিকার আছে। জাতিপুঞ্জের বাজেট আলেচেনা ও পাস করবার ক্ষমতা সাধারণ সভাকে দেওয়া হয়েছে।

(২) **নিরাপত্তা পরিষদ :** (Security Council): ১১ জন সদস্য নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত। এর মধ্যে পাঁচজন স্থায়ী সদস্য এবং অবশিষ্ট ছজন অস্থায়ী সদস্য। জাতীয়তাবাদী চীন, ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর স্থায়ী সভ্য। অস্থায়ী সদস্যগণ দু' বছরের জন্য সাধারণ সভার দ্বারা নির্বাচিত হন। একই রাষ্ট্র দুবার পর পর অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করতে পারে না। অস্থায়ী সদস্যদের নির্বাচনের সময়ে দুটি বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখা হয়। প্রথমটি হচ্ছে যাকে সভ্যপদ দিতে চাওয়া হচ্ছে আন্তর্জাতিক শান্তি সংরক্ষণের ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ রাষ্ট্রের অবদান কতখানি এবং দ্বিতীয়ত দেখতে হবে যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলগুলি যাতে প্রতিনিধিত্ব লাভ করে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র একজন করে প্রতিনিধি পরিষদে প্রেরণ করে এবং প্রত্যেক সভ্যের একটি করে ভোট আছে। কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদ যে-কোন সাতজন সভ্যের সমর্থন লাভ করলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। অন্যান্য ব্যাপারে কিন্তু পাঁচজন স্থায়ী সভ্য এবং যে-কোন দুজন অস্থায়ী সদস্যের সমর্থন লাভ করলে এটি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন যে-কোন সময়েই আরম্ভ হতে পারে এবং প্রত্যেকটি সভ্যকে সকল সময়ে নিউইয়র্কে উপস্থিত থাকতে হয়। সম্প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী

নিরাপত্তা পরিষদের সর্বপ্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা।

এমন যদি কোন বিরোধ দেখা দেয় যার ফলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োজন মনে করলে ঐ বিরোধ-সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐ সমস্যা সমাধান করতে বলতে পারে। পরিষদ আবার ঐ জাতীয় বিরোধের ব্যাপারে তদন্তও করতে পারে। যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করা সম্ভব নয়, তবে সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট ঐ বিরোধের মীমাংসার জন্য পেশ করতে হবে। এছাড়া যদি কোন বিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে তবে সে-ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদকে ঐ সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্যায়কারী দেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এতেও যদি উপযুক্ত ফল না পাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে নিরাপত্তা পরিষদের বা জাতিপুঞ্জের নিজস্ব কোন সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমানবাহিনী নেই। ঐ সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিপুঞ্জের সভ্য রাষ্ট্রদের নিকট সামরিক সাহায্য গ্রহণ করবে। আঞ্চলিক বিরোধগুলির সমাধানের জন্য যাতে আঞ্চলিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেদিকেও নিরাপত্তা পরিষদ সচেষ্ট থাকবে। নিরাপত্তা পরিষদকে সাধারণ সভার নিকট বাৎসরিক রিপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশেষ রিপোর্ট প্রেরণ করতে হয়। জাতিপুঞ্জের সকল সভ্যকে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ ও কার্যকরী করতে হয়।

(৩) **অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ** (Economic and Social Council): অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সর্বসমেত ১৮ জন সদস্য আছে। সাধারণ সভা এই সদস্যগণকে নির্বাচিত করে। প্রতি বৎসর ছয়জন করে সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেক সদস্য তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অবসরগ্রহণকারী সদস্যকে কিন্তু পুনরায় নির্বাচিত করা চলে। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট আছে। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করলেই এই পরিষদ সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কমিশন গঠন করতে পারে। এই পরিষদের সভ্য নয় এমন কোন রাষ্ট্রকেও সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ করতে পারে, তবে ঐ ক্ষেত্রে ঐ প্রতিনিধির কোন ভোটদানের অধিকার থাকে না। এছাড়া বিভিন্ন বিশেষ

প্রতিষ্ঠানের (Specialised Agencies) প্রতিনিধিগণও ভোটদানের অধিকার ছাড়া এই পরিষদের সভায় যোগদানের অধিকার লাভ করতে পারে। এই পরিষদ আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে অনুসন্ধান এবং রিপোর্ট প্রণয়ন করতে পারে এবং সাধারণ সভার নিকট এই সকল ব্যাপারে সুপারিশ পাঠাতে পারে। ঐ সকল ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করতে পারে। এই পরিষদ বিভিন্ন বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির (Specialised Agencies) কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং ঐ সকল বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হতে নিয়মিত রিপোর্ট গ্রহণ করে। এই পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদকে বিভিন্ন সংবাদ প্রেরণ করে এবং নিরাপত্তা পরিষদ অনুরোধ করলে ওটিকে সাহায্য দান করে।

(৪) **অছি পরিষদ** (Trusteeship Council)**:** জাতিপুঞ্জের যে সদস্য-রাষ্ট্রগুলি ট্রাস্ট টেরিটরিগুলি শাসন করে তারা এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সভ্যগণ এবং জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সদস্য নিয়ে অছি পরিষদটি গঠিত হয়। তবে এই পরিষদের সভ্যসংখ্যা নির্ধারণের সময় এটি দেখা প্রয়োজন যে পরিষদের সভ্যসংখ্যার অর্ধেক হবে বিভিন্ন ট্রাস্ট অঞ্চলগুলির শাসক এবং অপর অর্ধেক সদস্য রাষ্ট্রগুলির ঐরূপ কোন ট্রাস্ট অঞ্চলে থাকবে না। অছি পরিষদের প্রত্যেক রাষ্ট্রকে একজন করে প্রতিনিধি এই পরিষদে প্রেরণ করতে হয়। প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোটদানের অধিকার আছে। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করলেই এই পরিষদটি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এই পরিষদ প্রয়োজন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এবং বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির (Specialised Agencies) সাহায্য লাভ করতে পারে।

অছি পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী

সাধারণ সভা এবং এর কর্তৃত্বাধীনে অছি পরিষদ ট্রাস্ট অঞ্চলগুলির শাসকদের নিকট হতে প্রাপ্ত রিপোর্টগুলি বিবেচনা করে। ট্রাস্ট অঞ্চলগুলির শাসকদের সহিত পরামর্শ করে এই পরিষদ বিভিন্ন আবেদনগুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিভিন্ন ট্রাস্ট অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে। এছাড়া ট্রাষ্টিশিপ শর্তানুসারে অন্যান্য কাজও করে থাকে। এছাড়া ট্রাস্ট অঞ্চলগুলির জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি কতখানি করেছে সে বিষয়েও এই পরিষদ অনুসন্ধান করে।

(৫) **আন্তর্জাতিক বিচারালয়** (International Court of Justice)**:** বিচার-সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিচারালয় রাষ্ট্রসংঘের সর্বপ্রধান সংস্থা।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কার্যাবলী

রাষ্ট্রসংঘের সকল সভ্যকেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়-সংক্রান্ত আইনটিকে গ্রহণ করতে হয়। তবে এই বিচারালয়ের নিকট যদি কোন বিরোধকে মীমাংসার জন্য দেওয়া না হয় তবে সেক্ষেত্রে এই বিচারালয় কিছুই করতে পারে না। কিন্তু যখন কোন বিরোধের মীমাংসার ভার এর ওপর দেওয়া হবে তখন কিন্তু উভয়কেই ঐ আদালতের রায় মেনে নিতে হবে। ঐ রায় যদি কোন পক্ষ মেনে না নেয় তবে সেক্ষেত্রে অপরপক্ষ ঐ ব্যাপারটি নিরাপত্তা পরিষদকে জানাবে। নিরাপত্তা পরিষদ স্থির করবে ঐ রাষ্ট্রকে কিভাবে ঐ রায় মেনে নিতে বাধ্য করা যায়। সাধারণ সভা এবং নিরাপত্তা পরিষদ কোন আইনসংক্রান্ত প্রশ্নের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

প্রধান সচিব ও সচিবালয়

(৬) **রাষ্ট্রসংঘের দপ্তর** (Secretariat): জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল এবং অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের দপ্তর গঠিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সাধারণ সভা সেক্রেটারী জেনারেলকে মনোনীত করে। সেক্রেটারী জেনারেলই হচ্ছেন রাষ্ট্রসংঘের সর্বপ্রধান কর্মকর্তা। তিনি সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং অছি পরিষদের সভাগুলিতে উপস্থিত থাকেন এবং কাজ করেন। তাঁকে রাষ্ট্রসংঘের কার্যাবলী সংক্রান্ত বাৎসরিক রিপোর্ট সাধারণ সভার নিকট পেশ করতে হয়। কোন ঘটনার ফলে যদি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে তবে সেক্ষেত্রে তিনি ঐ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। সেক্রেটারী জেনারেল একমাত্র জাতিপুঞ্জের নিকটই আনুগত্য প্রদর্শন করবেন, তাঁর নিজের দেশ বা অন্য কোন দেশ বা প্রতিষ্ঠানের নিকট নয়। জাতিপুঞ্জের দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ আছে এবং এই বিভাগগুলির ওপর বিশেষ বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হয়। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মানুসারে সেক্রেটারী জেনারেল দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ করেন।

জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থাগুলি

এ ছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং জাতির মধ্যে সম্প্রীতির ভাব গড়ে তোলবার জন্য এবং প্রত্যেক

মানুষের প্রকৃত মানবিক অধিকার যাতে স্বীকৃত হয় তার জন্য সদস্য রাষ্ট্রদের নিয়ে কয়েকটি বিশেষ সংস্থা স্থাপন করেছে, যেমন :—

(ক) **বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা** (W. H. O.): বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা বা World Health Organization ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত। বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থার উদ্দেশ্য হল বিশ্বের জনসাধারণ যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা, প্রসূতি ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক স্বাস্থ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, জনসাধারণকে স্বাস্থ্যরক্ষা করবার জন্য সু-অভ্যাস গঠনে সাহায্য করা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যপরিধি।

বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থা একটি সার্বিক প্রতিষ্ঠান। কোন রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য না হলেও এতে যোগদান করতে পারে। বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থার বৈঠকে অবশ্য দক্ষ এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্তরাই যোগদান করে থাকেন।

বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থার আঞ্চলিক কমিটি আছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার কার্যাবলী খুবই প্রশংসনীয়, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলিতে।

(খ) **বিশ্ব কৃষিখাদ্যসংস্থা** (F. A. O.) : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই সংস্থাটি পরামর্শদানকারী সংস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণের পুষ্টিসাধনের এবং জীবনধারণের মান উন্নয়ন করাই এই সংস্থার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য এই সংস্থা সদস্যরাষ্ট্রগুলিকে অধিক খাদ্য উৎপাদন, সুষম বণ্টন এবং গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এই সংস্থারও আঞ্চলিক কমিটি রয়েছে। আন্তর্জাতিক তণ্ডুল কমিশন, আঞ্চলিক মৎস্য পরিষদ, আঞ্চলিক বন এবং বনজ দ্রব্য কমিশন প্রভৃতির মাধ্যমে এই সংস্থার কার্যাবলী পরিচালিত হয়।

ফাও-এর উদ্দেশ্য

(গ) **বিশ্বব্যাঙ্ক** (World Bank) : আন্তর্জাতিক মুদ্রাবিষয়ক সহযোগিতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা অটুট রাখা এবং বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ঋণ দ্বারা মেটান ইত্যাদি এই ব্যাঙ্কের কার্যপরিধির মধ্যে আসে। অনুন্নত রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে এই ব্যাঙ্কের বিশেষ অবদান রয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য

এই ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট সত্তা রয়েছে, এবং এই ব্যাঙ্কের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করবার ক্ষমতাও রয়েছে।

(ঘ) **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা** (UNESCO)—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এটি আর একটি বিশেষ সংস্থা। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা হয়। প্যারিসে এটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত।

শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার কার্যাবলী

এই সংস্থার তিনটি বিভাগ রয়েছে। সাধারণ সম্মেলন, কার্যকরী পরিষদ এবং সচিবালয়। জেনারেল কনফারেন্স বা সাধারণ সম্মেলনের সদস্যগণ নির্বাচিত হন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যবৃন্দের মধ্য হতে। বৎসরে একবার অন্তত এর বৈঠক বসেই এবং এই সময় সংস্থার কার্যাবলী ও বাৎসরিক বাজেট সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হয়। এটি সংস্থার নীতি নির্ধারণ করে। কার্যকরী পরিষদের সদস্যসংখ্যা হল ১৮ জন। সাধারণ কনফারেন্সের সদস্যগণ এদের নির্বাচন করেন এবং এদের কার্যকাল তিন বছর। সংস্থার নীতি ও উপদেশগুলি কার্যে পরিণত করাই হল এই পরিষদের মূল কর্তব্য। অবশ্য এবিষয়ে সেক্রেটারিয়েট পরিষদকে সর্ব ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে। সেক্রেটারিয়েটের প্রধান হিসাবে একজন ডিরেক্টর জেনারেল আছেন। তিনি সাধারণ কনফারেন্স কর্তৃক নিযুক্ত হন।

এই সংস্থার উদ্দেশ্য হল—শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ভাব বৃদ্ধি করা; ন্যায়পরায়ণতা, আইনের শাসন, মানবিক অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধার ভাব জাগান। এই সংস্থা বিভিন্ন দেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নতি বিধানের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহায়তায় সেগুলি কার্যে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়।

শ্রমিক সংস্থার কার্যাবলী

(ঙ) **আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা** (I. L. O.) এই সংস্থাটি জাতি-সংঘের একটি বিশেষ সংস্থারূপে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটির কার্যকলাপে সকল দেশই সন্তুষ্ট থাকায় এইটিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থা হিসেবেও গ্রহণ করা হয়। জেনেভা নগরে এটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত।

অন্যান্য সংস্থা

এ ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি বিশেষ সংস্থাও রয়েছে। যেমন, আন্তর্জাতিক টেলি-সংযোগ ইউনিয়ন (International Telecommunications Union বা I. T. U.), আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সংস্থা (World Mateorologial Organization বা (W. M. O.), আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (International Civil Aviation

Organization বা I. C. A. O.), আন্তর্জাতিক পোস্টাল ইউনিয়ন (Universal Postal Union), আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী (Interpol) ইত্যাদি।

এই সংস্থাগুলি দ্বারা বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনে জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টা প্রভূত সাফল্য লাভ করেছে এবং এই সকল সংস্থার কর্মতৎপরতা আজ বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত ও সমাদর লাভ করেছে।

পূর্বতন জাতিসংঘ অপেক্ষা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষমতা অনেক বেশী। কারণ, সামরিক শক্তির দ্বারা আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবার জন্য আছে 'নিরাপত্তা পরিষদ'। জাতিপুঞ্জ ইচ্ছা করলে অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উত্তর কোরিয়া যখন দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করল তখন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান উত্তর কোরিয়াকে বাধা দেওয়ার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। প্রাক্তন জাতিসংঘের সদস্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু জাতিপুঞ্জের জন্মের প্রথম হতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর সদস্য।

জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপ: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতেই অনেক জটিল সমস্যা ও যুদ্ধের মীমাংসা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। প্যালেস্টাইন, কোরিয়া, কাশ্মীর, মিশর, ইন্দোচীন, লেবানন ও কঙ্গোতে জাতিপুঞ্জ পৃথিবীকে যুদ্ধের নিশ্চিত বিপদ হতে রক্ষা করেছে। এ ছাড়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থাগুলি নিরাসক্ত সাহায্য দানের ফলে পৃথিবীতে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছে। তবে জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কার্যগুলি যে সকল ক্ষেত্রেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে তা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করা হয় না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নীতি ও কার্যকলাপ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে অনেক সময় প্রভাবিত করেছে। এইরূপ চলতে থাকলে জাতিপুঞ্জের সাফল্য সম্বন্ধে চিন্তিত হবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

বিংশ অধ্যায়

এশিয়া ও আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের প্রসার (১৯১৯-১৯৪৫)

সূচনা ঃ এশিয়া ও আফ্রিকার পক্ষে ১৯১৯-১৯৪৫—এই ছাব্বিশ বছরকে নবজাগরণের যুগ বলা যেতে পারে। এই সময় এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-আন্দোলন বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে বিভিন্ন দেশ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের হাত হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছে। পরাধীন এশিয়া ও অন্ধকার আফ্রিকার তন্দ্রা টুটে গেছে। এ দুটি মহাদেশের বিভিন্ন জাতি পরাধীনতার গ্লানি আর বহন করতে একেবারেই রাজী নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়েছে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাথে তাদের দ্বারা শাসিত দেশগুলির সম্পর্কে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এশিয়া ও আফ্রিকার রাজ্যগুলি বিশ্বরাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কিন্তু এমন অবস্থা ছিল না। তখন ইউরোপ ছিল সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র অধিকর্তা, ১৮৭০ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশাল এশিয়া ও আফ্রিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদের লীলাভূমি, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে, তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে (১৯১৯) ইউরোপের পুনর্গঠন ব্যাপারে জাতীয়তার নীতি যথাসাধ্য অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের বাইরে নীতিটিকে একরকম বর্জনই করা হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙে যে সব নতুন আরব দেশের পত্তন করা হল সেগুলির স্বতন্ত্র সত্তা হল বটে কিন্তু স্বাধীনতা তারা পেল না। ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে এ নীতি একেবারেই মানা হল না। ফলে এসকল দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিল। জাপান ও তুরস্ক অবশ্য পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে পাশ্চাত্যের সাথে একই তালে চলবার সাধনায় মত্ত হল। ভারতে মহাত্মা গান্ধী ও মিশরে জগলুল পাশা ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু করলেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে এসব দেশগুলির অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এ দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করল।

Organization বা I. C. A. O.), আন্তর্জাতিক পোস্টাল ইউনিয়ন (Universal Postal Union), আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী (Interpol) ইত্যাদি।

এই সংস্থাগুলি দ্বারা বিশ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধনে জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টা প্রভূত সাফল্য লাভ করেছে এবং এই সকল সংস্থার কর্মতৎপরতা আজ বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত ও সমাদর লাভ করেছে।

পূর্বতন জাতিসংঘ অপেক্ষা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্ষমতা অনেক বেশী। কারণ, সামরিক শক্তির দ্বারা আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবার জন্য আছে 'নিরাপত্তা পরিষদ'। জাতিপুঞ্জ ইচ্ছা করলে অপরাধী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উত্তর কোরিয়া যখন দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করল তখন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান উত্তর কোরিয়াকে বাধা দেওয়ার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। প্রাক্তন জাতিসংঘের সদস্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু জাতিপুঞ্জের জন্মের প্রথম হতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এর সদস্য।

জাতিপুঞ্জের কার্যকলাপ: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতেই অনেক জটিল সমস্যা ও যুদ্ধের মীমাংসা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বারা সম্ভব হয়েছে। প্যালেস্টাইন, কোরিয়া, কাশ্মীর, মিশর, ইন্দোচীন, লেবানন ও কঙ্গোতে জাতিপুঞ্জ পৃথিবীকে যুদ্ধের নিশ্চিত বিপদ হতে রক্ষা করেছে। এ ছাড়া, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থাগুলি নিরাসক্ত সাহায্য দানের ফলে পৃথিবীতে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছে। তবে জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কার্যগুলি যে সকল ক্ষেত্রেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে তা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করা হয় না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নীতি ও কার্যকলাপ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে অনেক সময় প্রভাবিত করেছে। এইরূপ চলতে থাকলে জাতিপুঞ্জের সাফল্য সম্বন্ধে চিন্তিত হবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

বিংশ অধ্যায়

এশিয়া ও আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের প্রসার (১৯১৯-১৯৪৫)

সূচনা ঃ এশিয়া ও আফ্রিকার পক্ষে ১৯১৯-১৯৪৫—এই ছাব্বিশ বছরকে নবজাগরণের যুগ বলা যেতে পারে। এই সময় এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-আন্দোলন বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে বিভিন্ন দেশ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের হাত হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছে। পরাধীন এশিয়া ও অন্ধকার আফ্রিকার তন্দ্রা টুটে গেছে। এ দুটি মহাদেশের বিভিন্ন জাতি পরাধীনতার গ্লানি আর বহন করতে একেবারেই রাজী নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়েছে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাথে তাদের দ্বারা শাসিত দেশগুলির সম্পর্কে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এশিয়া ও আফ্রিকার রাজ্যগুলি বিশ্বরাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কিন্তু এমন অবস্থা ছিল না। তখন ইউরোপ ছিল সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র অধিকর্তা, ১৮৭০ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশাল এশিয়া ও আফ্রিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদের লীলাভূমি, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে, তাদের সাম্রাজ্যের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। প্যারিসের শান্তি বৈঠকে (১৯১৯) ইউরোপের পুনর্গঠন ব্যাপারে জাতীয়তার নীতি যথাসাধ্য অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের বাইরে নীতিটিকে একরকম বর্জনই করা হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙে যে সব নতুন আরব দেশের পত্তন করা হল সেগুলির স্বতন্ত্র সত্তা হল বটে কিন্তু স্বাধীনতা তারা পেল না। ভারত, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষেত্রে এ নীতি একেবারেই মানা হল না। ফলে এসকল দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিল। জাপান ও তুরস্ক অবশ্য পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে পাশ্চাত্যের সাথে একই তালে চলবার সাধনায় মত্ত হল। ভারতে মহাত্মা গান্ধী ও মিশরে জগলুল পাশা ব্যাপকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু করলেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে এসব দেশগুলির অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এ দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করল।

তুরস্ক ঃ উনিশ শতকে তুর্কী সাম্রাজ্য দ্রুতগতিতে পতনের দিকে এগিয়ে যায়। এর ক্রমাগত অবক্ষয় রোধ করবার জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফলতা লাভ করেনি। তুরস্কের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার অভাব থাকায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন উনিশ শতকের তুরস্কের ইতিহাসে দেখা যায় না।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অবস্থা সংগীন হয়ে পড়ে। এই বছর তুরস্কে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। 'তরুণ তুর্কী' দল তুরস্কে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে। প্রথমে এই নতুন সরকার সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করলেও কিছুদিনের মধ্যে এ সরকারও রক্ষণশীল ও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে। ফলে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি সরকার-বিরোধী আন্দোলন সুরু করে। প্রথম বলকান যুদ্ধে এই আন্দোলন বিশেষ রূপে দেখা যায়।

তরুণ তুর্কী আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ক ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষে যোগদান করে এবং যুদ্ধশেষে পরাজিত তুরস্কের অবস্থা শোচনীয় অবস্থা ধারণ করে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের দুর্বল সুলতানকে সেভরের সন্ধি স্বীকার করতে বাধ্য করান হয়। সেভরের সন্ধির শর্তগুলি খুবই কঠোর ছিল। এই সন্ধির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীগণ তুমুল আন্দোলন সুরু করে। কামাল এই দলের নেতৃত্ব করেন। সেভরের সন্ধির দ্বারা তুরস্কের রাজ্যসীমা একেবারে সঙ্কুচিত করা হয়। পশ্চিম আনাটোলিয়া গ্রীসকে দেওয়া হয়। গ্রীস এই অঞ্চল দখল করবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করে। মিত্রশক্তি গ্রীসকে সামরিক সাহায্য করে। গ্রীক সৈন্যদল স্মার্ণা দখল করে এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সুলতানের সৈন্যদল উল্লেখযোগ্য বাধা দিতে অক্ষম হয়।

তুরস্কের শোচনীয় অবস্থা

কামালের আবির্ভাব ঃ জাতির এই সংকট-মুহূর্তে তুরস্কে এক তরুণ নেতার আবির্ভাব হল। তাঁর নাম কামাল পাশা। তাঁর নেতৃত্বে তুরস্কে এক রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে।

প্রথম জীবন—মুস্তাফা কামাল পাশা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের অন্তর্গত সালোনিকায় জন্মগ্রহণ করেন। সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি তুরস্কের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন (১৯০৪)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি সবিশেষ সামরিক কৃতিত্ব দেখান এবং জেনারেল পদে উন্নীত হন। তিনি সেভরের অপমানজনক সন্ধি প্রথম হতে অগ্রাহ্য করেন এবং জাতির মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য শপথ নেন।

নেতৃত্বপদে কামাল: তুরস্কের অকর্মণ্য সুলতান ছিলেন ইংরেজদের একান্ত বশংবদ। ইংরেজরা চেষ্টা করছিল তুরস্কের স্বাধীনতা কিভাবে হরণ করা যায়। সুলতান কামালকে পছন্দ করতেন না, কারণ জনসাধারণ তখন কামালকে তাদের প্রিয়তম নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুলতান কামালকে ভয় করতে লাগলেন এবং তাঁর জনপ্রিয়তা কমাবার জন্য কনস্টান্টিনোপ্‌ল হতে কামালকে আনাতোলিয়া নামক প্রদেশে প্রেরণ করেন। কামাল সেখানে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন এবং নিজের দলকে শক্তিশালী করে তোলেন।



কামাল আতাতুর্ক

বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

১৯২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীস তুরস্কের ওপর আক্রমণ সুরু করে এবং তুরস্কের কয়েকটি শহর দখল করে। গ্রীক সৈন্য আঙ্কারার অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু সাকারিয়ার যুদ্ধে কামালের নেতৃত্বে তুর্কী সৈন্য বীরবিক্রমে বাধা দেওয়ায় গ্রীকসৈন্য আঙ্কারা দখল করতে অসমর্থ হয়। এই সময় মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে একমাত্র বৃটেনই গ্রীকদের সাহায্য করে। কামাল ফ্রান্সের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যার ফলে ফরাসীবাহিনী সিলিসিয়া নামক স্থানটি পরিত্যাগ করে চলে আসে। মিত্রশক্তিবর্গ এই সময় গ্রীক-তুর্কী বিবাদের একটা মীমাংসার কথা বলেন। কিন্তু কামাল আনাটোলিয়া হতে গ্রীক সৈন্য অপসারিত না হলে কাহারও সহিত মীমাংসা করতে চান না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি কামালের নেতৃত্বে তুর্কী সৈন্য গ্রীক সৈন্যদলের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ সুরু করে এবং গ্রীক সৈন্য হটতে আরম্ভ করে। তুর্কী সৈন্য স্মার্না পুনর্দখল করে। এই সময়ে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ কামালের সৈন্যদলকে বাধা দেবার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের নিকট আবেদন করেন। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ছাড়া আর কোনও শক্তিই এই আবেদনে সাড়া দেয়নি।

মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৃথা মনে করে। ইতিমধ্যে কামাল তুরস্ক হতে সুলতানের পদ লোপ করলেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তুরস্ক ও মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের জন্য লসেনে এক বৈঠক বসে। এই সম্মেলনে তুরস্কের প্রতিনিধিদের সহিত মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিদের কয়েকটি বিষয় মতপার্থক্য দেখা দেবার ফলে সম্মেলনের বৈঠক কিছুদিনের জন্য স্থগিত থাকে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্মেলনের বৈঠক পুনরায় বসে এবং জুলাই মাসে সম্মেলনের কার্য শেষ হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই লসেনের সন্ধি (Treaty of Lausanne) সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির দ্বারা সেভরের চুক্তিটিকে বাতিল করা হয়। সেভরের চুক্তির কঠোর শর্তাদি আর তুরস্ককে মানতে হল না। সেভরের সন্ধি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দেই সেই চুক্তি নাকচ করা হল।

লসেনের সন্ধি ও তার তাৎপর্য

কামাল ও তাঁর দলের উদ্দেশ্য : কামাল তাঁর অনুচরদের নিয়ে তুর্কী জাতীয়তাবাদী দল গঠন করেন এবং একটি জাতীয় সরকার আঙ্গোরায় বা আঙ্কারায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আঙ্কারায় জাতীয় সভা কর্তৃক মৌলিক আইন গৃহীত হয়। এতে তুরস্কের জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকার ঘোষণা করা হয় এবং তুরস্ককে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করার প্রস্তাব করা হয়।

গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

বিদেশী শত্রুদের পরাজিত করে কামাল তুরস্কের অবিসংবাদী জাতীয় নেতারূপে স্বীকৃতিলাভ করলেন। সুলতান রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কামাল তুরস্কের রাষ্ট্রনায়ক হলেন এবং তুরস্কে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত করলেন।

রাষ্ট্রপতি পদে কামাল

আভ্যন্তরীণ নীতি ঃ কামাল নব্য তুরস্কের স্রষ্টা। তিনি বহু সামাজিক কুপ্রথা তুলে দেন। পুরাতন আচার-ব্যবহারের আমূল পরিবর্তন করলেন। নারীদের স্বাধীনতা দান করলেন। অবরোধ প্রথা দূর হল; বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ হল; মুসলমানী ফেজটুপির পরিবর্তে পাশ্চাত্য পোশাক ও টুপি (Hat) চালু হল। আরবী অক্ষরের বদলে রোমান বর্ণমালার প্রবর্তন করা হল। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করা হল। তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হল। তিনি খালিফের পদ তুলে দিলেন। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মত তিনি তুরস্কের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত আইনকানুনের প্রবর্তন করলেন। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্যও তিনি সবিশেষ

বহুমুখী সংস্কার সাধন

চেষ্টিত ছিলেন। দেশে রেলপথ, রাস্তাঘাট প্রভৃতি বিস্তারলাভ করল। উন্নত ধরনের কৃষিপ্রথা প্রবর্তিত হল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং দেশের কৃষি, সেচব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, খনিজের সদ্ব্যবহার এবং শিল্পব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন।

বৈদেশিক নীতি : কামাল কেবলমাত্র একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন না, বিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। তুরস্কের তিনি একনায়ক ছিলেন কিন্তু তাঁর শাসনে তুরস্কের বহুমুখী উন্নতি দেখা যায়। বৈদেশিক নীতিতে তিনি শান্তির পথ পছন্দ করতেন। প্রথমদিকে তিনি বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। এ কারণে সোভিয়েট ইউনিয়নকে একমাত্র মিত্ররাষ্ট্র বলে মনে করেন এবং মিত্রতামূলক সন্ধিও স্বাক্ষর করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি রাশিয়ার বিদেশে সাম্যবাদ প্রচারের নীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং রাশিয়ার সহিত সম্পর্কের অবসান ঘটান। এর ফলে তিনি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির সহিত বন্ধুত্বমূলক সন্ধি সম্পাদিত করেন। তুরস্ক রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়। আফগানিস্থান, ইরাক ও ইরানের সহিত তিনি পারস্পরিক সাহায্যমূলক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

কৃতিত্ব : বর্তমান তুর্কীজাতির জনক কামাল ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার কার্যাবলীর দ্বারা অনগ্রসর তুরস্ককে সর্ববিষয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির মত উন্নত করে গেছেন। তিনি নব্য তুরস্কের স্রষ্টা। তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে কামাল আতা-তুর্ক, বা তুর্কী জাতির জনক কামাল, এই সম্মানজনক আখ্যা দিয়েছে।

আরব রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা লাভ

ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলছিল আরব দেশগুলিতেও তখন জাতীয় জাগরণ দেখা দেয়। তুরস্ক ও পারস্য ছাড়া যে সকল রাষ্ট্রে আরবী ভাষা প্রচলিত সেগুলিকে এক কথায় আরব দেশ বলা হয়। সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ। এই দেশগুলি

সূচনা

বহুদিন পর্যন্ত তুরস্কের শাসনাধীন ছিল। আরবগণ তুর্কী শাসনের বরাবরই বিরোধী ছিল। তুর্কী সুলতান যখন 'খলিফা' পদবী গ্রহণ করেন তখন আরবগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের নিকট মক্কার প্রধান 'সরিফ' হুসেনই খলিফা হবার একমাত্র অধিকারী ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক

জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করলে আরব দেশগুলি তুরস্কের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করতে সমর্থ হয়। অবশ্য এ বিষয়ে মিত্রপক্ষ তাদের সাহায্য করেছিল।

আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ: (ক) তুরস্কে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যে তরুণ তুর্কীদল ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তা আরববাসীদের মনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করল। এর পর ইউরোপের বল্কান অঞ্চলে তুর্কী-বিরোধী যে আন্দোলন দেখা দেয় তাও আরবদের মনে প্রেরণা যোগাল। এ ছাড়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে যে বিপ্লব সংঘটিত হল তাও আরববাসীদের জাতীয়তাবাদী করে তুলল।

(খ) ইংল্যাণ্ড তার কূটনীতির দ্বারা আরবগণের মধ্যে স্বাধীন হবার ইচ্ছা প্রবল করে তুলল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরাজ সেনাপতি লরেন্স আরবদের তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার জন্য উৎসাহ দিলেন। ফলে, হুসেনের নেতৃত্বে হেজ্জাজ প্রদেশে এক বিদ্রোহ দেখা দিল (১৯১৬)। হুসেনের পুত্র ফৈজল সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস অধিকার করলেন (১৯১৮)। এর সঙ্গে সঙ্গে আরব জাতীয়তাবাদের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল।

ইংল্যাণ্ডের কূটনীতি

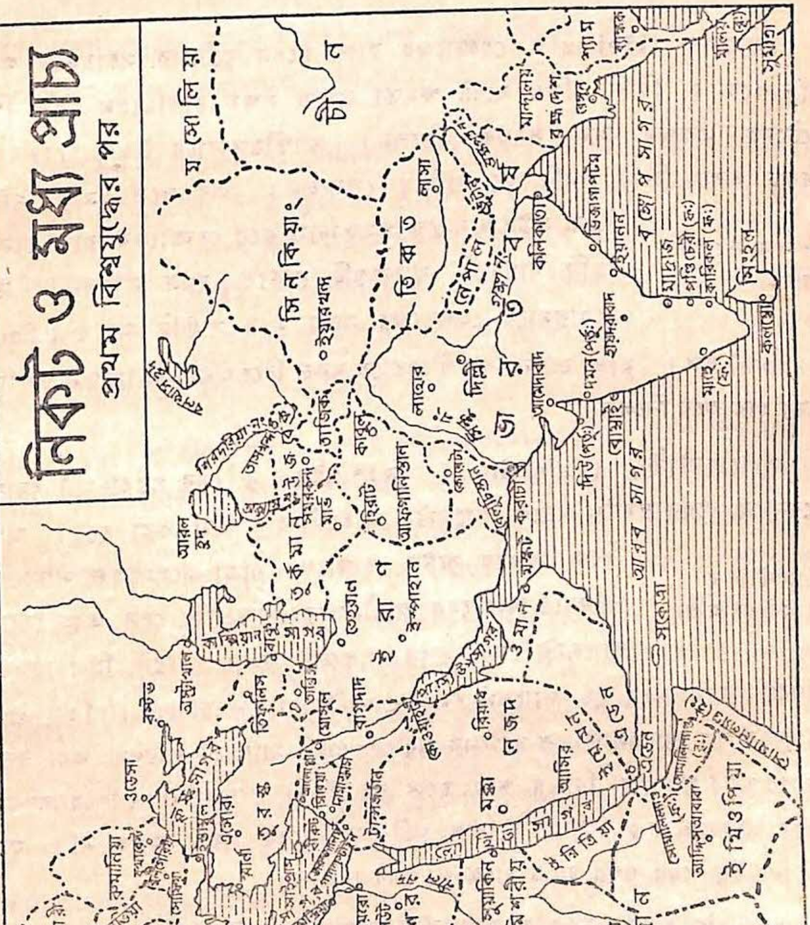
(গ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধিতে আরব জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করা হল। আরব দেশে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠল। এদের মধ্যে প্রধান প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, সৌদি আরব, লেবানন, ট্রান্সজর্ডন। কিন্তু কেবল হজ্জাজ স্বাধীনতা লাভ করল। বাকী দেশগুলিকে পাশ্চাত্য শক্তিগুলি স্বাধীনতা না দিয়ে তাদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এই সকল দেশকে ভাগাভাগি করে নিল। বৃটেন পেল ইরাক, প্যালেস্টাইন এবং ট্রান্সজর্ডান। সিরিয়া এবং লেবানন গেল ফ্রান্সের কর্তৃত্বাধীনে। মনে রাখতে হবে যে এই অঞ্চলগুলি বৃটেন ও ফ্রান্সকে চিরদিনের জন্য দেওয়া হয়নি। অছিদার হিসেবে তারা এই অঞ্চলগুলি শাসন করতে লাগল। সংক্ষেপে আরব জাতীয়তাবাদকে বৃটিশ ও ফরাসী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলিদান দেওয়া হল। আরবগণ মনেপ্রাণে বৃটেন ও ফ্রান্সকে ঘৃণা করতে সুরু করল।

অছি রাজ্য গঠন ও প্রতিক্রিয়া

ইরাক: ইরাকের রাজা ফৈজল এক সুদক্ষ শাসক ও কূটনৈতিক ছিলেন। তিনি তাঁর দেশের জনগণকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

ইরাকের অবস্থা

ইরাককে স্বাধীনতা দেবার বিশেষ কোন ইচ্ছা বৃটেনের ছিল না। কারণ ইরাকে প্রচুর তৈলসম্পদ আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা ফৈজলের চাপে বৃটেনকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইরাককে স্বাধীনতা দিতে হয়। বাগদাদ চুক্তির দ্বারা ম্যাণ্ডেটের অবসান ঘটল। স্বাধীনতা লাভ করলেও



ইরাক বৃটেনকে কতকগুলি বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধাদানে রাজী হল। এছাড়া এই দুই দেশ পরস্পরের মধ্যে সামরিক সাহায্যের চুক্তিও সম্পাদন করল।

ট্রান্সজর্ডান (Transjordan): ট্রান্সজর্ডানের আমীর আবদুল্লা দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন। তিনি যেহেতু বৃটেনের সহায়তায় ট্রান্সজর্ডানের আমীর হয়েছিলেন, সেইজন্য তিনি বৃটেনকে সমর্থন করে চলাই উচিত মনে করতে লাগলেন। এর ফলে ঐ দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারেনি।

ট্রান্সজর্ডান

হেজ্জাজ (Hejjaz) : হেজ্জাজের রাজা হুসেন বৃটেনের সহায়তায় ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি যদিও যথেষ্ট ক্ষমতা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু তিনি বৃটেনের একজন অন্ধ সমর্থক ছিলেন। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ দেশবাসীর নিকট এজন্য তিনি জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেললেন। এর ফলে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইবন সউদ হুসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করে হেজ্জাজের রাজা হলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী কতকগুলি রাজ্যও দখল করলেন। তাঁর নামানুসারে হেজ্জাজের নতুন নাম সাউদি আরব (Saudi Arabia) হল। রাজা হুসেন বিদেশীদের যে সকল বিশেষ সুবিধা দিতেন তা তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন।

হেজ্জাজ বা সৌদি আরব

প্যালেস্টাইন (Palestine): ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করা হবে। অপর দিকে আবার বৃটেন হেজ্জাজের রাজা হুসেনকেও সাহায্যের বিনিময়ে আরবদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেন এবং যেহেতু প্যালেস্টাইনের প্রায় সকলেই তখন আরব ছিল অতএব আরবগণ মনে করে যে প্যালেস্টাইনকেও স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনকে বৃটেনের অধীনে একটি ম্যাণ্ডেটে পরিণত করা হল। এর পর হতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হতে বহু ইহুদী প্যালেস্টাইনে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করে। আরবগণ কিন্তু এটি একেবারেই পছন্দ করত না। ফলে আরবগণ ইহুদীদের ওপর মাঝে মাঝে আক্রমণ চালাত।

প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বিরোধের তদন্তের জন্য যে রয়াল কমিশন (Royal Commission) নিয়োগ করে। সেটি সুপারিশ করে যে প্যালেস্টাইনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা উচিত। একটি ইহুদীদের অধীনে, অপরটি আরবদের অধীনে এবং তৃতীয় অঞ্চলটি বৃটেনের অধীনে থাকবে। এই প্রস্তাব ইহুদীগণ এবং আরবগণ উভয়েই গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার যে দ্বিতীয় কমিশনটি গঠন করে সেটি মত প্রকাশ করে যে প্যালেস্টাইন বিভক্ত করা অনুচিত। এর পর লণ্ডনে এক সম্মেলনে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয় কিন্তু তাও সাফল্যলাভ করল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় বৃটেন আরবদের যুদ্ধে সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে যে, আগামী পাঁচ বৎসরে দশ হাজারের বেশী ইহুদী প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করতে পারবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান করা যায়নি।

ইয়েমেন (Yemen): উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে ইয়েমেনের জনগণ তাদের দেশের উপর তুরস্কের আধিপত্যের অবসানের জন্য চেষ্টা করতে আরম্ভ করে এবং কয়েকবার বিদ্রোহও করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই ইয়েমেনবাসীগণ তুরস্কের নিয়ন্ত্রণকে যথেষ্ট দুর্বল করে ফেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের যুদ্ধের অবসান ঘটলে ইয়েমেনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

স্বাধীন ইয়েমেন

সিরিয়া ও লেবানন (Syria and Lebanon): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সিরিয়া ও লেবাননকে ফ্রান্সের অধীনে ম্যাণ্ডেটে পরিণত করা হয়। লেবাননে আরব খৃষ্টানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং ঐ অঞ্চলের জন্য একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করা হয়। এই অঞ্চলের খৃষ্টান অধিবাসীগণের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ থাকলেও সাধারণতঃ তারা মোটামুটি শাসনব্যবস্থা ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু সিরিয়াতে জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। সিরিয়ার যে তিনটি অঞ্চলে আরবগণ সংখ্যালঘু ছিল সেই অঞ্চলগুলিকে সিরিয়া হতে বিচ্ছিন্ন করা হল। এদের মধ্যে দুটি অঞ্চল সরাসরি ফ্রান্সের শাসনাধীনে রাখা হল এবং তৃতীয় অঞ্চলটিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হল, তবে এই অঞ্চলটিকে সিরিয়ার অধীনে রাখা হল। অবশ্য এই তৃতীয় অঞ্চলটির অধিকাংশই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তুরস্ককে দেওয়া হল। সিরিয়াকে এইভাবে খণ্ডিত করায় ঐ দেশের আরবগণের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এবং ফলে তারা প্রায়ই বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করে। ফরাসী সরকারকে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে এ সকল বিদ্রোহ দমন করতে হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সরকার সিরিয়ার শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়।

লেবাননের সমস্যা

সিরিয়ার সমস্যা

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও সিরিয়ার এবং লেবাননের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হল ফরাসী সরকার ঐ দুটি দেশের হস্তে শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে। আলওয়াই এবং দ্রুজ অঞ্চল দুটিও সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই চুক্তি অনুসারে সিরিয়ায় এক জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। কিন্তু ফরাসী সরকার ঐ চুক্তিটি অনুমোদনে বিলম্ব করতে লাগল। এছাড়া ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিকাংশ ফ্রান্স তুরস্ককে দান করায় সিরিয়ার জাতীয় সরকার প্রতিবাদ স্বরূপ পদত্যাগ করল। এই সুযোগে ফ্রান্স সিরিয়ায় পুনরায় আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং এর অব্যবহিত পরেই প্রত্যেক আরব রাষ্ট্রই স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা ফ্রান্স স্বীকার করে নিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে বৃটেন প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান করতে চায় এবং জাতিপুঞ্জকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে বলে। বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই তখন প্যালেস্টাইন ভাগ করা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান দেখতে পান না। এ কারণে জাতিপুঞ্জের পক্ষ হতে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন সুরু হয়। ফলে প্যালেস্টাইন ভাগ করে এক অংশ আরবদের এবং অপর অংশ ইহুদীদের দেওয়া হল। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহুদীরা স্বাধীন ইস্রাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ

স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্রের পত্তন ও ফলাফল

আরবরা প্রথম হতেই এর বিরোধিতা করে এবং পরিশেষে আরবরা ইহুদী রাষ্ট্রটিকে আক্রমণ করে। এযুদ্ধে কিন্তু আরবরা বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। তারা পরাজিত হয়।

নতুন ইস্রাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রায় ৯ লক্ষ আরব উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে আরবরা ইহুদী রাষ্ট্রটিকে যেমন করেই হোক ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। কিন্তু সংহতি ও প্রস্তুতির দিক হতে আরবরা দুর্বল। বহু বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও ইস্রাইল টিকে রয়েছে এবং টিকে থাকবে বলে মনে হয়। আরবদের ইস্রাইল-বিরোধী মনোভাবের পরিবর্তন না হলে আরব-ইহুদী বিরোধ মিটবে না।

আরব লীগ

আরব লীগ: ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন আরব দেশগুলি তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য একটি রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে। এটির নাম আরব লীগ। অবশ্য এই লীগের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ও স্বার্থসংঘাত দেখা দিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এখন আরব লীগকে নিয়ে কূটনীতির খেলা খেলছে।

মিশর (Egypt): যদিও মিশর উত্তর আফ্রিকার একটি রাষ্ট্র কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে এটি মধ্যপ্রাচ্যের আরব অঞ্চলের অন্তর্গত, কারণ মিশরের জনগণ আরব ভাষায় কথা বলে।

মিশরের রাজনৈতিক অবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে বৃটেন মিশরে তুরস্কের কর্তৃত্বের অবসান ঘটায় এবং ঐ দেশকে বৃটেনের Protectorate বা সংরক্ষিত রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। কিন্তু মিশরের ওয়াফদ্ (Wafd) দলের নেতা জগলুল পাশার নেতৃত্বে মিশরের জাতীয়তাবাদী জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে। প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে জগলুল যোগদানের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বৃটিশ সরকার বাধা দেওয়ায় তাঁর পক্ষে যোগদান করা সম্ভব হয়নি। মিশর-সমস্যা অনুসন্ধানের জন্য বৃটিশ সরকার লর্ড মিলনারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে কিন্তু এতেও কোন সুফল পাওয়া যায় নি। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বৃটেন মিশরীয়দের দাবী আংশিক স্বীকার করে নিল। এর ফলে মিশরের ওপর হতে Protectorate তুলে দেওয়া হয় কিন্তু মিশরের সামরিক ব্যবস্থা এবং মিশরে বসবাসকারী বিদেশীদের ওপর বৃটেনের নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়ে গেল। এর ফলে মিশরীয়গণ বৃটেনের ওপর সন্তুষ্ট হতে পারল না।

নতুন শাসনতন্ত্র

জগলুল পাশা

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করা হল। শাসনতন্ত্রে একটি সিনেট এবং একটি চেম্বার-এর কথা বলা হয়। মন্ত্রিসভা চেম্বারের নিকট দায়ী থাকবে। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে নির্বাচন সংঘটিত হয় তাতে জগলুলের ওয়াফ্‌দ্ পার্টি চেম্বারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জগলুল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু পরবৎসরই সমগ্র দেশব্যাপী বৃটিশ-বিরোধী দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দেয়। জগলুল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সহিত সংরক্ষিত বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠকে বসেন কিন্তু ব্যর্থ হন।

ইতিমধ্যে সুদানের গভর্নর জেনারেল লীস্ট্যাক একজন উগ্রপন্থী দ্বারা নিহত হলেন। বৃটেন মিশরের নিকট অনেক কিছু দাবী করল। জগলুল সবগুলি মেনে

নিলেন কেবলমাত্র কয়েকটি ছাড়া—যেমন সুদান হতে মিশরের সৈন্যদলকে অপসারিত করতে সম্মত হলেন না। বৃটেন যখন দাবী পরিত্যাগ করল না, তখন জগলুল পদত্যাগ করলেন। আহম্মদ জিওয়ার পাশা জগলুলের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বৃটেনের সব দাবীগুলি মেনে নিলেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ওয়াফ্‌দ্ দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বৃটিশ সরকার বিশেষ ক্ষমতার বলে ওয়াফ্‌দ্ পার্টিকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেয় না। ওয়াফ্‌দ্ পার্টিও সরকারের সমস্ত ব্যবস্থা বানচাল করে দিতে সুরু করে। এরপর সিদকি পাশা প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু তাঁর শাসনকাল একনায়কতন্ত্রেরই নামান্তর। তিনি বৃটেনের সহিত একটি নতুন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করেন। খসড়া অনুসারে মিশরে বৃটিশ সামরিক শাসন ১০ বৎসরের জন্য চালু থাকার কথা বলা হয়। ইতিমধ্যে জগলুলের মৃত্যু হয় এবং নাহাস পাশা ওয়াফ্‌দ্ দলের নেতা নির্বাচিত হন। বলাই বাহুল্য, মিশরীয় পার্লামেণ্ট খসড়া চুক্তিটি নাকচ করে দেয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে নাহাস পাশা প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু কয়েকমাস পরেই তাঁকে পদচ্যুত করা হয় এবং মহম্মদ মামুদকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। তিন বৎসরের জন্য পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পর-বৎসর মিশরের সহিত বৃটেনের একটি নতুন চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করা হয়। খসড়া চুক্তিতে ঠিক হয় যে, মিশরের সহিত বৃটেনের একটি সামরিক চুক্তি থাকবে যার ফলে সুয়েজ খালের কয়েকটি অঞ্চলে মাত্র বৃটিশ সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে; মিশর রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করবে। এই বৎসরই পূর্বেকার শাসনতন্ত্র পুনরায় চালু করা হয়। ওয়াফ্‌দ্ পার্টির নেতা নাহাস পাশা পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। নতুন চুক্তির খসড়াটি সম্বন্ধে লণ্ডনে আলোচনা হয়, কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না। নাহাস পাশা পদত্যাগ করেন।

নাহাস পাশা

সিদকি পাশা রাজার মনোনীতরূপে প্রধানমন্ত্রীর পদ পান। ওয়াফ্‌দ্ দলকে শক্তিহীন করবার জন্য তিনি প্রথম হতেই চেষ্টা করেন। ওয়াফ্‌দ্ দল সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করে। জনসাধারণকে কর না দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সিদকি একটি নূতন শাসনতন্ত্র চালু করতে চাইলে মিশরে পুনরায় গণ্ডগোল ও দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয়। সিদকি নিজেই একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১-এর নির্বাচনে ওয়াফ্‌দ্ দলকে নানারূপ কূটকৌশলের দ্বারা পরাজিত করা হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ফুয়াদের মৃত্যুর পর ফারুক মিশরের রাজা হন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নাহাস পাশা পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। ইতিমধ্যে ইটালীর ইথিয়োপিয়া আক্রমণে

ওয়াফ্‌দ্ দল

মিশরবাসীদের মনে নতুন আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি ইংলণ্ডের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। এর ফলে ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্কের বিশেষ উন্নতি ঘটে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজা ফারুক নাহাস পাশাকে পদচ্যুত করেন এবং মামুদ পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এদিকে ওয়াফ্‌দ্‌ দলের মধ্যেও আভ্যন্তরীণ কলহ দেখা দেয় এবং নাহাসের প্রভাব কমে যায়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সরকারের সাহায্যপুষ্ট দলই পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এমন কি নাহাস নির্বাচনে হেরে যান। এই সময়ে আন্তর্জাতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। মিশর সরকার অস্ত্রসজ্জায় বহু অর্থ ব্যয় করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে মিশর জার্মানীর সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে এবং বৃটেনকে বহু সুযোগ-সুবিধা দেয়।

ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্কের উন্নতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিশর : ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে মিশর মিত্রপক্ষের একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও সুয়েজ এলাকায় সামরিক প্রভুত্ব নিয়ে ইংল্যাণ্ডের সহিত মিশরের মনকষাকষি চলতে থাকে। এধারে মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। মিশরের সুলতান ফুয়াদের পরে তাঁর পুত্র ফারুক সিংহাসনে বসেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-মিশরীয়-সন্ধি দ্বারা স্থির হল যে তিন বৎসরের মধ্যে মিশর হতে ইংরেজ সৈন্য অপসারিত হবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার সন্ধির শর্তানুযায়ী সুয়েজ অঞ্চল হতে সৈন্য অপসারণ করল না। ফলে ইঙ্গ-মিশরীয় সম্পর্ক খুবই খারাপ হল। কয়েক বছর পর অবশ্য ইংল্যাণ্ডকে সুয়েজ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হয়।

ইংল্যাণ্ডের সাথে চুক্তি

ইরান : উনিশ শতক হতে সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া পারস্যের ওপর লোলুপ দৃষ্টি দেয়। পারস্য খুবই প্রাচীন রাষ্ট্র। এই দেশের অধিবাসীরা আরব জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এদের সভ্যতাও খুব প্রাচীন। কিন্তু আধুনিক কালে দেশের শাসক (শাহ্‌) খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলির ওপর (তুরস্কের সুলতানের ন্যায়) নির্ভরশীল ছিলেন। বিশ শতকের প্রথমে পারস্যে প্রচুর পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেল। ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া পারস্যে অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে এবং তৈলখনিগুলি হস্তগত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে পারস্যের দুর্দশা

এর ফলে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এক চুক্তির দ্বারা ইংল্যাণ্ড দক্ষিণ পারস্য এবং রাশিয়া

উত্তর পারস্যে প্রভুত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়। পারস্যের শাহ্ ইঙ্গ-ইরানীয় তৈল কোম্পানী নামক এক বিদেশী কোম্পানীর হস্তে পারস্যের তৈল সম্পদ অর্পণ করেন। এই কোম্পানীটি কালক্রমে পারস্যের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করল। পারস্যের সম্পদ তো শোষিত হতে লাগলই বরঞ্চ পারস্যের শাসনকর্তা এই তৈল কোম্পানীর কর্মকর্তাদের নির্দেশমত নিজেকে পরিচালিত করতে আরম্ভ করলেন। পারস্যের জনসাধারণ বিদেশী কোম্পানী ও পারস্যের শাহের কার্যকলাপ পছন্দ করল না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তারা শাহ্‌কে পদচ্যুত করে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসাল। দেশে নানারূপ সংস্কার-সাধনেও তারা চেষ্টা করল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদ্বয়ের চক্রান্তের ফলে সম্ভব হল না।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ও পারস্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পারস্য নিরপেক্ষতা অবলম্বন করল। কিন্তু পারস্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংল্যাণ্ড পারস্যে সৈন্য প্রেরণ করে এবং পারস্যও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় বিপ্লবের ফলে পারস্য রুশ কবল হতে মুক্ত হলেও ইংরেজদের হাত হতে মুক্তি পেল না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধি দ্বারা (ইঙ্গ-পারস্য সন্ধি) পারস্য ইংল্যাণ্ডের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও পারস্য

এই সময় পারস্যে ইংরেজ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করলেন রেজা খাঁ নামক একজন বীর সৈনিক। তিনি বিদেশীদের কবল হতে দেশকে রক্ষা করবার জন্য এক শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করলেন এবং মুসোলিনীর ন্যায় রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। পারস্যের শাহ্ বাধ্য হয়ে রেজা খাঁকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি দেশরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেই ইংল্যাণ্ডের সহিত পারস্যের সমস্ত চুক্তি বাতিল করে দিলেন। তিন বৎসরের মধ্যেই পারস্য এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হল এবং রেজা খাঁ পারস্যের প্রধানমন্ত্রী হলেন (১৯২৩)। এর পর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শাহ্‌কে বিতাড়িত করে নিজেই শাহ্ বা রাজা হলেন। তাঁর নাম হল রেজা শাহ্ পহ্‌লবী।

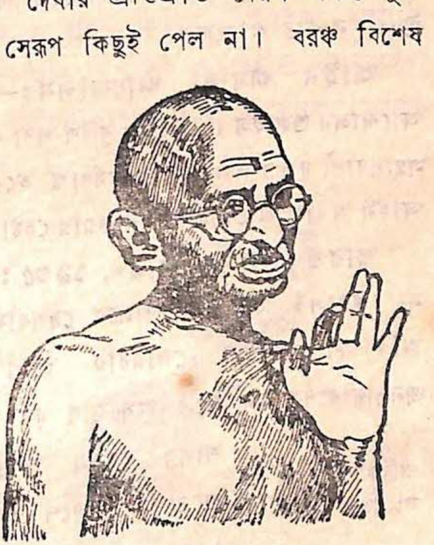
পারস্যের নবজাগরণ

রেজা শাহ্ : রেজা শাহ্ ছিলেন জাতীয়তাবাদী শাহ্। তিনি ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পারস্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রবর্তন করেন। কামাল পাশার ন্যায় তিনিও পাশ্চাত্যকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। দেশে তিনি বহু নতুন আইন প্রবর্তন করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গ-ইরানীয় তৈল কোম্পানীকে এক নতুন চুক্তি করতে বাধ্য করেন। এর ফলে পারস্যের প্রাপ্য

বাৎসরিক রয়ালটি বৃদ্ধি পায়। তিনি রেলপথ স্থাপন, শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, শিল্প-সংস্কার প্রভৃতি নানারূপ উন্নতিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে কার্যে পরিণত করেন। এ সকল ব্যাপারে তিনি জার্মানীর সাহায্য পান। তিনি পারস্যের নাম পরিবর্তন করে ইরান নাম প্রদান করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার চাপে তিনি পদত্যাগ করেন এবং তাঁর পুত্র মুহম্মদ রেজা শাহ্ ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ভারত

অসহযোগ আন্দোলন : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত অকাতরে ধন-প্রাণ দিয়ে বৃটিশ সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল। বিনিময়ে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে ভারত যেরূপ আশা করেছিল সেরূপ কিছুই পেল না। বরঞ্চ বিশেষ বিশেষ আইন করে জনমতের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা বৃটিশ সরকার করল। ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে পৌছল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতময় আন্দোলন স্নুরু হল। ইংরেজ সরকারের শয়তানী শাসনের বিরুদ্ধে দেশময় অসন্তোষের আগুন জলে উঠল। পাঞ্জাবে অমৃতসরে অবস্থিত জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ সরকার এক নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে বহু নরনারীকে হত্যা করল। এটি ভারতের ইতিহাসে 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' বলে কুখ্যাত হয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ভারতবাসী নীরবে সহ্য করল না। তারা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন স্নুরু করল। ইংরেজ-পরিচালিত আইনসভা, আদালত, স্কুল কলেজ বর্জন করা হল। ক্রমে খাজনা বন্ধের আন্দোলনও স্নুরু হল। এই আন্দোলন সর্বত্র অহিংসভাবে চললেও যুক্তপ্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে ক্ষুদ্র জনতা হিংসাত্মক কাজ করবার ফলে গান্ধীজী ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন।



মহাত্মা গান্ধী

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করবার ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি কিছুটা মন্দীভূত হল। কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে কিছুদিন হতাশা চলতে থাকে। বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে জওহরলাল নেহেরু ও স্থভাষচন্দ্রের দল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করল। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শেষে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। সেখানে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হল এবং আইন অমান্য আন্দোলন ও খাজনা বন্ধ স্থরু করা হবে বলে ঠিক হল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা দিবস বিপুল উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপিত হয়। সেই হতে এই তারিখে ভারতবাসীরা স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে আসছে।

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ দাবী

স্বাধীনতা দিবস

আইন অমান্য আন্দোলন:—লাহোর কংগ্রেসের পরই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। ধর্মঘট, বৃটিশ পণ্য বর্জন প্রভৃতি দেশের সর্বত্র দেখা দিল। সন্ত্রাসবাদী দলগুলিও আবার কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল। ইংরেজ সরকার কঠোর হস্তে আইন অমান্য আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করল। প্রায় ১ লক্ষ লোক কারারুদ্ধ হল।

ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫: আইন অমান্য আন্দোলন সফলতালাভ না করলেও এই আন্দোলনে দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরও জোরদার হল। এতে বৃটিশ সরকার ভীত হল। জনসাধারণের মন হতে অসন্তোষ দূর করার জন্য ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে একটি ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ করল। এই আইনে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে আত্মকর্তৃত্ব প্রবর্তিত হয়। এর ফলে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে নয়টিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করল। ইতিমধ্যে ১৯৩৭-৩৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের শাসন মুসলমানদের স্বার্থহানিকর বলে আন্দোলন স্থরু করে। দেশের নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিল।

অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাতীয় সংগ্রাম: এদিকে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে ভারত যোগদান করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা ভারতের এই যুদ্ধ ঘোষণার প্রতিবাদ করেন এবং প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা হতে কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধী পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবেন স্থির করলেন।

ইতিমধ্যে জাপান ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সাথে সাথে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজ সরকার সচেতন হয়। মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ যখন ইংরেজের হাত হতে জাপান ছিনিয়ে নিল তখন বৃটিশ সরকার ভারতকে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন বোধ করল। সেই উদ্দেশ্যে গ্রেট বৃটেনের মন্ত্রিসভা স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে ভারতে পাঠালেন। তিনি এদেশে এসে শাসন সংস্কারের যে পরিকল্পনা পেশ করলেন তাতে মহাযুদ্ধ অবসানে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে বলে বলা হল। তাঁর প্রস্তাবে পাকিস্তানের আভাস ছিল। ভারতীয় নেতারা যুদ্ধাবস্থায় জাতীয় সরকারের দাবি জানালেন। ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব ব্যর্থ হল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করল। ইংরেজ সরকার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করে গান্ধীজী ও অন্যান্য দেশবরেণ্য নেতাদের গ্রেপ্তার করল। এর ফলে ভারতের দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল এবং ভারতব্যাপী গণবিক্ষোভ দেখা দিল। ইংরেজ শাসন ধ্বংস করবার জন্য জনসাধারণ চারদিকে বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহ 'আগস্ট বিপ্লব' নামে পরিচিত। এটি দমন করবার জন্য ইংরেজ সরকার অমানুষিক অত্যাচার চালাল।

ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব

আগস্ট বিপ্লব


নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ইতিমধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র কলকাতা হতে ইংরেজ সরকারের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে জার্মানীতে পালিয়ে যান। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আজাদ হিন্দ হুকুমত বা স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারত হতে ইংরেজদের বিতাড়িত করবার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলেন। এই বাহিনী কোহিমা পর্যন্ত এগিয়ে আসে এবং প্রথম ভারতের মাটিতে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। নেতাজী সুভাষের প্রচেষ্টা ভারতের মুক্তির দিনকে নিকটবর্তী করল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

স্বাধীনতা লাভ ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইংল্যাণ্ডে এট্‌লির নেতৃত্বে শ্রমিক দলের নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা ভারত সমস্যা

সমাধানের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে। অবশেষে ভারত বিভাগ করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত-বিভাগের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৭ খৃঃ জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টে স্বাধীনতা আইন গৃহীত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষ পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হল।

বহু ক্ষতির মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারত আজ তার রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছেছে। বিদেশী শাসনের নাগপাশ হতে মুক্ত হয়ে ভারতবাসী আজ শাপমুক্ত গৌরবোজ্জ্বল প্রভাতে বিশ্বের দরবারে তার আসন লাভ করেছে। এটি কম গৌরবের কথা নয়।

ইন্দোনেশিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে যোগদান করে এবং তড়িৎগতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসী উপনিবেশ-গুলি দখল করে নিল। ওই সময় ইন্দোনেশিয়ার নাম ছিল ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ বা ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। সুমাত্রা, জাভা, সেলিবিস, মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপ এই অঞ্চলে অবস্থিত সতের শতকে ওলন্দাজরা এই দ্বীপপুঞ্জমালা পর্তুগীজদের নিকট হতে জোর করে দখল করে নেয় এবং সেখানে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রবর্তন করে। বিশ শতকের প্রথম হতেই এ অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হয় এবং ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম-এর প্রভাব এ অঞ্চলে দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ অঞ্চলে জাতীয়তাবাদীরা সুকর্ণের নেতৃত্বে আন্দোলন সুরু করে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে জাপান আত্মসমর্পণ করার সাথে সাথেই সুকর্ণ ও মহম্মদ হাতার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র গঠন করলেন। এই প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হল জাকার্তা—এর পূর্ব নাম ছিল ব্যাটাভিয়া। সুমাত্রার ওপরেও এই প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা বিস্তৃত হল। সাম্রাজ্যবাদী ডাচ সরকার এই প্রজাতন্ত্রকে মানতে রাজী হল না এবং এই প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করবার জন্য সশস্ত্র অভিযান চালাল। ফলে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সুরু হল। চার বছর ধরে এই সংগ্রাম চলল। পরিশেষে ইন্দোনেশিয়া সমস্যাটি ভারত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের গোচরে আনল এবং ইন্দোনেশিয়াকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দেবার জন্য ভারতের প্রতিনিধি অনুরোধ জানালেন। অবশেষে নিরাপত্তা পরিষদের পরামর্শে

স্বাধীনতা সংগ্রাম

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইন্দোনেশিয়া

নেদারল্যাণ্ড ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নিল।

ইন্দোচীন

আগে ইন্দোচীনের মধ্যে তিনটি রাজ্য ছিলঃ আন্নাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস। উনিশ শতকে এই তিনটি রাজ্যের ওপর ফ্রান্স তার আধিপত্য স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যখন ইন্দোচীনে প্রবেশ করে তখন এখানে ফরাসী শাসনের অবসান ঘটে। এই সময় ভিয়েৎমিন্ নামে একটি বিপ্লবী দল স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করে। জাপানের পরাজয়ের সাথে সাথে এই দলটি আন্নামে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং এর নাম দেয় ভিয়েৎনাম। এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হলেন হো চি মিন্।

স্বাধীনতা আন্দোলন

পরে ইন্দোচীন অঞ্চলে চারটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে—উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওস।

শ্যাম (থাইল্যাণ্ড)

শ্যামদেশ বরাবর স্বাধীন রয়েছে। কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ দেশটিকে নিজের অধিকারে আনেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানকে বাধা না দিয়ে শ্যামদেশ জাপানের দলে চলে যায় এবং গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধকালীন অবস্থার অবসান ঘটে এবং শ্যামদেশের সাথে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত করে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শ্যামদেশে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং মার্শাল পিবুলসংগ্রাম দেশের ক্ষমতা হস্তগত করেন। তিনি পরে প্রধানমন্ত্রী হন।

ব্রহ্মদেশ

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ বৃটিশ ভারতের অংশ-বিশেষ ছিল। ওই বছরেই এটিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করে যে যুদ্ধশেষে ব্রহ্মদেশকে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বলে মেনে নেওয়া হবে। এর পর-বৎসরই বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে এক আলোচনার জন্য বর্মী প্রতিনিধিদলকে লণ্ডনে বৈঠকের জন্য আহ্বান করলেন এবং আলোচনার পর ঠিক হল যে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দেই ব্রহ্মদেশে বৃটিশ শাসন-এর শেষ হবে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে এক সংবিধান সভা বসে এবং এই সভা ব্রহ্মদেশ এক স্বাধীন সার্বভৌম

স্বাধীনতা লাভ

প্রজাতন্ত্র হিসেবে গণ্য হবে বলে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বর্মী প্রজাতন্ত্র বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

ফিলিপাইন্‌স্‌

প্রথমে স্পেনের ও পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশ ছিল ফিলিপাইন্‌স্‌ দ্বীপপুঞ্জ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইন্‌স্‌ একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ফিলিপাইন্‌স্‌ প্রজাতন্ত্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে।

আফ্রিকার নব-জাগরণ

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রমোদক্ষেত্র আফ্রিকা ইংরেজ, ফরাসী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, ইটালিয়ান, জার্মান বণিকদের শোষণের ক্ষেত্ররূপেই গড়ে ওঠে। বিশ শতকের প্রথম দিকে আফ্রিকায় কোন স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব ছিল না। দুটি বিশ্বযুদ্ধ অবশ্য আফ্রিকানদের রাজনৈতিক চেতনা জোরদার করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ স্বরু হবার অব্যবহিত পরেই জার্মানী বৃটেন, ফ্রান্স প্রমুখ রাষ্ট্রগুলির নিকট প্রস্তাব করে যে আফ্রিকায় যুদ্ধকে টেনে না নিয়ে গিয়ে স্থিতাবস্থা টিকিয়ে রাখাই বাঞ্ছনীয়। জার্মানীর এই প্রস্তাবের পিছনে উদ্দেশ্যটি ভাল ছিল না। এই প্রস্তাবটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টা করে। আর এই প্রভুত্ব বজায় থাকবে যদি শ্বেতাঙ্গরা আত্মকলহে লিপ্ত না হয়। জার্মানীর এই প্রস্তাব অবশ্য মিত্রপক্ষ গ্রহণ করেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকার রাজনৈতিক অবস্থার কোন মূলগত পরিবর্তন হয়নি। শুধু জার্মানীর উপনিবেশগুলি ইংরেজ ও ফরাসীদের ভাগ্যে পড়ে। তবে আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কেনিয়ার নিগ্রো নেতা হেরী থাকু নিগ্রো শ্রমিকদের শ্বেতাঙ্গ মালিকদের শোষণের হাত হতে বাঁচাবার জন্য East Africa Native Association স্থাপন করেন। এই সমিতির সদস্য-সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ সরকার এই সমিতির কার্যকলাপে ভীত হয়ে নেতা থাকুকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীণে রাখে। এর দ্বারা অবশ্য কেনিয়াবাসীদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে দমন করা গেল না। কেনিয়াবাসী বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য তৈরি হতে থাকল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ান কঙ্গোতে সাইমন কিমবাঙ্গুর নেতৃত্বে জনসাধারণ বেলজিয়াম সরকারের কুশাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানায় এবং বিভিন্ন দাবি

চীনের সাম্যবাদী বিপ্লব: ১৯৪৫ হতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনে গৃহযুদ্ধ চলেছিল। চিয়াং সরকার আমেরিকার সাহায্য গ্রহণ করে কমিউনিষ্টদের ধ্বংস করতে চেষ্টা করেন কিন্তু প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও কমিউনিষ্টদের পরাজিত করা সম্ভব হল না। কমিউনিষ্টদের সুশিক্ষিত 'মুক্তি ফৌজে'র নিকট চিয়াং-এর সৈন্যদল দাঁড়াতে পারল না। চিয়াং বাহিনীর সৈন্যরাও একে একে কমিউনিষ্টদের দলে যোগ দিল। এইরূপে কমিউনিষ্ট বাহিনী একটির পর একটি অঞ্চল দখল করতে লাগল। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে কমিউনিষ্ট-বাহিনী পিকিং দখল করল। চিয়াংকাইশেক তাঁর সঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ফরমোসায় পলায়ন করলেন। চীনে দীর্ঘ সংগ্রামের পর কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে বিপ্লব সাফল্যলাভ করল।

চীনে গৃহযুদ্ধ ও সাম্যবাদের জয়

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে চীনে পিপলস্ রিপাবলিক বা লোকায়ত্ত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। মাও সে-তুঙ এই সাধারণতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং চৌ-এন-লাই প্রথম প্রধান মন্ত্রী হলেন।

নতুন সরকার

চীনের নতুন সরকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করল। রাশিয়ার অনুরূপ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে নয়া চীন সরকার জমিদারী প্রথা উঠিয়ে দিল; বৃহৎ শিল্পপতিদের ক্ষমতা বিনষ্ট করল। ভূমির ওপর কৃষকের অধিকার স্বীকার করে নিল। শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়-বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ হল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে চীন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করতে শুরু করল।

আভ্যন্তরীণ নীতি

পররাষ্ট্র-নীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে প্রথমে চীন সরকার শান্তিবাদী ছিল বা বিশ্বশান্তিই একমাত্র কাম্য বলে ঘোষণা করল। কিন্তু যত দিন যেতে থাকল চীন তার বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন আনল।

প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির উপনিবেশ স্থাপন ঃ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ইউরোপ

1. What were the causes of geographical discoveries? [বিভিন্ন ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ কি কি ছিল ?]

2. Describe some of the important geographical discoveries during the 15th and 16th centuries. How did the Europeans discover the sea-route of India and the new world? What were the results of the geographical discoveries? [পনের ও ষোল শতকের প্রধান প্রধান ভৌগোলিক আবিষ্কারের বর্ণনা কর। ভারতে ও আমেরিকায় পৌঁছাবার জলপথ ইউরোপীয়রা কি ভাবে আবিষ্কার করল ? ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল কি হল ?]

3. Give a brief history of the European colonial and commercial expansion till the Seven Years' War (1756). [সপ্তবর্ষ যুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় দেশগুলির ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।]

(C. U. 1965)

4. Write what you know about the Aglo-French struggle for colonial and commercial supremacy in the 18th century. [আঠারো শতকে ইংরেজ ও ফরাসীদের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য নিয়ে যে দ্বন্দ্ব হয় সে সম্বন্ধে যা জান লেখ।]

5. What was the position of the European powers immediately after the Seven Years' War? [সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অবস্থা কিরূপ ছিল ?]

(C. U. 1964, '66)

6. Say what you know of the reign of Frederick the Great of Prussia. [প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেটের শাসনকাল সম্বন্ধে লেখ।]

7. Briefly describe the home and foreign policy of Catherine the Great of Russia [রাশিয়ার ক্যাথারিন দি গ্রেটের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সংক্ষেপে লেখ।]

8. Give an account of the home and foreign policy of Joseph II of Austria. How far was he successful? [অষ্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় যোসেফের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। তিনি কতটা সফলতা অর্জন করেছিলেন?]

9. What is meant by the 'Age of Enlightenment'? What was its nature? ['প্রজ্ঞার যুগ' বলতে কি বোঝ? এর স্বরূপ কি?]

10. What do you mean by 'Enlightened Despotism'? Illustrate your answer from the history of 18th century Europe. [প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচার বলতে কি বোঝ? অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস হতে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম

1. Discuss briefly the causes of the American War of Independence. What led to its success? [আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর। কিসের জন্য এটি সফলতা লাভ করল?] (C. U. 1963)

2. Describe the circumstances leading to the American War of Independence. [আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কিরূপে দেখা দিল সে সম্বন্ধে লেখ।]

3. What were the results of the American War of Independence? [আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল কি হল?]

4. Why did war break out between England and her North American colonies? How do you account for the success of the

colonies in the American War of Independence. [ইংল্যাণ্ডের সাথে তার উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলির যুদ্ধ কেন বাধল? এই যুদ্ধে উপনিবেশগুলির বিজয়ী হবার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (C.U. 1961, '65)

5. What were the causes and effects of the American War of Independence? [আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ ও ফলাফল কি?] (C. U. 1966, '68)

তৃতীয় অধ্যায়

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ান

1. Describe the circumstances leading to the Revolution of 1789 in France. [১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব যে সব ঘটনার ফলে দেখা দেয় সেগুলি বর্ণনা কর।].

2. What were the causes of the French Revolution? [কি কি কারণে ফরাসী বিপ্লব দেখা দিয়েছিল?] (C. U.1961, '64, '67)

3. Give a brief account of the French philosophers and explain how they contributed to the outbreak of the French Revolution. [ফরাসী দার্শনিকদের সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং তাঁরা কিভাবে ফরাসী বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেন তা বর্ণনা কর।] (C. U. 1962, '65)

4. How far was the Revolution in France in 1789 precipitated by economic factors? Why did the Revolution break out in France and not in other European country? [অর্থনৈতিক সমস্যাবলী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবকে কিভাবে ত্বরান্বিত করেছিল? বিপ্লব ফ্রান্সেই কেন প্রথম দেখা দিল?]

5. Narrate briefly the work of the Constituent Assembly of France. [ফ্রান্সের সংবিধান সভার কার্যাবলী সম্বন্ধে লেখ।] (C. U. 1966)

6. Narrate the circumstance leading to the establishment of the Reign of Terror in France. [ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন যে ঘটনাবলীর পরিণতি তা বর্ণনা কর।]

7. Stress the progress of Revolution in France from 1789 to 1795. [১৭৮৯ হতে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের বিপ্লবের অগ্রগতির ইতিহাস লেখ।]

8. What do you know about the war between Revolutionary France and Europe prior to the rise of Napoleon? What were the causes of the war? [নেপোলিয়নের উত্থানের পূর্বে বিপ্লবী ফ্রান্সের সাথে ইউরোপের যে যুদ্ধ হয়েছিল সে সম্বন্ধে কি জান? কি কি কারণে যুদ্ধ দেখা দিয়েছিল?]

9. Sketch the career of Napoleon Bonaparte. How far was he a revolutionary? [নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তাঁকে বিপ্লবী বলা যায় কি না?]

10. Give an estimate of Napoleon as reformer. [সংস্কারক হিসেবে নেপোলিয়নের কৃতিত্ব নিরূপণ কর।] (C. U. 1962, 64, 66, 68)

11. What was the Continental System and how did it contribute to Napoleon's downfall? [কন্টিনেন্টাল সিস্টেম কি? নেপোলিয়নের পতনের জন্য এটি কতটা দায়ী ছিল?]

12. What were the causes of the downfall of Napoleon? [নেপোলিয়নের পতনের কারণ কি কি?] (C. U. 1963, 65, 67)

13. What were the results of the French Revolution? [ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল সম্বন্ধে লেখ।]

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্প-বিপ্লব

1. What do you understand by Industrial Revolution? What were its causes? Where did it begin and why? [শিল্প-বিপ্লব বলতে কি বোঝ? কি কি কারণের জন্য এটি দেখা দেয়? কোথায় এটি প্রথম শুরু হয় এবং কেন?]

2. What were the causes and effects of the Industrial Revolution in England? [ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

3. Give an account of the major inventions which brought about the Industrial Revolution? [যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি শিল্প-বিপ্লব নিয়ে এল সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

4. Discuss some of the far-reaching effects of the Industrial Revolution. [শিল্প-বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর।]
(C. U. 1961, '63, '65)

5. How did the Industrial Revolution affect the world? What was its influence upon the world civilisation? Is it true to say that the modern civilisation is nothing but an industrial civilisation? [শিল্প-বিপ্লব কিরূপে পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছে? মানব সভ্যতার উপর এর প্রভাব কি? এ কি সত্য যে বর্তমান সভ্যতা শিল্প-সভ্যতারই নামান্তর।]

পঞ্চম অধ্যায়

ভিয়েনা সিদ্ধান্ত—ইউরোপীয় সংঘ—মেটারনিক ব্যবস্থা

1. Describe the territorial changes made by the Congress of Vienna. What were the principles followed by the Congress? [ভিয়েনা কংগ্রেস ইউরোপের মানচিত্রে কি পরিবর্তন আনে তা বর্ণনা কর। এই সম্মেলন কি কি নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল?] (C. U. 1962)

2. How did the territorial settlement made by the Congress of Vienna affect the map of Europe? [ভিয়েনা সম্মেলনের পুনর্গঠন বন্দোবস্ত ইউরোপের মানচিত্রে কিরূপ পরিবর্তন এনেছিল?] (C.U. 1964)

3. Explain the main provisions of the Vienna Settlement of 1815. What were its defects? [ভিয়েনা বন্দোবস্তের মূল শর্তগুলি ব্যাখ্যা করে এগুলির ত্রুটি উল্লেখ কর।] (C. U. 1967)

4. Comment on the provisions of the Settlement of Vienna. [ভিয়েনা ব্যবস্থার সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত কর।]

5. Briefly describe the steps taken by the Congress of Vienna in 1815 to secure the peace of Europe from acts of French aggression. Were the measures taken successful ? [১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ভিয়েনা সম্মেলন ফরাসী আক্রমণ হতে ইউরোপের শান্তি রক্ষা করবার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ? সেগুলি কি সফল হয়েছিল ?]

6. What do you mean by the Concert of Europe ? Describe its activities. Why did it fail ? [ইউরোপীয় সংঘ বলতে কি বোঝ ? এর কার্যাবলী বর্ণনা কর। এর ব্যর্থতার কারণ কি ?]

7. Trace the history of the Quadruple Alliance and discuss the causes of its failure. [চতুঃশক্তি চুক্তির ইতিহাস এবং এর ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা কর।]

8. Discuss the character and policy of Metternich. What is meant by Metternich System ? What was its nature ? Why did it fail ? [মেটারনিকের চরিত্র ও নীতি আলোচনা কর। মেটারনিক ব্যবস্থা বলতে কি বোঝ ? এর স্বরূপ কি ছিল ? এটি ব্যর্থ হল কেন ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৮৩০ ও ১৮৪৮-এর বিপ্লব

1. Discuss the causes and effects of the July Revolution of 1830 in France. [১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সে যে বিপ্লব হয় তার কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।] (C. U. 1963, 65)

2. Describe the causes of the July Revolution of 1830 in France. What were its results within and outside France. [১৮৩০-এর জুলাই মাসে ফ্রান্সে যে বিপ্লব হয় তার কারণগুলি বর্ণনা কর। ফ্রান্সে ও ইউরোপে এর ফলাফল কি হল ?]

3. Describe the circumstances leading to the July Revolution of 1830 in France? [ফ্রান্সে ১৮৩০-এর জুলাই মাসে কিভাবে বিপ্লব দেখা দিল তা বর্ণনা কর।]

4. What is the significance of the July Revolution of 1830? [১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের তাৎপর্য কি?]

5. What were the causes and effects of the Revolution of 1848 in Europe? [ইউরোপে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল কি? (C. U. 1962)

6. Discuss the causes and effects of the Revolution of 1848 in France. [ফ্রান্সে ১৮৪৮-এর বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (C. U. 1964, '68)

7. Was the Revolution of 1848 different in character from that of 1789? Why did it fail? [১৮৪৮-এর বিপ্লবের প্রকৃতি কি ১৭৮৯-এর বিপ্লব হতে পৃথক ছিল? এটি কেন ব্যর্থ হল?]

8. Narrate the history of France under Louis-Philippe. Describe the causes that led to the Revolution of 1848 in France and comment on its repercussions in other countries. [লুই ফিলিপের রাজত্বকালে ফ্রান্সের ইতিহাস বর্ণনা কর। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের কারণ কি? অন্যান্য দেশের ওপর ঐ বিপ্লবের কি প্রভাব পড়েছিল?]

9. Account for the fall of the monarchy of Louis Philippe in France. *Or*, Write a note on the Revolution of 1848 at Paris. [ফ্রান্সে লুই ফিলিপের সিংহাসনচ্যুতি সম্বন্ধে আলোচনা কর অথবা ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিপ্লব সম্বন্ধে লেখ।]

10. What were the effects of th Revolution of 1848 in and outside France. *Or*, How did the Revolution of 1848 affect France and other European countries?] ফ্রান্সে ও ফ্রান্সের বাইরে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলাফল কি হল? অথবা, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব কি ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে প্রভাবিত করেছিল?]

সপ্তম অধ্যায়

দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র—তৃতীয় নেপোলিয়ন ও দ্বিতীয় সাম্রাজ্য

1. Write what you know of the Second Republic in France. [দ্বিতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধে যা জান লেখ।]

2. Trace the circumstances leading to the rise of Napoleon I.I. Describe his home and foreign policy. [তৃতীয় নেপোলিয়ন কিরূপে ফ্রান্সে ক্ষমতা হস্তগত করলেন? তাঁর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি বর্ণনা কর।]

3. Analyse the character and policy of Napoleon III. [তৃতীয় নেপোলিয়নের চরিত্র ও নীতি বিশ্লেষণ কর।]

অষ্টম অধ্যায়

ইটালীর ঐক্যসাধন

1. Describe the Unification of Italy. [ইটালীর ঐক্যসাধন বর্ণনা কর।] (C.U. 1961, '63 '65)

2. What was the role of Cavour in the movement for the unification of Italy? [ইটালীর ঐক্যসাধন আন্দোলনে কাভুরের স্থান কিরূপ?] (C. U. 1968)

3. Analyse the role of the masses in Italy's struggle for unification. [ইটালীর ঐক্যসাধন আন্দোলনে জনতার ভূমিকা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে তোমার মতামত লেখ।]

4. Estimate the contributions made by foreign powers to Italian unification. [ইটালীর ঐক্যসাধন আন্দোলনে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির অবদান সম্বন্ধে লেখ।]

8. Estimate the contributions made by Mazzini, Garibaldi, Cavour and Victor Emanuel towards the unification of Italy. [ইটালীর ঐক্যসাধনে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, কাভুর ও ভিক্টর এমানুয়েলের অবদান নিরূপণ কর।]

নবম অধ্যায়

জার্মানীর ঐক্যসাধন

1. Write a short essay on the Unification of Germany [জার্মানীর ঐক্যসাধনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।] (C. U. 1962, 64)

2. How did Bismark unify Germany ? [বিসমার্ক কিভাবে জার্মানীর ঐক্যসাধন করেন।] (C. U. 1967)

3. What were the causes and results of the Franco-Prussian War of 1870 ? [১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে লেখ।]

4. Give in brief, the story of the German unification. Or, Write a short essay on the Unification of Germany. [জার্মানীর জাতীয় ঐক্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। অথবা, জার্মানীর ঐক্যলাভ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।]

5. How did Bismark bring about the unity of Germany ? [বিসমার্ক কিভাবে জার্মানীর ঐক্যসাধন করেন ?]

6. Compare the two unification movements in Italy and Germany. [ইটালী ও জার্মানীর ঐক্যসাধন আন্দোলন দুটির তুলনামূলক আলোচনা কর।]

দশম অধ্যায়

রাশিয়া (১৮৫৫-১৮৯৪)

1. Describe briefly the reforms of Tsar Alexander II. What were the results of his reforms ? [জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার প্রবর্তিত সংস্কারগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তাঁর প্রবর্তিত সংস্কারগুলির ফলাফল কি হল ?]

2. Discuss the internal policy of Tsar Alexander II. [দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আভ্যন্তরীণ নীতি আলোচনা কর।]

3. Descuss the foreign policy of Tsar Alexander II. [দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।]

5. Describe the internal and foreign policy of Alexander III. [তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি বর্ণনা কর।]

একাদশ অধ্যায়

নিকট-প্রাচ্য সমস্যা (১৮৫২-১৯১৯)

1. What do you mean by the Eastern Question? What was its nature during the 19th century? [নিকট-প্রাচ্য সমস্যা বলতে কি বোঝ? উনিশ শতকে এর স্বরূপ সম্বন্ধে লেখ।]

2. Trace the history of the Eastern Question during the 19th and the early part of the 20th century. [উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দিকের নিকট-প্রাচ্য সমস্যা সম্বন্ধে লেখ।]

3. Explain how Greece achieved her independence. *Or*, Describe briefly the story of the Greek War of Independence. [গ্রীস কিভাবে তার স্বাধীনতা লাভ করল তা আলোচনা কর। অথবা, গ্রীক স্বাধীনতা-সমর বর্ণনা কর।]

4. Briefly describe the main features of the Eastern Question during the period 1815-1854. [১৮১৫ হতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিকট-প্রাচ্য সমস্যার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লেখ।]

5. What were the causes and effects of the Crimean War? [ক্রিমিয়া যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে লেখ।]

6. Discuss the significance of the Russo-Turkish War of 1877. [১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের রুশ-তুর্কী যুদ্ধের তাৎপর্য আলোচনা কর।]

7. Give an account of the Eastern Question from the Crimean War to the Berlin Congress. [ক্রিমিয়ার যুদ্ধ হতে বার্লিন কংগ্রেস পর্যন্ত নিকট-প্রাচ্য সমস্যা আলোচনা কর।]

9. Write a critical note on the Treaty of Berlin (1878). [১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের বার্লিন চুক্তি সম্বন্ধে সমালোচনামূলক আলোচনা কর।]

10. Critically analyse the decisions of Berlin Congress of 1878 and discuss how far they solved the Eastern Question.

[১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের বার্লিন কংগ্রেস-এর সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা কর এবং সেগুলি নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান কতটা করতে পেরেছিল তা আলোচনা কর।]

11. Discuss the growth of the Eastern Question from the Berlin Congress till the Balkan Wars. [বার্লিন কংগ্রেস হতে বলকান যুদ্ধ পর্যন্ত নিকট-প্রাচ্য সমস্যা পর্যালোচনা কর।]

12. Discuss the successes and failures of the Young Turk movement. [নব্য তুর্কী আন্দোলন-এর সফলতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

13. State the causes and effects of the two Balkan Wars [প্রথম ও দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে লেখ।]

দ্বাদশ অধ্যায়

আফ্রিকা ও এশিয়ায় ইউরোপের সম্প্রসারণ

1. Explain the causes and effects of the expansion of Europe in the 19th century. [উনিশ শতকে ইউরোপের সম্প্রসারণের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর।] (C. U. 1962)

2. Sketch the history of the partition of Africa. [আফ্রিকা বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।] (C. U. 1961)

3. Give a brief account of the partition of Africa in the 19th century. [উনিশ শতকে আফ্রিকা বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।] (C. U. 1953, 65)

4. Give an account of the expansion of Europe in Asia in the 19th century. [উনিশ শতকে এশিয়ায় ইউরোপের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে লেখ।]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সশস্ত্র শান্তির যুগ (১৮৭১-১৯১৪)

1. What were the chief characteristics of the period 1871-1914 ? [১৮৭১ হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটির কি কি বৈশিষ্ট্য ছিল ?]

2. Discuss the main features of the foreign policy of Bismark (1871-1914). [বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর] (C. U. 1965)

3. How did the Triple Alliance come into existence? [ত্রিশক্তি চুক্তি কিভাবে দেখা দিল?]

4. Narrate the internal and the foreign policy of Bismark. [বিসমার্কের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি আলোচনা কর।]

5. Narrate the history of Germany under Kaiser William II. [কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের আমলে জার্মানীর ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

6. Discuss the foreign policy of Kaiser William II. How far did his policy differ from that of Bismark? [কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর। বিসমার্কের পররাষ্ট্রনীতির সাথে এর কতটা পার্থক্য ছিল?]

7. Narrate the history of France from the fall of Napoleon III to the outbreak of the First World War. [তৃতীয় নেপোলিয়নের পতনের পর হতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস বর্ণনা কর।]

8. Narrate the history of Italy from her unification till the First Great War with special reference to her foreign and colonial policy. [বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক নীতির ওপর লক্ষ্য রেখে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সময় হতে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইটালীর ইতিহাস বর্ণনা কর।]

9. Narrate briefly the political connection of the European powers from 1871 to 1914. [১৮৭১ হতে ১৯১৪ খৃঃ পর্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর রাজনৈতিক সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

10. Analyse the causes and circumstances leading to the formation of the Triple Entente. [কি কি কারণে ও ঘটনার প্রভাবে ত্রিশক্তি মিতালী দেখা দিল তা বিশ্লেষণ কর।]

11. Analyse the causes and circumstances leading to the (a) Franco-Russian Alliance, (b) Anglo-French Alliance and (c) Anglo-Russian Alliance. [কি কি কারণ ও ঘটনার প্রভাবে এই চুক্তিগুলি সম্পাদিত হল তা ব্যাখ্যা কর : ফ্রান্স ও রাশিয়ার চুক্তি, ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্র, ইঙ্গ-রুশ চুক্তি।]

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : শান্তিচুক্তিসমূহ—জাতিসংঘ

1. Describe briefly the general causes of the First World War. [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাধারণ কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

2. Give an account of the indirect causes that led the different countries to the First World War with special reference to the responsibility of big powers. [প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন ইউরোপীয় শক্তিগুলির অংশগ্রহণের অপ্রত্যক্ষ কারণ উল্লেখ কর এবং এই প্রসঙ্গে বৃহৎ শক্তিবর্গের দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (C.U. 1968)

3. What were the causes of the First World War? [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি কি?] (C. U. 1961, 63, 67)

4. What was the direct cause of the First World War? [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি?]

5. What was the nature of the First world war? What was the war-aims of the contending powers? [প্রথম যুদ্ধের প্রকৃতি কি? যুযুধান শক্তিবর্গের যুদ্ধাদর্শ কি ছিল?]

6. Discuss briefly the cousre of the First World War [সংক্ষেপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি আলোচনা কর।]

7. Write what you know of the conference of Paris and the principles of settlement adopted by it. [প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন সম্পর্কে যা জান লেখ এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য এই সম্মেলন কি কি নীতি গ্রহণ করেছিল তা উল্লেখ কর।]

8. Discuss the terms of the Treaty of Versailles with Germany. (জার্মানীর সাথে ভার্সাই চুক্তির শর্তাবলী আলোচনা কর।]
(C. U. 1962, 64, 66, 68)

9. Name the Treaties and their terms with (a) Austria, (b) Hungry, (c) Bulgaria and (d) Turkey. [অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও তুরস্কের সাথে যে চুক্তিগুলি সম্পাদিত হয় সেগুলির শর্তসহ নামোল্লেখ কর।]

10. How was Germany affected by the provisions of the Treaty of Versailles ? [ভার্সাই সন্ধির ফলে জার্মানী কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হল ?]

11. What do you know of the Treaty of Versailles ? Do you think that the Treaty of Versailles held the germs of another war ? [ভার্সাই সন্ধি সম্পর্কে কি জান ? তুমি কি মনে কর ভার্সাই সন্ধির মধ্যে আর একটি যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল ?]

12. Write short notes on : (a) Treaty of St. Germain (C. U. 1964), (b) Treaty of Trianon, (c) Treaty of Neuilly and (d)Treaty of Severes. [টীকা লিখ : সেণ্ট জার্মানের সন্ধি, ট্রায়াননের সন্ধি, নিউলির সন্ধি এবং সেভরের সন্ধি।]

13. Describe the results of the First World War. [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।]

14. Describe how did League of Nations come into existence. What were the purposes of the League of Nations ? [জাতিসংঘের উৎপত্তি কিভাবে হল ? এর উদ্দেশ্য কি ছিল ?]

15. Describe the composition and functions of main organs of the League of Nations. [জাতিসংঘের প্রধান প্রধান সংস্থাগুলির গঠন প্রণালী, কার্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে লেখ।]

16. Discuss the role of the League of Nations between the two World Wars. [দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন সময়ে জাতিসংঘের কার্যাবলী আলোচনা কর।]

18. Briefly describe the activities of the League of Nations.

Or, What do you know about the League of Nations ? [জাতিসংঘের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। অথবা, জাতিসংঘ সম্বন্ধে যা জান লিখ।]

18. Describe the origin and activities of the League of Nations. What were the causes of its failure ? [জাতিসংঘের উৎপত্তি ও কার্যকলাপ বর্ণনা কর। এটির ব্যর্থতার কারণ কি ?]

(C. U. 1962, 65, 67)

পঞ্চদশ অধ্যায়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

1. Describe the career and character of George Washington [জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী ও চরিত্র বর্ণনা কর।] (C. U. 1962)

2. What is the Monroe Doctrine ? Explain its significance in American history. [মনরো নীতিটি কি ? আমেরিকার ইতিহাসে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।]

(C. U. 1961, 64, 66)

3. How did the Spanish and Portuguese Colonies in America achieve independence ? Or, Narrate briefly the history of South America. Or, Give in outline the history of South America. [আমেরিকায় স্পেনীয় ও পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করল ? অথবা, দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। অথবা, দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস মোটামুটি আলোচনা কর।]

4. Describe the causes and results of the American Civil War. [মার্কিন গৃহযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।] (C.U. 1961, 65, 67)

5. Write a note on slavery and show how it led to Civil War in the United States. [দাস প্রথা সম্বন্ধে একটি বিবরণী লেখ এবং এটি কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করে তা দেখাও।]

6. Describe the circumstances leading to the American Civil War. [আমেরিকার গৃহযুদ্ধ যে সব ঘটনার ফলে দেখা দেয় সেগুলি বর্ণনা কর।]

(C. U. 1963)

7. Describe the career and character of Abraham Lincoln. [আব্রাহাম লিঙ্কনের কর্মময় জীবন ও চরিত্র বর্ণনা কর।] (C. U. 1962)

8. Give an account of the foreign policy of the U. S. A. during the period under study. [আলোচ্য যুগে (১৭৯০ হতে ১৯২৩ খৃঃ পর্যন্ত) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

9. Sketch the foreign policy of the U. S. A. from 1899 to 1923. [১৮৯৯ হতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।]

10. Write what you know about the Washington Conference. [ওয়াশিংটন সম্মেলন সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

ষোড়শ অধ্যায়

সুদূর প্রাচ্য—চীন ও জাপান

1. Write a short history of China in the 19th century and narrate its relation with the Western powers. [উনিশ শতকে চীনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সাথে তার সম্পর্ক আলোচনা কর।]

2. Discuss the causes and effects of the First and Second Chinese or Opium Wars. [প্রথম ও দ্বিতীয় চীন বা আফিম যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।]

3. What is meant by Boxers? What did the Boxers do to change the condition of China? What were its results? [মুষ্টিযোদ্ধা বলতে কি বোঝ? চীনের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য মুষ্টিযোদ্ধারা কি করেছিল? এর ফলাফল কি হল?] (C. U. 1961)

4. Give an account of the Chinese Revolution in 1911 and its results. [১৯১১ খৃষ্টাব্দের চীন বিপ্লবের বিবরণ দাও। এর ফলাফল কি হল?] (C. U. 1961, 67)

5. What is Kuomintang? Who was Dr. Sun Yat Sen?

What part did he play in the Revolution of 1911 and how far was he successful? [কুয়োমিংটাং বলতে কি বোঝ? সান ইয়াৎ-সেন কে ছিলেন? ১৯১১-র বিপ্লবে তিনি কিরূপ অংশ গ্রহণ করেন? তিনি কতটা সফলতা অর্জন করেন?] (C. U. 1966)

6. Make an estimate of Dr. Sun-Yat Sen to the growth of Chinese Nationalism. [চীন দেশে জাতীয়তাবাদ জাগানোর ক্ষেত্রে ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

7. Briefly describe the political situation in China from 1919 to 1937. [১৯১৯ হতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।]

8. Who is Chiang Kai-Shek? What were the causes of the Civil War in China? [চিয়াং কাই-শেক কে? চীনের গৃহযুদ্ধের কারণ কি?]

9. Give an account of the condition of Japan previous to and after its connection with foreign powers. [বিদেশী শক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে ও পরে জাপানের অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিবরণ দাও।]

10. Describe the peaceful revolution in Japan and its results. [জাপানের শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।]

11. Give a brief account of the awakening of Japan during the Meiji era 1867-1912. [মেইজি যুগে জাপানের উত্থানের বিবরণ দাও।] (C. U. 1966)

12. What were the causes and results of the Sino-Japanese War of 1894-95. [১৮৯৪-৯৫-এর চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল কি?] (C. U. 1962, 64)

13. What were the causes of Russo-Japanese War of 1904-5? How did Japan defeat Russia? What were its results? [১৯০৪-৫ এর রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ কি? জাপান কিভাবে রাশিয়াকে পরাজিত করল? এই যুদ্ধের ফলাফল কি?]

14. Describe briefly the activities of Japan between 1914 and 1931. [১৯৩১ হতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের কার্যকলাপ বর্ণনা কর।]

15. Review Sino-Japanese relations from 1894 to 1915. [১৮৯৪ হতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন-জাপান সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

(C. U. 1968)

সপ্তদশ অধ্যায়

রুশ বিপ্লব

1. Write what you know about Russia under the Czars. *Or*, Give a picture of Russia in the 19th century with special reference to position of Czar, Church, Feudal lords and the common people. [জার-শাসিত রাশিয়া সম্পর্কে যা জান লেখ। অথবা, রাশিয়ার জারতন্ত্র পুরোহিততন্ত্র, সম্ভ্রান্ত শ্রেণী এবং জনসাধারণের অবস্থার পটভূমিকায় উনিশ শতকের রাশিয়ার অবস্থা বর্ণনা কর।]

2. What is Socialism? Write what you know of Utopian Socialists? *Or*, What do you know about the growth of Socialism before Karl Marx? [সমাজতন্ত্র বলতে কি বোঝ? অবাস্তববাদী সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে কি জান? অথবা, কার্ল মার্কস-এর পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে কি জান?]

3. Who was Karl Marx? What were his teachings? *Or*, What do you know about the life and views of Karl Marx? [কার্ল মার্কস কে ছিলেন? তাঁর মতবাদ কি ছিল? অথবা, কার্ল মার্কস-এর জীবনী ও মতবাদ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

4. Describe the causes of the Russian Revolution of 1917. Write a short account of the same. [রুশ বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর। রুশ বিপ্লবের প্রধান ঘটনাগুলি উল্লেখ কর।]

(C. U. 1961, 63, 68)

5. Describe the circumstances leading to the Revolution of

1917 in Russia. [১৯১৭ খৃষ্টাব্দের রুশ বিপ্লব যে সকল ঘটনার ফলে দেখা দেয় সেগুলি বর্ণনা কর।]

(C. U. 1966)

6. What part did Lenin play in the Russian Revolution? What was Lenin's plan of the socialistic reconstruction of Russia. [রুশ বিপ্লবে লেনিন কিরূপ অংশ গ্রহণ করেন তাঁর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পরিকল্পনা কি ছিল ?]

7. Review the career and achievement of Lenin. [লেনিন-এর জীবনী ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।]

8. Write how Lenin reconstructed Russia after the Revolution. [বিপ্লবের পর লেনিন কিভাবে রাশিয়াকে পুনর্গঠিত করেছিলেন তা লেখ।]

9. Describe the progress made by the U. S. S. R. under Stalin. Or, Give a general idea or the achievements of Stalin in Russia. [স্টালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাশিয়ার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। অথবা, স্টালিনের শাসনকালে রাশিয়ার অগ্রগতি বর্ণনা কর।]

10. How did the Russian Revolution affect Russia and the world. Or, What were the results of the Russian Revolution? [রুশ বিপ্লব রাশিয়া ও পৃথিবীকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল ? অথবা, রুশ-বিপ্লবের ফলাফল কি হল ?]

11. Sketch in brief the foreign policy of the Soviet Union in the years between 1917 and 1939. [১৯১৭ হতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

অষ্টাদশ অধ্যায়

ইউরোপে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব

1. Write what you know about the rise of Mussolini in Italy. What were the broad goals of Mussolini's domestic and foreign policy? To what extent were they attained and how? [ইটালীতে মুসোলিনীর অভ্যুদয় সম্বন্ধে যা জান লেখ। মুসোলিনীর আভ্যন্তরীণ

ও বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল ? ও দুটি কতটা সফল হয়েছিল এবং কিরূপে ?] (C. U. 1964)

2. What is Fascism ? How did Mussolini seize power in Italy ? Briefly narrate the history of Italy from 1919 to 1939. [ফ্যাসিজম বলতে কি বোঝ ? মুসোলিনী কিভাবে ইটালীতে ক্ষমতা হস্তগত করলেন ? ১৯১৯ হতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইটালীর ইতিহাস বর্ণনা কর।]

3. Give a brief history of the rise of Fascist Italy under the leadership of Mussolini. Enumerate the reforms introduced by him. [মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফাসিষ্ট ইটালীর উত্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। তাঁর সংস্কারগুলি বর্ণনা কর।]

4. Discuss the problems of post-war Germany. [যুদ্ধোত্তর জার্মানির সমস্যাগুলি আলোচনা কর।]

5. How did Hitler seize power in Germany ? What were the true aims of his internal and foreign policy ? *Or*, Write a short history of Germany under Hitler. *Or*, Give an account of the rise of Germany under Hitler. [হিটলার কিভাবে জার্মানিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেন ? তাঁর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির প্রকৃত লক্ষ্য কি ছিল ? অথবা, হিটলারের অধীনে জার্মানির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। অথবা, হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানির অভ্যুদয় বর্ণনা কর।] (C. U. 1963, 66, 68)

6. Briefly narrate the foreign policy of France from 1919 to 1939. [১৯১৯ হতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের বৈদেশিক নীতি আলোচনা কর।]

7. What were the causes of the Spanish Civil War ? What was its importance ? [স্পেনের গৃহযুদ্ধের কারণ কি ? এটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।]

8. Briefly describe the imperialistic activities of Japan between the two world wars. [দুটি বিশ্বযুদ্ধ-কালীন জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ বর্ণনা কর।]

9. Describe in outline the relations between China and Japan during 1930-39. [১৯৩০ হতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের সাথে জাপানের সম্পর্ক সংক্ষেপে লেখ।]

উনবিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

1. What were the causes of the Second World War ? [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি কি ?]

(C. U. 1962)

2. Describe the nature and course of the Second World War. [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ও গতি বর্ণনা কর।]

3. Discuss the origin, aims, objectives and organisation of the United Nations. [সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, নীতি এবং সংগঠন সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

(C U. 1961)

4. What do you know about the United Nations ? What are its objectives ? What has handicapped the United Nations ? [সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্বন্ধে কি জান ? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি কিরূপে হল ? এর লক্ষ্য কি ? এর কার্যে কিভাবে বাধা এসেছে ?] (C. U. 1966, 67)

5. Describe the composition and functions of the Security Council. [নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।]

6. What are the principal organs of the United Nations ? Describe their compositions and functions briefly. [সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান সংস্থাগুলির গঠন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

(C. U. 1968)

7. What are the major drawbacks of the United Nations ? [সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দোষত্রুটি কি ?]

8. What do you know about the United Nations and compare it with the League of Nations. [সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সম্পর্কে যা জান লেখ এবং জাতিসংঘের সাথে তুলনা কর।]

9. Write what you know of the Specialised Agencies of the United Nations. [জাতিপুঞ্জের বিশেষ সংস্থাগুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ।]

10. Describe the composition and functions of the General Assembly and the Security Council. [সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।]

বিংশ অধ্যায়

এশিয়া ও আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের প্রসার (১৯১৯-১৯৪৯)

1. Sketch the career and achievements of Kamal Ataturk of Turkey. [তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের জীবনী ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা কর।] (C. U. 1962, '64, '66, '67,)

2. Give a short history of the Turkish Revival under Mustafa Kamal after the First World War. [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কের পুনরুজ্জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।]

3. Trace the story of Kamal Ataturk and the National Revolution in Turkey. [কামাল আতাতুর্ক ও তুরস্কের জাতীয়তাবাদী বিপ্লব সম্পর্কে যা জান লেখ।]

4. Write a short account of the rise of Persia (Iran) [পারস্যের (ইরানের) উত্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।]

5. Write a short account of the rise of Arab Nationalism. [আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।]

6. Give a short account of the rise and development of Arab Nationalism. [আরব জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ও অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]

7. What do you know of the Arab Nationalism? Briefly describe the struggle for independence of the Arab people after

the First World War. [আরব জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে কি জান? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরবের অধিবাসীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।]

(C. U. 1968)

8. What do you know of the 'Palestine Problem'. How did it arise? [প্যালেস্টাইন সমস্যা সম্বন্ধে কি জান? কিভাবে এটি দেখা দিল?]

9. Give a short history of Egypt upto her final achievement of independence from the foreign powers. [বিদেশী শক্তির হাত হতে তার চূড়ান্ত স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত ইজিপ্টের (মিশরের) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও।]

10. Write a short account of the Nationalist movement In India between 1919 and 1939 [১৯১৯ হতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস লেখ।]

11. Trace in details the cause and the results of the Non-co-operation Movement. [অসহযোগ আন্দোলনের কারণ, গতি ও ফলাফল সম্বন্ধে বিশদভাবে লেখ।]

12. Briefly narrate the circumstances which led to the partition of India into two Sovereign States. [ভারত বিভাগ কি ভাবে ঘটল তা বর্ণনা কর।]

13. Give a short account of the Communist Revolution in China. *Or*, Give an account of the Chinese Revolution of 1949. What are its main features? [চীনে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ। অথবা, চীন বিপ্লবের কাহিনী বর্ণনা কর।]

14. Briefly discuss the political changes and international situation in Africa after the First World War. [প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আফ্রিকার পরিবর্তন ও বিশ্ব পরিস্থিতি আলোচনা কর।]